সিরিজ - ৩৪
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে
ভুল ধারণা
শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী
সম্পাদনায়
মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন কামরুল

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে মানুষের নানা ধরনের ভুল ধারণা, তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগের জবাব ও বিশ্বনবীর জীবনীর বর্ণনা সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভুল ধারণা

রচনায়

শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী

আরবি প্রভাষক

আলহাজ্জ মোহাম্মদ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা

৮-৯ লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা- ১১০০।

খতীব

হাজিরপুকুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

চেয়ারম্যান

ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ

সম্পাদনায়

মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ

ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা

কুরআন ও হাদীসের দলীলভিত্তিক সহীহ আকীদাহ সম্পন্ন বইয়ের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ভুল ধারণা
শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী
সম্পাদনা : মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন কামরুল
প্রকাশক : আবদুল্লাহ ও মাহির ফায়সাল
প্রকাশকাল : মে ২০১৬ ঈসায়ী
গ্রন্থস্বত্ব : ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ
কম্পিউটার কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ :
ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ

বিক্রয় কেন্দ্র

ইমাম পাবলিকেশন্স শো-রুম
১৫৬ লুৎফর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা- ১১০০।
(সুরিটোলা জামে মসজিদের সাথে)
মোবাইল : ০১৮৭৪-৫০০২২২; ০১৮৭৪-৫০০৩৩৩
০১৯১২-১৭৫৩৯৬; ০১৭২২-৫৮৩৮০৯

পরিবেশনায়

ইলমা প্রকাশনী
২০ লুৎফর রহমান লেন
সুরিটোলা, ঢাকা- ১১০০
মোবাইল: ০১৮৫৫-৫৬৬৬২৫

আন-নূর লাইব্রেরী
হাজিরপুকুর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
মোবাইল: ০১৯১৯-১৯৮০৫০
০১৭৮৫-২৩৪৬৬৯

হাদিয়া : ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

MOHAMMAD S.M SOMPORKE VHOL DHARONA

Written By : Shaikh Abdur Rahman Bin Mobarak Ali
Published By : IMAM PUBLICATIONS LIMITED
Office : Road # 13, House # 14, Flat- 3-A, Sector # 04, Uttara, Dhaka- 1230, Bangladesh. Mobile : 01874500222, 01912175396, Tel : 88-02- 8950741, 8914312, 8915112, Fax : +88-02- 8950689.
Email : imampublications@gmail.com. Facebook Page : https//facebook.com/imampublications. Price : TK. 150. Only.

প্রথম কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ - وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ নবীর উপর, যাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবী-রাসূলই মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। সকলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ, তথা আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾

আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি (এ নির্দেশ দিয়ে যে) তোমরা (একমাত্র) আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। (সূরা নাহল- ৩৬)

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সকল যুগেই নবী-রাসূলদের সম্পর্কে মানুষ নানা ধরনের ভুল ধারণার শিকার হয়েছে এবং তাঁদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এমনকি নবীদের উপর বিভিন্নভাবে যুলুম-নির্যাতনও করেছে।

নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নবুওয়াত লাভের পূর্বে সকলের কাছে 'আল-আমিন' উপাধিতে ভূষিত হলেও নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখনই তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, তখন থেকেই লোকেরা তাঁর সম্পর্কে নানা ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করতে লাগল এবং তাঁর উপর বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অভিযোগ আনতে থাকল যা এখনো পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, এসব খারাপ ধারণা ও ভুল আকীদা থেকে দূরে থাকা এবং মানুষকেও দূরে রাখার চেষ্টা করা।

যুগে যুগে মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা পোষণ করত এ গ্রন্থে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সেগুলোর পর্যালোচনা করা হয়েছে– যাতে মানুষ এসব বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকার না হয়। সেই সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযুক্ত করা হয়েছে– যাতে তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা সহজ হয় এবং তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরা যায়। আশা করি পাঠকসমাজ এ গ্রন্থটি থেকে উপকার লাভ করতে সক্ষম হবেন– ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা ও তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী
মোবাইল : ০১৯১২-১৭৫৩৯৬
ঢাকা- ২০/০৫/২০১৬ ইং

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়

মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ভুল ধারণা

বিষয় — **পৃষ্ঠা**

২য় অধ্যায়

মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম অধ্যায়

মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ভুল ধারণা

মুহাম্মাদ ﷺ নূরের তৈরি না মাটির তৈরি

অতি দুঃখের বিষয় এই যে, নূর শব্দের স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নূর শব্দকে যখন যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এবং সাহাবীগণও যেভাবে বুঝেছেন, তারা এর বিকৃতি ঘটিয়ে উল্টো অর্থ গ্রহণ করে থাকে এবং সে অনুযায়ী আকীদা পোষণ করে থাকে। যেমন– তারা বলে যে,

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ নন।
২. তিনি নূরের তৈরি।
৩. তাঁকে আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
৪. যেহেতু তিনি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছেন, সুতরাং তিনিই আল্লাহ।
৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষ বলা যাবে না।
৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নূর থেকে সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।
৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছায়া ছিল না ইত্যাদি।

এ কথা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা একেবারেই অবান্তর এবং স্পষ্ট ভ্রষ্টতার নামান্তর। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

নূর বলতে কী বুঝায় :

نُوْرٌ (নূর) শব্দের অর্থ হচ্ছে, আলো বা জ্যোতি। সাধারণ অর্থে নূর বলতে দৃশ্যমান আলোকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তবে ইসলামী পরিভাষায় নূর বলতে আলো, হেদায়াত, জ্ঞান ইত্যাদিকে বুঝানো হয়ে থাকে। কুরআন-হাদীসে এসব অর্থেই এর ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا﴾

তিনিই সূর্যকে দীপ্তিমান ও চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন। (সূরা ইউনুস- ৫)
এখানে নূর বলতে সাধারণ অর্থে আলো বা জ্যোতিকেই বুঝানো হয়েছে।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করার সময় বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّ عَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَّ عَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا وَّ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّ تَحْتِيْ نُوْرًا وَّ أَمَامِيْ نُوْرًا وَّ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّ عَظِّمْ لِيْ نُوْرًا

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার অন্তরে, চোখে, কানে এবং আমার ডানে-বামে, উপরে-নিচে, সামনে-পেছনে নূর দান করো এবং আমাকে অধিক নূর দান করো।[১]

এখানে নূর দ্বারা হেদায়াত ও জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ মাটির তৈরি হওয়ার দলীল

সকল মানুষের ন্যায় মুহাম্মাদ ﷺ-ও মাটি থেকে তৈরি একজন মানুষ ছিলেন। এর কারণ ও প্রমাণসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. মানবজাতিকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে :

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্টি করেছেন। জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে, ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ﴾

(স্মরণ করো) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব। (সূরা সোয়াদ- ৭১)

অপর আয়াতে তিনি বলেন,

﴿هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا﴾

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে; তারপর শুক্রবিন্দু হতে; তারপর জমাটবাধা রক্তপিণ্ড হতে; তারপর বের করে আনেন শিশুরূপে। অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হতে পার যৌবনে, তারপর উপনীত হতে পার বার্ধক্যে। (সূরা মু'মিন- ৬৭)

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى﴾

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে। অতঃপর তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে সেখান থেকেই পুনরায় বের করে আনব। (সূরা ত্বা-হা- ৫৫)

---

[১] সহীহ বুখারী, হা/৬৩১৬; সহীহ মুসলিম, হা/১৮২৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩১৯৪; মিশকাত, হা/১১৯৫।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকে মানুষ হিসেবেই দাবি করতেন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা আল্লাহর আদেশকে যথাযথভাবে পালন করতেন এবং এতে তিনি কোন কিছুর পরোয়া করতেন না। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যখন নবী ﷺ-কে মানুষ বলে পরিচয় দিতে আদেশ করেছেন, তখন তিনি সে আদেশও যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ।[২]

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

সাবধান, হে মানব সকল! নিশ্চয় আমি একজন মানুষ। অচিরেই আমার নিকট আমার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দূত (মালাকুল মাওত) আসবেন।[৩]

৩. মানব প্রকৃতির সকল বৈশিষ্ট্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে ছিল :

আল্লাহ তা'আলা একেক জাতিকে তাদের সৃষ্টির উৎস অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ অনুযায়ী মানবজাতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো,

১. এরা পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।
২. এরা মায়ের বুকের দুধ পান করে।
৩. এরা ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হয়।
৪. এরা মাটি থেকে উৎপাদিত খাদ্য থেকে আহার করে।
৫. এরা পান করে।
৬. এরা নিদ্রা যায়।
৭. এরা প্রস্রাব-পায়খানা করে।
৮. এরা বিয়ে করে।
৯. এদের থেকে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে থাকে।
১০. এরা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে।
১১. এরা রোগে-শোকে-দুঃখে প্রতিক্রিয়াশীল হয়।
১২. এরা মৃত্যুবরণ করে।

এসব মানবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে ছিল। এসব বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, তিনি একজন মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন।

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের মতোই জন্মগ্রহণ করেছেন :

মানুষ যেভাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ঠিক সেভাবেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তার পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম ছিল আমিনা।

---

[২] সহীহ বুখারী, হা/৪০১; সহীহ মুসলিম, হা/১৩০২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৬০২; মিশকাত, হা/১০১৬।
[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯২৬৫; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৩০১৭।

৫. সকল মানুষের মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশ পরিচয় ছিল :

মানবজাতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বংশ পরিচয়। তারা যুগ যুগ ধরে এ পরিচয় নিয়েই পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ এরও একটি বংশ পরিচয় রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষ হিসেবেই সাব্যস্ত করে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللهَ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ

আবু আম্মার শাদ্দাদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ওয়াসিলা ইবনে আসকা' (রহ.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। আর কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ বংশ থেকে বনু হাশিমকে; আর বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।[৪]

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সন্তানাদিও মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন :

জন্মগ্রহণের দিক থেকে একটি নিয়ম হচ্ছে, যে যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে, সে সে জাতির লোক হিসেবে পরিচয় লাভ করবে। সুতরাং জিন ও ফেরেশতারা কখনো মানুষ হিসেবে এবং মানুষ কখনো জিন অথবা ফেরেশতা হিসেবে পরিচয় লাভ করতে পারবে না এবং তাদের বংশধারাও হঠাৎ করে মানুষ থেকে ফেরেশতা অথবা ফেরেশতা থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে না। যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঔরসে জন্মগ্রহণকারী কাউকে নূরের তৈরি বলা হয় না। এমনকি যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নূরের তৈরি বলে দাবি করে, তারাও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বংশধরকে নূরের তৈরি বলে না। সুতরাং তাদের এ দাবিটি যুক্তির দিক থেকেও ভিত্তিহীন।

৭. আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে মানুষ থেকেই নির্বাচন করেছেন :

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, সকলেই জন্মগতভাবে মানুষ ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে নবী ও রাসূল হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, তখন থেকে তাঁরা নবী অথবা রাসূল হিসেবে পরিচয় লাভ করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। কুরআন মাজীদে তাঁর চরিত্র বর্ণনা করে বলা হয়েছে,

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

---

[৪] সহীহ মুসলিম, হা/৬০৭৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৪৭৫; তিরমিযী, হা/৩৬০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৯৮৭; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৩৪৫৪; মিশকাত, হা/৫৭৪০।

অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা কষ্ট দেয়, তা তার নিকট কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী এবং মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (সূরা তওবা- ১২৮)

৮. কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবজাতির নেতা হবেন :

দুনিয়াতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তা আর গোপন থাকবে না। কেননা সেদিন সকল গোপন বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন সকলেই তাদের নিজ নিজ ভুলগুলো বুঝতে পারবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি মানুষ না হয়ে মানুষের রূপ ধারণ করে থাকেন, তাহলে সেটাও কিয়ামতের দিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা হব।[৫]

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, যিনি কিয়ামতের দিন মাটির তৈরি আদম সন্তানদের নেতা হবেন, তিনি অবশ্যই আদম সন্তানদের মধ্য থেকেই একজন এবং তিনি অবশ্যই মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন।

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের মতোই ভুলে যেতেন :

মানুষ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে اَلْاِنْسَانُ (ইনসান)। যার অর্থ হচ্ছে, ভুলে যাওয়া। আর কোন কিছু ভুলে যাওয়াটাই মানুষের অন্যতম একটি স্বভাব। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই ভুলে যেতেন। নামাযের রাক'আত ভুলে যাওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ

আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। অতএব আমি যখন ভুলে যাই, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।[৬]

আয়েশা (রাঃ) এর অভিমত :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিচয় সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) এর মন্তব্য রয়েছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ قِيْلَ لَهَا : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِيْ ثَوْبَهٗ وَيَحْلُبُ شَاتَهٗ وَيَخْدُمُ نَفْسَهٗ

---

[৫] সহীহ মুসলিম, হা/৬০৭৯; সহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৫৪৩; তিরমিযী, হা/৩৬১৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩২৯৬; মিশকাত, হা/৫৭৪১।

[৬] সহীহ বুখারী, হা/৪০১; সহীহ মুসলিম, হা/১৩০২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৬০২; মিশকাত, হা/১০১৬।

আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়িতে থাকাকালীন অবস্থায় কী কাজ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানবজাতির মধ্যে একজন মানব। তিনি তাঁর কাপড় সেলাই করতেন, বকরি দোহন করতেন এবং ব্যক্তিগত কাজ সমাধা করতেন।[৭]

সাধারণ মানুষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পার্থক্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ। তবে অন্যান্য মানুষ থেকে যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল সেটি হচ্ছে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো। এ বৈশিষ্ট্যটি আল্লাহ তা'আলাই কুরআন মাজীদে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾

বলো, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন। (সূরা কাহফ- ১১০)

উল্লেখ্য যে, এ পার্থক্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষ হওয়া থেকে পৃথক করে দেয় না; বরং তিনি যে একজন মানুষ– এটাই সাব্যস্ত করে।

ফেরেশতারা নূরের তৈরি

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা তৈরি করেছেন। তবে তাদের মধ্য থেকে কোন নবী বা রাসূল প্রেরণ করেননি; বরং তিনি কেবল মানবজাতি থেকেই রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَآئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا﴾

বলো, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করতাম। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৯৫)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেননি। বরং মানবজাতির হেদায়াতের জন্য মানুষকেই নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল মানুষ ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আম্বিয়ায়ে কেরামসহ সকল

---

[৭] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬১৯৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫৬৭৫; মিশকাত, হা/৫৮২২।

উলামায়ে কেরামের আকীদা-বিশ্বাস এটাই। একথাও সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, নবীকূলের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ সকল মানবজাতির শ্রেষ্ঠ এবং তার সাথে অন্য কোন মানুষের তুলনা হয় না। তিনি গুণগতভাবে সকল মানবজাতির হেদায়াতের আলো ও সরল পথের দিশারী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাটির তৈরি মনে করলে তাঁর মর্যাদা কমে না

আল্লাহ তা'আলা অগণিত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসেবে মানবজাতিকেই সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾

আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭০)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সকল সৃষ্টির সেরা জীব মাটি দ্বারা সৃষ্ট মানব। তাছাড়া আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাকে সিজদা করার আদেশের মাধ্যমেও তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদে এসেছে,

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ﴾

তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তাকে (ইবলিসকে) বললেন, যখন আমি (আদমকে) সিজদা করতে আদেশ দিয়েছি, তখন কোন্ জিনিস তোমাকে সিজদা করতে নিষেধ করল? সে (ইবলিস) বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন; আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (সূরা আ'রাফ- ১২)

আল্লাহ তা'আলা নূরের তৈরি ফেরেশতাদের উপরও মাটির তৈরি আদমকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এমনকি আদম (আঃ) মাটির তৈরি বলে তার মর্যাদা কম হবে, এই যুক্তি দেয়ার কারণে ইবলিস চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাটির তৈরি বলে স্বীকার করলে তার মর্যাদা কমে না। বরং আরো বৃদ্ধি পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নূরের তৈরি মনে করা বাড়াবাড়ি

ঈসা (আঃ) এর উম্মতগণের মধ্যে যারা অতিভক্ত ছিল, তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করল। যারা বেআদব ছিল, তারা ঈসা (আঃ)-কে জারজ সন্তান বলে ঘোষণা দিল। এদের মধ্যে যারা অতিভক্ত ছিল, তারাও গোমরাহ। যারা তার সাথে বেআদবী করেছে তারাও গোমরাহ।

ঠিক তেমনি উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝে যারা অতিভক্ত, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর জাতি নূরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আকীদা। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুহাব্বতের ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে তাকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে বিশ্বাস করাই ন্যায়সঙ্গত।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নূরের তৈরি মনে করার আকীদা খ্রিস্টানদের একটি শিরকী আকীদার সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন– তারা বলে থাকে যে, ঈসা (আঃ)-ই আল্লাহ। তিনি মানুষ রূপে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। অথচ এ আকীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ সৃষ্টি আর স্রষ্টা কখনো এক হতে পারে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে যদি দাবি করা হয়, তাহলে এক অর্থে তাকে আল্লাহ বলেই দাবি করা হয়। উম্মত কর্তৃক এ ধরনের বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবদ্দশাতেই এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهٗ فَقُوْلُوْا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আমার প্রশংসায় এতটা বাড়াবাড়ি করো না যেমনটা খ্রিস্টানরা ঈসা (আঃ) এর ব্যাপারে করেছিল। নিশ্চয় আমি শুধুমাত্র আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূলই বলবে।[৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গায়েব জানা সম্পর্কে ভুল ধারণা

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হচ্ছেন, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ রহমতে তাকে মানবজাতির জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন এবং অনেক গায়েবী বিষয় অবহিত করেছিলেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী বিষয় কেবল ততটুকুই জানতে পারতেন, যতটুকু তিনি (আল্লাহ তা'আলা) ওহীর মাধ্যমে তাকে অবহিত করতেন। এর বাহিরে তিনি কিছুই জানতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈগণসহ যুগে যুগে সালফে সালেহীনগণও সর্বদা এরূপ আকীদাই পোষণ করতেন।

কিন্তু বর্তমান যুগে পথভ্রষ্ট কতিপয় আলেমের উদ্ভব হয়েছে, যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট দলীলকে বিকৃত করে দাবি করে যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গায়েব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নিম্নে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তাদের এসব মতবাদের ভ্রষ্টতা প্রমাণ করা হলো :

[৮] সহীহ বুখারী, হা/৩২৬১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৪; সুনানে দারেমী, হা/২৮৪০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬২৩৯।

ইলমে গায়েব এর সংজ্ঞা :

اَلْعِلْمُ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। আর اَلْغَيْبُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য, গুপ্তজ্ঞান, অজানা রহস্য, কোন জিনিস গোপন থাকা ইত্যাদি। সুতরাং اَلْعِلْمُ الْغَيْبُ অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান।

ইসলামী পরিভাষায় اَلْعِلْمُ الْغَيْبَ বলা হয়–

اِنَّ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِ الْحَوَاسِ وَالْعِلْمِ الضَّرُوْرِيِّ وَالْعِلْمِ الْاِسْتِدْلَالِيِّ

দলীল ব্যতীত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধারণভাবে যা জানা যায় না, তাকে গায়েব বলা হয়।

ইলমে গায়েবের অধিকারী কে

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন জ্ঞানের আধার এবং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন সকল জ্ঞানের উৎস। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ জ্ঞান থেকে সামান্য কিছু দান করে অনুগ্রহ করে থাকেন। তিনি সৃষ্টির সবধরনের খবরাখবর রাখেন। বিশেষ করে যেসব বিষয় বান্দাদের থেকে অদৃশ্য রয়েছে, সে সম্পর্কেও খবর রাখেন। তিনি বলেন,

﴿قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ﴾

বলো, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন উত্থিত হবে। (সূরা নামল- ৬৫)

অপর আয়াতে এসেছে,

﴿اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ﴾

(তারা কি জানত না যে) আল্লাহ তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কেও অবগত আছেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন? (সূরা তওবা- ৭৮)

এভাবে কুরআন মাজীদের আরো অনেক আয়াত দ্বারা গায়েবের জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার একক অধিকারের কথা প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ গায়েব জানতেন না- এর দলীল

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে অবগত নয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ বিষয়ে অবহিত নন। এ বিষয়টিও কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন–

﴿وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا ؕ اَللهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধেও অবগত নই। আমি এটাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। যারা তোমাদের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনই মঙ্গল দান করবেন না; তাদের অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। নতুবা আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা হূদ- ৩১)

﴿وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۛۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴾

(বলো) আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রকৃতপক্ষে কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (সূরা আ'রাফ- ১৮৮)

তাছাড়া হাদীসেও এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন–

عَنْ عَائِشَةَ .... قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهٗ يُخْبِرُ بِمَا يَكُوْنُ فِيْ غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ وَاللهُ يَقُوْلُ ﴿قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর ওহী ব্যতীত আগামীকাল কী হবে– তা অবহিত করতে পারেন, সে আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বলো, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে কেউ জানে না"– (সূরা নাম্‌ল- ৬৫)।[৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِيْ غَدٍ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِي الْأَرْحَامِ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ وَمَا يَدْرِيْ أَحَدٌ مَتٰى يَجِيْءُ الْمَطَرُ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গায়েবের চাবি হলো পাঁচটি, যে পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না– (১) কেউ জানে না আগামীকাল কী ঘটবে (২) কেউ জানে না মায়েদের গর্ভে কী সন্তান রয়েছে, (৩) কেউ জানে না সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে, (৪) কেউ জানে না সে কোন্ জায়গায় মৃত্যু বরণ করবে, (৫) কেউ জানে না বৃষ্টি কখন হবে।[১০]

---

[৯] সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৭।
[১০] সহীহ বুখারী, হা/১০৩৯।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গায়েব সম্পর্কে কোনকিছু অবগত ছিলেন না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গায়েবের বিষয়ে যা কিছু জানাতেন, তিনি কেবল তা-ই জানতে পারতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি তার সামনে এবং পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করে রেখেছেন। (সূরা জিন- ২৬, ২৭)

উপরোক্ত প্রমাণাদি ছাড়াও আরো অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গায়েব জানতেন না। নিম্নে এর স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী থেকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো :

১. তায়েফের ঘটনা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমনের ইচ্ছা করলেন এ আশায় যে, তায়েফবাসীরা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু যখন তিনি তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন, তখন তারা সকলেই তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাঁকে অপমানের সহিত তায়েফ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকি তারা তাঁর পেছনে দুষ্ট ছেলেদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি গায়েবের জ্ঞান রাখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তায়েফবাসীদের দ্বারা এ ধরনের অপমানের মুখোমুখি হতেন না। বরং তিনি আগেই সতর্ক হয়ে যেতেন।

২. উহুদের বিপর্যয় :

উহুদ যুদ্ধ ছিল ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ ব্যাপক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অনেক সাহাবী হতাহত হয়েছিলেন। এমনকি একটি আঘাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তাহলে মুসলিমগণ এরকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতেন না; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদেরকে এরকম বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য সাথে সাথেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

৩. খন্দকের যুদ্ধে গোয়েন্দা প্রেরণ :

খন্দকের যুদ্ধে কাফিররা যখন খন্দকের মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মদিনায় মুসলিমদের অবরোধ করে রেখেছিল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের অবস্থা জানার জন্য হুযায়ফা (রাঃ)-কে গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তাহলে হুযায়ফা (রাঃ)-কে

কাফিরদের অবস্থা জানার জন্য কখনই প্রেরণ করতেন না। বরং কাফিরদের যাবতীয় অবস্থা এমনিতেই তাঁর জানা থাকত এবং তিনি সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।

৪. হুদায়বিয়া সন্ধির সময় উসমান (রাঃ) এর মৃত্যুর গুজব :

৬ষ্ঠ হিজরীতে মুসলিমগণ যখন হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন তারা হুদায়বিয়া নামক স্থানে এসে বাধাপ্রাপ্ত হন। ফলে তারা সেখানেই শিবির স্থাপন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান (রাঃ)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। যাতে তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরাইশদেরকে অবহিত করেন। কিন্তু উসমান (রাঃ) এর ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, কুরাইশরা উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ সংবাদ শুনলেন তখন তিনি এ মিথ্যা গুজবকে বিশ্বাস করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকেও যুদ্ধের বাই'আত গ্রহণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তাহলে এ ধরনের গুজব শুনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া তো দূরের কথা, বিশ্বাসই করতেন না।

৫. হাউজে কাউসারের ঘটনা :

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের পূর্বে হাউজে কাওসারে উপস্থিত হব। তখন কিছু লোক আমার সামনে আসবে। এরপর তাদেরকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! তারা তো আমার উম্মত। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে বলা হবে, হে রাসূল! আপনি জানেন না যে, তারা আপনার পর কী পাপ কাজ করেছে?[১১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তাহলে ঐসব উম্মতের অপরাধের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন ধরনের প্রশ্ন করারই প্রয়োজন হতো না।

৬. এক বালিকার কবিতা আবৃত্তি :

একদা মদিনায় এক বিবাহ অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত হলে একজন বালিকা কবিতা আবৃত্তি করে বলছিল, আমাদের মাঝে এমন একজন নবী রয়েছেন, যিনি আগামীকাল কী হবে তা জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, একথা ছেড়ে আগে যা বলেছিলে তাই বলো। (আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না যে, আগামীকাল কী ঘটবে)।[১২]

---

[১১] সহীহ বুখারী, হা/৬৫৮৩।
[১২] সহীহ বুখারী, হা/৫১৪৭।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জ্ঞানের উৎস হলো একমাত্র ওহী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন নিরক্ষর নবী। তিনি কেবল নবুওয়াত লাভ করার পরই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আর এ শিক্ষা অর্জন করতেন কেবলমাত্র ওহীর মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ﴾

এসব গায়েবের সংবাদ ওহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি।
(সূরা আলে ইমরান- ৪৪)

অপর আয়াতে বলেন,

﴿تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

এ সমস্ত অদৃশ্যের সংবাদ আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি, যা এর পূর্বে তুমি ও তোমার সম্প্রদায় কেউ জানতে না। সুতরাং ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য। (সূরা হুদ- ৪৯)

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জ্ঞানের একমাত্র উৎস ছিল ওহী। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পূর্বে তিনি ঐ বিষয়ের ভালো-মন্দ কোন কিছুই জানতেন না। নিম্নে এর কিছু নমুনা বর্ণনা করা হলো :

১. ইয়াহুদি মহিলার চক্রান্ত :

একদা এক ইয়াহুদি মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত প্রদান করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে খাবার পেশ করার পূর্বে তাতে বিষ মিশ্রিত করে দেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরে উক্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

যদি তিনি গায়েব সম্পর্কে জানতেন, তাহলে দাওয়াত গ্রহণের পূর্বেই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

২. ইফকের ঘটনা :

ইফকের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরী ৫ম বর্ষে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবীদেরকে নিয়ে বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে তারা ঘটনাক্রমে আয়েশা (রাঃ)-কে একাকী রেখে চলে যান। অতঃপর তিনি সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল নামক এক সাহাবীর সাথে পরে এসে কাফেলায় মিলিত হন। এতে মুনাফিকরা তাদের উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে। যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন এবং এক মাস পর্যন্ত এ অবস্থায়

অতিবাহিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবকিছু জানিয়ে দেন এবং আয়েশা (রাঃ) এর পবিত্রতা ঘোষণা করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তাহলে আয়েশা (রাঃ) এর উপর এ ধরনের নিকৃষ্ট অপবাদ আরোপ করার কোন সুযোগই হতো না এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তার প্রতি কোন ধরনের মনঃক্ষুণ্ন হতেন না। বরং তিনি সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করতেন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

৩. মুনাফিকদের প্রস্থানের ঘটনা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবীদেরকে নিয়ে তাবুক অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন, তখন মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট থেকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে মুনাফিকদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বলে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তাহলে মুনাফিকরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি পেত না এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য ওহীর প্রয়োজন হতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জ্ঞান সীমিত

গায়েবী জ্ঞানের অধিকারী কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে সম্যক অবগত। সুতরাং সীমিত জ্ঞানের অধিকারী কোন সত্তার পক্ষে গায়েবী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অসম্ভব। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। যেমন– কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ জ্ঞান রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا﴾

তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তা কবে সংঘটিত হবে)। বলো, এর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার কাছেই সীমিত। আপনি কি করে জানবেন যে, হয়ত কিয়ামত শীঘ্রই সংঘটিত হবে। (সূরা আহযাব- ৬৩)

ইতিপূর্বে যেসব নবী-রাসূল গত হয়ে গিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সবার ব্যাপারে সবকিছু জানতেন না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের জীবনী থেকে যেসব অংশ জানাতেন, তিনি কেবল সেটুকুই জানতে পারতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদের কারো কথা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং কারো কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। (সূরা মু'মিন- ৭৮)

"রাসূলুল্লাহ ﷺ গায়েব সম্পর্কে জানতেন" এটা দাবি করা শিরক

ইসলামী পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার সত্তা, নাম, সিফাত ও ইবাদাতের মধ্যে কাউকে অংশীদার স্থাপন করাকেই শিরক বলে। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের গুনাহ একনিষ্ঠ তওবা ছাড়া মাফ করেন না এবং তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে পরকালেও তাকে ক্ষমা করেন না। তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক স্থাপন করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা নিসা- ৪৮)

গায়েবের বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সিফাতের সাথে সম্পর্কিত। যার কারণে তার একটি সিফাতী নাম হচ্ছে 'আলিমুল গায়েব' তথা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'আলিমুল গায়েব' বলে দাবি করাটা স্পষ্ট শিরক– চাই তা যে কোন রাসূলের জন্যও হোক। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে এ ধরনের দাবি করবে, তাদেরকে জীবিত থাকা অবস্থাতেই একনিষ্ঠ তওবা করতে হবে। তাহলেই আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমার আশা করা যাবে। অন্যথায় এ গুনাহের কারণে পরকালে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার শিরকী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'হাযির-নাযির' মনে করা যাবে কি না

حَاضِرٌ (হাযির) শব্দের অর্থ হচ্ছে– মওজুদ, বিদ্যমান বা উপস্থিত। আর نَاظِرٌ (নাযির) শব্দের অর্থ হচ্ছে, দ্রষ্টা। যখন এ শব্দ দুটিকে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয় তখন অর্থ হয় ঐ সত্তা, যার দৃষ্টি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার দৃষ্টি একই সময়ে গোটা দুনিয়াকে বেষ্টন করে রাখে এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থা তার দৃষ্টির সামনে থাকে। অর্থাৎ যিনি সর্বস্থানে সর্বময় উপস্থিত থাকেন ও সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বস্থানে হাযির-নাযির নন। বরং তিনি জীবদ্দশায় নির্দিষ্ট স্থানেই ছিলেন। ইন্তেকালের পরও তিনি নির্দিষ্ট স্থানেই রয়েছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো :

১. হাউজে কাউসারের নিকট উম্মতের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাৎ :

সাহল বিন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজে কাউসারের নিকট উপস্থিত হব। যে ব্যক্তি আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে সে হাউজে কাউসারের পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি হাউজে কাউসারের পানি পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোক আমার কাছে আসবে, আমি তাদেরকে চিনব; আর তারাও আমাকে চিনবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন আমি বলব, নিশ্চয় তারা আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার (ইন্তেকালের) পর এরা কী নব আবিষ্কার করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আমি বলব,

سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ

অর্থাৎ দূর হও! দূর হও! যারা আমার পর আমার দ্বীনের পরিবর্তন করেছো।[১৩]
রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি সব জায়গায় হাযির-নাযির হতেন, তাহলে উক্ত সময় ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন হত না। বরং তিনি যাদেরকে বিদআত করতে দেখতেন, তাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে দিতেন না এবং বাকি সবাইকে পানি পান করতে দিতেন।

২. ফেরেশতাগণ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে দরূদ প্রেরণ :

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার একদল ফেরেশতা এমন রয়েছে, যারা সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেন।[১৪]
রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি সব জায়গায় হাযির-নাযির হতেন, তাহলে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তার কবরে দরূদ প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল না।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে শায়িত ব্যক্তিদেরকে চিনতেন না :

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাজ্জারের বাগানে একটি গাধার উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ গাধাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে লাফিয়ে উঠল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। তখন আমরা জানতে পারলাম যে, এখানে চার বা পাঁচ বা ছয়টি কবর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এই কবরগুলোতে শায়িত ব্যক্তিদেরকে কেউ চিন? এক ব্যক্তি উত্তর দিলেন, আমি চিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কবে মারা গেছে? জবাব দেয়া হলো, জাহেলিয়াতের যুগে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কবরে এ উম্মতের পরীক্ষা হয়।[১৫]

---

[১৩] সহীহ বুখারী, হা/৬৫৮৩; ইবনে মাজাহ, হা/৪৩০৬; মিশকাত ২/৪৮৮।
[১৪] নাসাঈ, হা/১২৮২; সুনানে দারেমী, হা/২৮৩০; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৬৬৬।
[১৫] সহীহ মুসলিম, হা/৭৩৯২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১০০০।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি সর্বত্র হাযির-নাযির হতেন, তাহলে উক্ত কবরে শায়িত ব্যক্তিদেরকে চিনতে পারতেন। কিন্তু তিনি চিনতে পারেননি বিধায় তাদের ব্যাপারে সাহাবীগণের কাছে জিজ্ঞেস করে নিলেন।

৪. কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতদেরকে আলামত ছাড়া চিনতে পারবেন না :

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম আমাকে সিজদার অনুমতি দেয়া হবে। আর আমাকেই সর্বপ্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর অনুমতি দেয়া হবে। এরপর আমি আমার সামনের দিকে তাকাব। আমার সামনে উপস্থিত সমস্ত উম্মতের মাঝে আমার উম্মতকে চিনতে পারব, তখন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (কিয়ামতের ময়দানে) নূহ (আঃ) থেকে আপনার উম্মত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের মাঝে আপনার উম্মতকে কীভাবে চিনবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, অযুর কারণে সেদিন তাদের হাত, মুখ ও পা উজ্জ্বল হবে, অন্য উম্মতের তা হবে না।[১৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি সর্বত্র হাযির-নাযির হতেন, তাহলে তো তিনি সমস্ত উম্মতকে কোন আলামত ছাড়াই চিনতে পারতেন। অথচ সেদিন তিনি অযুর আলামত ছাড়া তাদেরকে চিনতে পারবেন না।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচার-ফায়সালা করতেন :

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট গেলেন। তখন তিনি বললেন, আমি একজন মানুষ, আমার কাছে ঝগড়াকারীরা আসে। তাদের মধ্যে হয়তো কেউ অন্যের চেয়ে বেশি বাকপটু। তখন আমি মনে করি সে সত্য বলছে, তাই তার পক্ষে রায় দেই। সুতরাং বিচারে যদি আমি ভুলবশত অপর কোন মুসলিমের হক তাকে দিয়ে দেই, তবে তা জাহান্নামের টুকরা। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে পরিত্যাগও করতে পারে।[১৭]

এই হাদীসটি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষ; তিনি অন্য জাতি নন। তিনি হাযির-নাযির নন। যদি তিনি সর্বস্থানে হাযির-নাযির হতেন, তাহলে কোন সময় তিনি জাহেরী দলীলের উপর নির্ভর করে ঘটনার বিপরীতে রায় দিতেন না এবং ঘটনার বিপরীত রায় গ্রহণ করতে নিষেধও করতেন না।

---

[১৬] সহীহ মুসলিম, হা/৬০৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৯৯৩।

[১৭] সহীহ বুখারী, হা/২৪৫৮; সহীহ মুসলিম, হা/৪৫৭০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৬১৮; মিশকাত, হা/৩৭৬১।

৬. সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাযির-নাযির বিশ্বাস করতেন না :
৪র্থ হিজরীতে সফর মাসে আজল ও কাররাহ গোত্রের লোকদের আবেদনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য দশজন সাহাবীকে আছিম বিন ছাবিতের নেতৃত্বে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন। তারা 'রাজি' নামক স্থানে পৌঁছলে ঐ দুই গোত্রের লোকেরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বনু লেহইয়ানকে তাদের প্রতি হামলা করার ইঙ্গিত দিলে তারা দুইশত লোক নিয়ে তাদের প্রতি আক্রমণ চালায়। এদিকে শত্রুরা আসিম (রাঃ)-কে তার সঙ্গীদের নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বললে তিনি অসম্মতি জানান। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনার নবীকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে দিন।
এ ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সর্বত্র হাযির-নাযির থাকার বিষয়টি বিশ্বাস করতেন না। যদি তারা বিশ্বাস করতেন, তাহলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের অবস্থা জানানোর জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাযির-নাযির মনে করা শিরক :
উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, শারীরিকভাবে কারো পক্ষে সর্বত্র হাযির-নাযির থাকা সম্ভব নয়। এমনকি গুণগত দিক থেকেও কোন সৃষ্টির পক্ষে সর্বত্র হাযির-নাযির থাকা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম দ্বারা সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি বলেন,

﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান এবং আল্লাহ তাঁর জ্ঞান দ্বারা সবকিছুই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (সূরা তালাক্ব- ১২)

মীলাদ ও কিয়াম জায়েয না বিদআত

مِيْلَادٌ (মীলাদ) এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জন্মবৃত্তান্ত। আর পারিভাষিক অর্থে মীলাদ বলা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু আমাদের দেশে মীলাদ মাহফিল বলতে ঐসব অনুষ্ঠানকে বুঝানো হয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসামূলক উর্দূ, ফারসী, আরবি ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন কবিতা পাঠ করা হয় এবং সমস্বরে দরূদ পাঠ করা হয়।
আর قِيَام (কিয়াম) এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, দাঁড়ানো বা দণ্ডায়মান হওয়া। আর পারিভাষিক অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপস্থিতির কারণে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়াকেই কিয়াম বলা হয়। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে মীলাদ পাঠ করার পর পরই কিয়াম করা হয়ে থাকে।

প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামের ভ্রান্তিসমূহ

বর্তমান সমাজে মীলাদ মাহফিল ও কিয়ামের নামে যেসব অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেগুলোতে অনেক ধরনের ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন পালন করা :

মূলত মীলাদ মাহফিলের উৎপত্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দিন জন্ম গ্রহণ করেছেন, সে দিনটিকে বিশেষভাবে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। অথচ এ ধরনের অনুষ্ঠানের কোন অনুমোদন ইসলামে নেই। এরূপ কোন দিবস পালনের রীতি সাহাবী, তাবেঈ, তাবেতাবেঈগণের যুগে ছিল না। অথচ তাদের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهٗ وَيَمِيْنُهٗ شَهَادَتَهٗ

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে সর্বাধিক উত্তম তারাই, যারা আমার যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ সাহাবীগণ)। তারপর তাদের সন্নিকটবর্তী সংযুক্ত যুগের লোক (অর্থাৎ তাবেঈগণ)। তারপর তাদের সংযুক্ত যুগ (অর্থাৎ তাবে তাবেঈগণ)। অতঃপর এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা শপথের পূর্বে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে শপথ করবে।[১৮]

সুতরাং সওয়াবের আশায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সহ যে কারো জন্মদিন পালন করাই বিদআত। কেননা দিবস পালনের এ বিষয়টি উপরোক্ত সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সালফদের যুগে ছিল না।

২. বিদআতী দরূদ পাঠ করা :

মীলাদকে কেন্দ্র করে আরো একটি মারাত্মক বিদআত বর্তমান সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আর সেটা হলো, বিদআতী দরূদ পাঠ করা অর্থাৎ সেসব অনুষ্ঠানগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যেভাবে দরূদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং সহীহ হাদীসসমূহে যেসব দরূদ পাওয়া যায়, সেগুলো পাঠ করা হয় না। বরং নিজেদের মনগড়া নানা প্রকার দরূদ পাঠ করা হয়।

৩. কিয়ামের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত হন বলে মনে করা :

এসব মীলাদ অনুষ্ঠান পালনের অন্যতম একটি অংশ হচ্ছে কিয়াম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে দরূদ পাঠ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নাকি

---

[১৮] সহীহ বুখারী, হা/২৬৫২; সহীহ মুসলিম, হা/৬৬৩২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৯৬৩; মিশকাত, হা/৩৭৬৭।

সামনে উপস্থিত হন, ফলে তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো হয়। অথচ এ ধরনের কোন রীতিনীতি ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ তিন যুগেও ছিল না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপস্থিত হওয়ার বিষয়টিও একেবারেই ভ্রান্ত।

মীলাদ মাহফিলের হুকুম

প্রকৃতপক্ষে মীলাদ মাহফিল বলতে যা বুঝায় তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করা একটি উত্তম কাজ। ফলে এর জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা করা যায়। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে যেভাবে মীলাদ মাহফিল পালন করা হয়, সেটা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এটা অনেক প্রকার বিদআত ও শিরকী কর্মকাণ্ডের দ্বারা পরিপূর্ণ। যেমন– বিশেষ নিয়মে নানা ধরনের দরূদ পাঠ করা, কবিতা পাঠ করা, কিয়াম করা ইত্যাদি।

১। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করা, যিকির-আযকার করার মাঝে সওয়াব রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে জীবনবৃত্তান্ত আলোচনার জন্য সুন্নত গর্হিত যে নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, এই নিয়ম সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনদের কোন যুগেই ছিল না। এর দ্বারা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে।

২। মীলাদ মাহফিল সাহাবায়ে কেরামের যুগ, তাবেঈনদের যুগ ও তাবে তাবেঈনদের যুগ– মর্যাদাপূর্ণ এই তিন যুগে ছিল না বিধায় তা বিদআত ও গর্হিত কাজ।

প্রচলিত মীলাদ মাহফিলের ইতিহাস

প্রকৃতপক্ষে ইসলামে মীলাদ মাহফিল নামে পৃথক কোন দিবসের কথা উল্লেখ নেই। বর্তমানে আমাদের সমাজে মীলাদ মাহফিল নামে যা কিছুর প্রচলন আছে সেগুলোর কোন অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনদের যুগে ছিল না। এমনকি এর পরবর্তীতেও তথা ৬০০ হিজরী পর্যন্তও এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত।

সর্বপ্রথম মীলাদ মাহফিল চালু হয় ৬০৪ হিজরীতে ইরাকের মসুল শহরে। এ সময় এটি কেবল চিত্তবিনোদন হিসেবে চালু হয়।[১৯] তখনকার বাদশা মুজাফফর উদ্দীন ইবনে আরবালের নির্দেশে আবুল খাত্তাব উমর বিন মুহাম্মাদ মসুলী নামক জনৈক নামধারী আলেম এর সূচনা করেন। অথচ আবুল খাত্তাব উমর বিন মুহাম্মাদ কোন মুজতাহিদ বা মুহাদ্দিস ছিলেন না; বরং ইলম ও সম্মানের দিক দিয়ে তিনি একজন অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। প্রচলিত মীলাদের সূচনা করার কারণে সে যুগের বিজ্ঞ আলেম ও মহামনীষীগণ তীব্র ও

---

[১৯] তারিখে মীলাদ পৃ: ১৩।

কঠিন ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন। আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী (রহ.) বলেন, প্রচলিত মীলাদ আবিষ্কার করেছে ভ্রষ্ট ও চিত্তপূজারী লোকেরা। আর পেটপূজারী লোকেরা এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে।[২০]
আর অপরদিকে বাদশা মুজাফফর উদ্দীন ছিল অপচয়কারী ও ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন। সে উলামায়ে কেরামকে অন্যের মাযহাব বর্জন করে নিজ নিজ ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুসারে চলার নির্দেশ দিত। সে মীলাদ মাহফিল চালু করে দুনিয়ালোভী দরবারী মৌলভী দ্বারা মীলাদের স্বপক্ষে দলীলাদী জমা করত। প্রজাদের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত রাখার জন্য মীলাদের আয়োজন করত। মীলাদের দিন তার জন্য এবং স্ত্রীর জন্য সুরমা কাঠের গম্বুজাকৃতির তাঁবু তৈরি করার নির্দেশ দিত। কয়েকদিন পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলত। বাদশা মুজাফফর প্রতিদিন আসরের পর সেখানে আসত এবং অনুষ্ঠান উপভোগ করত।

কিয়ামের সূচনা

বর্তমানে কিয়াম মীলাদ মাহফিলের অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইসলামে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া যখন মীলাদ মাহফিলের সূচনা হয়, তখনও কিয়ামের সূচনা হয় নাই। বরং এরও অনেক পরে ৭৫৫ হিজরীতে কিয়ামের সূচনা হয়। বর্ণিত আছে যে, এ সময় খাজা তাক্বী উদ্দীন মালেকী (রহ.) এর দরবারে একদা ফাতেমীয় কবি ইয়াহইয়া ইবনে ইউসুফ উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শানে কিছু গজল ও কবিতা আবৃত্তি করল। যখন সে এই পংক্তিতে পৌঁছল-

وَاِنْ تَنْهَضِ الْاَشْرَافُ عِنْدَ سِمَاعِهِ
قِيَامًا صُفُوْفًا وَجَيْشًا عَلَى الرَّكْبِ

অর্থাৎ "যে সম্মানিত ব্যক্তিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর না'ত শ্রবণ করার সময় কাতার বন্দী হয়ে অথবা সওয়ারীর উপর একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন।" তখন খাজা সাহেবের মনে জযবা এসে গেল। ফলে তিনি দাঁড়িয়ে যান। তখন তার ভক্তবৃন্দ যারা উপস্থিত ছিল সকলেই তার সম্মান রক্ষার্থে দাঁড়িয়ে যায়। পরবর্তীতে শিয়া সম্প্রদায়ের উপদল ইমামী আলেমগণ এই দাঁড়ানোকে মীলাদ মাহফিলের অত্যাবশ্যকীয় অংশরূপে নির্ধারিত করে দেন। উল্লেখ্য যে, যিনি মীলাদের সূচনা করেছেন তিনি কিয়াম করেননি। আর যিনি কিয়ামের সূচনা করেছেন তিনি মীলাদ করেননি। অথচ বর্তমানে মীলাদ পন্থীরা কিয়ামকে মীলাদের অংশ সাব্যস্ত করে নিয়েছেন।

---

[২০] তারিখে মীলাদ পৃঃ ১৮।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুকে বিশ্বাস না করার আকীদা ভুল

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যু সম্পর্কেও বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকে তাঁর মৃত্যুকে বিশ্বাস করতে রাজি নয়। অথচ কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾

নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। (সূরা যুমার- ৩০)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর ব্যাপারে যে শব্দটি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন ঠিক একই শব্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন। বলা হয়েছে,

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ﴾

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া- ৩৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্বে যত নবী আগমন করেছেন তাঁরাও মৃত্যুবরণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। চিরস্থায়ী জীবন আল্লাহ কাউকেই দেননি।

উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, তখন সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে নিরাশ হয়ে পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

﴿أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ﴾

অনন্তর যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? (সূরা আলে ইমরান- ১৪৪)

যুবাইর বিন মুতইম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে কিছু কথা বলল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য কোন সময় তাকে আবার আসার জন্য বললেন। মহিলা বলল,

أَرَأَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ

হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি এসে আপনাকে না পাই (তাহলে আমি কী করব)? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি আমাকে না পাও তাহলে আবু বকর এর সাথে কথা বলবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথার মাধ্যমে মহিলা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর প্রতি ইশারা করছিল।[২১]

---

[২১] সহীহ বুখারী, হা/৭৩৬০; তিরমিযী, হা/৩৬৭৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৮০১।

এ ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে সাহাবীগণের এরূপ আকীদা ছিল না যে, রাসূলুলাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করবেন না বা তিনি মারা যাননি অথবা মৃত্যুর পর তিনি উম্মতকে কোন সাহায্য করতে পারবেন।

নবুওয়াতী জীবনের শুরু থেকে মুহাম্মাদ ﷺ এর ব্যাপারে যেসব ভুল ধারণা ও অভিযোগ ছিল

বর্তমান সময়ে যেভাবে নবী ﷺ সম্পর্কে মানুষ নানা ধরনের ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। তিনি জীবিত থাকাবস্থাতেও কাফির-মুশরিকরা তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণায় লিপ্ত ছিল। ফলে তারা তাঁর ব্যাপারে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করত। এসকল অভিযোগের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন এবং এর যথাযথ জবাব দিয়েছেন। নিচে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করা হলো ঃ

মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল বলে স্বীকার না করা

নবীর ব্যাপারে কাফির মুশরিকদের যত ভুল ধারণা ও অভিযোগ ছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল বলে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। তারা তাঁর রিসালাতকে সরাসরি অস্বীকার করত। তাদের এ ভুল ধারণার জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন–

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾

যারা কুফরী করে তারা বলে, তুমি তো রাসূল নও। বলো, আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে, তারাই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (সূরা রা'দ- ৪৩)

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিররা যদিও নবী ﷺ-কে রাসূল মানতে রাজি নয়, কিন্তু আসলে তিনি একজন রাসূল। আল্লাহ এবং কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী যারা, তাদের সাক্ষ্যই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এটা কেউ স্বীকার করুক বা না করুক তাতে কিছু যায়-আসে না।

মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকার করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরোধিতাকারীদের অভিযোগগুলোর মধ্যে আরো একটি অভিযোগ ছিল যে, ওহীর মাধ্যমে তার কাছে যা নাযিল হতো, তা যখন তিনি মানুষের কাছে প্রকাশ করতেন, তখন তারা বলত- তিনি আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছেন। তাদের এ ভুল ধারণার জবাব নিচের আয়াতের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে–

﴿اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ﴾

তারা কি বলে যে, সে (রাসূল) আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়েছে? (অথচ) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয়ে মোহর মেরে দিতে পারতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি (মানুষের) অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা শূরা- ২৪)

নবী ﷺ মানুষ হওয়াতে অভিযোগ

নবী ﷺ এর ব্যাপারে কাফির-মুশরিকদের আরো একটি অভিযোগ এ ছিল যে, আল্লাহ যদি কাউকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন, তাহলে তিনি মানুষ হবেন কেন? তাদের ধারণা ছিল যে, কেউ রাসূল হলে তিনি ফেরেশতার মধ্য থেকে হতে পারেন।

নবীগণ মানুষ হওয়াতে সকল যুগেই আপত্তি ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْاۤ اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْاۤ اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا﴾

যখনই মানুষের কাছে (আল্লাহর কাছ থেকে) হেদায়াত আসত, তখনই তাদের ঈমান আনা থেকে এ ছাড়া অন্য কোন জিনিসই বিরত রাখেনি যে, তারা বলত- আল্লাহ কি (আমাদের মতো) একজন মানুষকেই নবী করে পাঠালেন! (সূরা বনী ইসরাঈল- ৯৪)

আল্লাহ তা'আলা নিচের আয়াতগুলোর মাধ্যমে তাদের এ ভুল ধারণা ও অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَاسْاَلُوْاۤ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ- وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ﴾

তোমার পূর্বে যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং যাদের প্রতি ওহী করতাম তারা সকলেই মানুষ ছিল। (এ বিষয়ে) তোমরা যদি না জেনে থাক, তবে (অবতীর্ণ) কিতাবের জ্ঞান যাদের কাছে আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। (তাছাড়া) আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য খেত না। আর তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (সূরা আম্বিয়া- ৭, ৮)

﴿قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا﴾

বলো, ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্তে পৃথিবীতে বিচরণ করত, তবে অবশ্যই আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকে তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৯৫)

একজন মানুষকেই নবী বানিয়ে পাঠানোর পেছনে যে নিগূঢ় যৌক্তিকতা নিহিত ছিল, মহান আল্লাহ সে যৌক্তিকতাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা কাগজে সরাসরি ছাপিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের হাতে পৌছানো যেত। কিন্তু ওহী অবতরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চান তা হলো, একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তা নিয়ে আসবেন। তিনি তা থেকে একটু একটু করে লোকদের সামনে পেশ করবেন। যারা এর কোন কথা বুঝতে পারবে না, তাদেরকে তার অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। এর কোন ব্যাপারে যাদের সন্দেহ থাকবে, তাদের সন্দেহ দূর করে দেবেন। কোন ব্যাপারে যাদের আপত্তি ও প্রশ্ন থাকবে, তাদের আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব দেবেন। যারা তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে এবং এর অগ্রগতিতে বাধা দিতে এগিয়ে আসবে, তাদের মোকাবেলায় তিনি এমন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করবেন– যা এ যিকির বা আল্লাহর বাণীর ধারকদের জন্য উপযোগী। যারা মেনে নেবে তাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পথনির্দেশনা দেবেন। নিজের জীবনকে তাদের সামনে আদর্শ হিসেবে পেশ করবেন। তাদেরকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে অনুশীলন দান করে সারা দুনিয়ার সামনে এমন একটি সমাজ আদর্শ হিসেবে তুলে ধরবেন, যার সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা হবে আল্লাহর কিতাবের বাস্তব প্রতিফলন।

নবী ﷺ খাওয়া-দাওয়া ও হাট-বাজার করার কারণে অভিযোগ

কাফির-মুশরিকদের একটি ভুল ধারণা হচ্ছে এই যে, যিনি রাসূল হবেন তিনি খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন না। হাট-বাজারে চলাফেরা করতে পারবেন না। তিনি হবেন মানুষ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির কেউ। কুরআন মাজীদে এসেছে,

﴿وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِى الْاَسْوَاقِ ۙ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا﴾

তারা বলে, সে কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করে। তার নিকট কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না, যে সতর্ককারী হিসেবে তার সঙ্গে থাকত? (সূরা ফুরক্বান- ৭)

একজন রক্ত-মাংসের মানুষ, যে জীবিত থাকার জন্য খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়, সে কেমন করে আল্লাহর বাণী নিয়ে আসে? আর যদি মানুষকেই রাসূল বানানো হয়ে থাকে, তবে তাকে তো অন্তত বাদশাহ অথবা দুনিয়ার বড় লোকদের মতো উন্নত পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত ছিল, যাকে দেখার জন্য চোখ উন্মাদ হয়ে থাকত এবং অনেক সাধনার পর তার দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য হতো। কিন্তু তা না হয়ে এমন একজন সাধারণ লোককে কীভাবে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হলো, যে বাজারে যায়। একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে চলাফেরা করে, সেও সেভাবে চলাফেরা করে এবং কোন দিক দিয়েই তার মধ্যে কোন অসাধারণত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং কীভাবে তাকে গ্রহণ করা যায়?

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, উম্মতকে সর্ব ক্ষেত্রে দ্বীন শিক্ষা দিতে হলে এমন একজন নবী হওয়া দরকার যিনি নিজে খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং হাট-বাজার করবেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলই হাট-বাজারে চলাফেরা করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ﴾

তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই আহার করত ও হাট-বাজারে চলাফেরা করত। (সূরা ফুরক্বান- ২০)

নবী ﷺ এর স্ত্রী-সন্তান থাকাতে অভিযোগ

কাফির-মুশরিকদের আরো একটি ভুল ধারণা হচ্ছে, যিনি নবী হবেন তিনি বিয়ে শাদী করবেন না। তার সন্তান-সন্ততীও হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে তাদের এই ভুল ধারণা খণ্ডন করে জানিয়ে দিলেন যে, শুধু মুহাম্মাদ ﷺ এর ক্ষেত্রেই নয়, বরং পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন, সকলেরই পরিবার-পরিজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ﴾

তোমার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা রা'দ- ৩৮)

অধিক বিয়ের কারণ :

মুহাম্মাদ ﷺ এগার জন নারীকে বিয়ে করেছিলেন। এর প্রকৃত কারণ না জানার কারণে এ সম্পর্কে অনেকে ভুল ধারণার শিকার হয়েছে।

এ বিষয়টি বুঝতে হলে নবী ﷺ-কে আল্লাহ যে মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, তা অনুধাবন করা জরুরি। নবী ﷺ-কে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা ছিল এই যে, তিনি একটি জাতিকে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ের জাতিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়াই যথেষ্ট ছিল না। বরং মহিলাদেরকেও প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার ছিল। আর মহিলাদের মধ্যে কাজ করার কেবলমাত্র একটি পথই তাঁর জন্য খোলা ছিল; সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদেরকে তিনি বিয়ে করবেন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দান করে নিজের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত করবেন। তারপর তাদের সাহায্যে নগরবাসী ও মরুচারী, যুবতী ও বৃদ্ধা সবধরনের নারীদেরকে দ্বীন ও নৈতিকতার নতুন নীতিসমূহ শিখানোর ব্যবস্থা করবেন।

এছাড়াও নবী ﷺ-কে জাহেলী জীবনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল। এ দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য জাহেলী জীবনব্যবস্থার পতাকাবাহীদের সাথে যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল। এ অবস্থায় অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন পরিবারে বিয়ে করে বন্ধুত্বকে পাকাপোক্ত এবং বহুতর শত্রুতাকে খতম করার ব্যবস্থা করাও তাঁর জন্য জরুরি ছিল। তাই তিনি যেসব মহিলাকে বিয়ে করেন তাঁদেরকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলি ছাড়াও এসব বিষয়ও কমবেশি জড়িত ছিল। আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)-কে বিয়ে করে তিনি আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) এর সাথে নিজের সম্পর্ককে মজবুত করে নেন। উম্মে সালামা (রাঃ) ছিলেন এমন এক পরিবারের মেয়ে, যার সাথে ছিল আবু জাহেল ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সম্পর্ক। উম্মে হাবীবা (রাঃ) ছিলেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। এ বিয়েগুলো সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর শত্রুতার জের অনেকাংশ কমিয়ে দেয়। বরং উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর সাথে নবী ﷺ এর বিয়ে হওয়ার পর আবু সুফিয়ান আর কখনো তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি। সাফিয়া, জুওয়াইরিয়া ও রাইহানা (রাঃ) ইয়াহুদি পরিবারের মেয়ে ছিলেন। তাঁদেরকে যুদ্ধবন্দী থেকে মুক্তি দিয়ে যখন নবী ﷺ নিজেই তাঁদেরকে বিয়ে করে নেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াহুদিদের তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ সে যুগের রীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির সাথে কোন গোত্রের মেয়ের বিয়ে হতো তাঁকে কেবল মেয়েটির পরিবারের নয়, বরং সমগ্র গোত্রের জামাতা মনে করা হতো এবং জামাতার সাথে যুদ্ধ করা বড়ই লজ্জাকর ছিল। সমাজের কার্যক্রম সংশোধন এবং এর জাহেলী রসম রেওয়াজ নির্মূল করাও নবী ﷺ এর অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কাজেই এ উদ্দেশ্যেও তাঁকে বিয়ে করতে হয়। জাহেলী যুগে পালক পুত্রের মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ মনে করা হতো না। এ কুপ্রথাকে বাতিল করার জন্য তিনি তাঁর পালক পুত্র যায়েদের স্ত্রী যয়নাবকে বিয়ে করেন।

এসব কারণে বিয়ের ব্যাপারে নবী ﷺ এর জন্য কোন রকম সংকীর্ণতা ও অসুবিধা রাখা হয়নি। এর ফলে যে মহান দায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পিত হয়েছিল তা বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিয়ে করেছেন।
তিনি এ সমস্ত বিয়ে করেন প্রচার ও শিক্ষামূলক প্রয়োজনে অথবা সমাজ সংস্কারার্থে কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

নবী ﷺ এর ধন-সম্পদ না থাকার কারণে অভিযোগ

নবী ﷺ সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের আরো একটি ভুল ধারণা ছিল এই যে, যিনি নবী হবেন, তাকে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হতে হবে। অথচ তাদের এই অভিযোগটিও ছিল একেবারেই ভিত্তিহীন। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অভিযোগের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا - اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيْرًا - اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَآئِكَةِ قَبِيْلًا - اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهٗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا﴾

তারা বলে, আমরা কখনই তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে একটি নদী প্রবাহিত করবে, অথবা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকবে– যার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র ধারায় প্রবাহিত করবে নদী-নালা, অথবা তুমি যেমন বলে থাক তদানুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ করাতেও আমরা কখনো ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে, যা আমরা পাঠ করব। (হে নবী!) বলো, আমার প্রতিপালক খুবই পবিত্র ও মহান! আমি তো একজন মানুষ ও একজন রাসূল মাত্র। (সূরা বনী ইসরাঈল, ৯০-৯৩)
আল্লাহ তা'আলা নিচের আয়াতের মাধ্যমে তাদের এ ভুল ধারণা ও অভিযোগ খণ্ডন করেছেন–

﴿تَبَارَكَ الَّذِيْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا - بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا﴾

তিনি কতই না মহান, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু দিতে পারেন– (যেমন) উদ্যানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নদী-নালাসমূহ

প্রবাহিত হবে এবং তিনি তোমাকে (আরো) দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। কিন্তু তারা (কাফিররা) কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে। আর যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(সূরা ফুরক্বান- ১০, ১১)

নবী ﷺ এর মজলিসে গরীব লোকেরা থাকাতে অভিযোগ

কাফির-মুশরিকদের স্বভাব হলো, তারা সর্বদা আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রেখে চলে। তারা গরীবদের সাথে চলাফেরাকে নিজেদের মর্যাদাহানীর কারণ মনে করে। ফলে যখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে আসত, তখন তারা উক্ত বৈঠক থেকে গরীবদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আবেদন জানাত। অথচ তাদের এ দাবিটি ছিল ইসলাম আগমনের উদ্দেশ্যের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব অযৌক্তিক দাবির জবাব দিয়ে বলেন,

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করো না। তাদের কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে; (যদি কর তবে) তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম- ৫২)

আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভুল ধারণা

কাফিররা সবসময় এ ধারণা পোষণ করত যে, তাদের উপর আযাব আসবে না। কেননা তারা সৎ পথে আছে। ফলে তারা কখনো আল্লাহর আযাবের ভয় করত না। অথচ তাদের এ ধরনের ধারণাও ছিল অবান্তর। আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব ধারণার জবাবে বলেন,

﴿قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ - قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ﴾

বলো, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছ। যা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও (অর্থাৎ আল্লাহর আযাব) তা আমার আয়ত্তে নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন; আর ফায়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই

শ্রেষ্ঠ। বলো, তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছ তা যদি আমার নিকট থাকত, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফায়সালা হয়েই যেত। তবুও আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আন'আম- ৫৭, ৫৮)

মুহাম্মাদ ﷺ-কে লেজকাটা বলে দোষারোপ করা

নবী ﷺ এর পুত্র ইবরাহীম মারা গেলে মক্কার মুশরিকরা একে অপরকে বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মাদ লেজকাটা হয়ে গেছে। মুশরিকদের এ সকল অশালীন উক্তির কারণে নবী ﷺ কষ্ট পেতেন। বিপদের সময় নিজের আত্মীয়-স্বজন পাশে দাঁড়ানোর কথা, কিন্তু তারাই তাঁর কষ্টকে আরো বাড়িয়ে তুলছিল। এ বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করে নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দেন,

﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

(হে নবী!) অবশ্যই আমি তোমাকে কাওসার (নিয়ামতের ভাণ্ডার) দান করেছি। অতএব তুমি (আমাকে স্মরণের জন্য) নামায কায়েম করো এবং (আমারই উদ্দেশ্যে) কুরবানী করো, নিশ্চয় (পরিশেষে) তোমার নিন্দুকেরাই হবে লেজকাটা (অসহায়)। (সূরা কাওসার)

নবী ﷺ-কে পাগল বলে দোষারোপ করা

মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে ইসলামের দুষমনরা যেসব দোষারোপ করত তার মধ্যে অন্যতম একটি ছিল, তারা নবী ﷺ-কে পাগল বলে আখ্যায়িত করত। তাদের এসব দোষারোপের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ - مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ﴾

নূন। শপথ কলমের এবং তারা (ফেরেশতাগণ) যা লিপিবদ্ধ করে তার। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও। (সূরা ক্বালাম- ১, ২)

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ﴾

আর তোমাদের সাথি (মুহাম্মাদ) পাগল নয়। (সূরা তাকভীর- ২২)

নবী ﷺ-কে গণক বলে দোষারোপ করা

নবী ﷺ যত দোষারোপের শিকার হয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল যে, মানুষ তাকে গণক বলত। তাই আল্লাহ তা'আলা এ দোষারোপের প্রতিবাদ করে বলেন,

﴿فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ﴾

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি গণক নও এবং উন্মাদও নও। (সূরা তূর- ২৯)

সকল যুগেই নবীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে নানা ভুল ধারণা পোষণ করা হয়েছে।

নবী ﷺ-কে যাদুকর বলে দোষারোপ করা

নবী ﷺ এর বিরোধীরা নবী ﷺ এর প্রতি যত ধরনের অপবাদ ও দোষারোপ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, তারা তাঁকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করেছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ - اَتَوَاصَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ﴾

এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা বলেছে, তুমি তো এক যাদুকর অথবা উন্মাদ। তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে এসেছে? বস্তুত তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা যারিয়াত- ৫২, ৫৩)

কাফির-মুশরিকরা নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল

বর্তমান যুগের কাফির-মুশরিকরা এবং কাফির-মুশরিকদের আদর্শ বাস্তবায়নকারী নামধারী মুসলিমরা যেভাবে ইসলামের বিধানকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে এবং মুসলিমদের উপর যুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, অনুরূপভাবে মক্কার কাফিররাও নবী ﷺ এর বিরোধিতা করেছে এবং মুসলিমদের উপর নানা ধরনের যুলুম নির্যাতন চালিয়েছে। আর এসব ছিল তাদের কুফরী ও মুনাফিকী আচরণের কারণে। তাদের খারাপ আচরণের দিকগুলো আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে আলোচনা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো;

১. তারা আল্লাহর নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত :

﴿وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ﴾

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তারা এগুলো প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা ইউসুফ- ১০৫)

﴿وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ﴾

তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলির যে কোন নিদর্শনই তাদের কাছে আসে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা ইয়াসীন- ৪৫, ৪৬)

২. তারা গোপনে শলা-পরামর্শ করত :

﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ﴾

যারা যালিম তারা গোপনে পরামর্শ করে যে, এ তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখে-শুনে যাদুর কবলে পড়বে?

(সূরা আম্বিয়া- ৩)

৩. নবী ﷺ-কে কুরআন থেকে দূরে রাখতে চাইত :

﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا - وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾

আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি, তারা তা হতে পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল, যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর। (এতে যদি তারা সফল হতো) তবে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত। আমি তোমাকে অবিচল না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় ঝুঁকে পড়তে। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭৩, ৭৪)

৪. কুরআন শুনলে পাশ কাটিয়ে চলে যেত :

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে অহংকারবশত এমনভাবে ফিরে যায়, যেন সে কিছুই শুনতে পায়নি; যেন তার কর্ণদ্বয়ের মধ্যে ছিপি রয়েছে। অতএব তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

(সূরা লুক্বমান- ৭)

৫. তারা বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে চাইত না :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার আনুগত্য করো; তখন তারা বলে, বরং আমরা তো তার আনুগত্য করব, যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি। যদিও শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে আহ্বান করতে থাকে তবুও কি (তারা তাদের অনুসরণ করবে)? (সূরা লুক্বমান- ২১)

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বর্তমান সময়ে অনেক নামধারী মুসলিমদের মধ্যেও এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

৬. ইসলামের শত্রুরা মানুষের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি করত :

﴿وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ﴾

যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে (বলে), সে তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ; তবুও কি তোমরা দেখে-শুনে যাদুর কবলে পড়বে? (সূরা আম্বিয়া- ৩)

নবী ﷺ সম্পর্কে বিরোধীরা নানা ধরনের কথা বলত। কখনো বলত, এ ব্যক্তি যাদুকর। কখনো বলত, সে নিজেই কিছু বাণী রচনা করে বলছে– এটা আল্লাহর বাণী। কখনো বলত, কিছু কাব্যিক ছন্দকে সে আল্লাহর বাণী নাম দিয়েছে। কখনো বলত, এগুলো আবার এমন কি বাণী! এগুলো তো পাগলের প্রলাপ এবং অহেতুক চিন্তা ধারার একটা আবর্জনার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলত এসব সমালোচনার উদ্দেশ্যই ছিল লোকদেরকে প্রতারিত করা। ফলে তারা কোন একটি কথার উপর অবিচল থেকে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। কিন্তু মিথ্যা প্রচারণার ফল যা হলো তা হচ্ছে, তারা নিজেরাই নবী ﷺ এর নাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। মুসলিমদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় যে প্রচার ও পরিচিতি হওয়া সম্ভব ছিল না, কুরাইশদের এ বিরোধিতার ফলে অল্প কিছু সময়েই তা হয়ে গেল। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একটি প্রশ্ন জাগল, যার বিরুদ্ধে এতো মারাত্মক অভিযোগ, কে সেই ব্যক্তি? অনেকে ভাবল, তার কথা তো শোনা উচিত। আমরা তো আর দুধের শিশু নই যে, অযথা তার কথায় পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। তুফাইল ইবনে আমর বলেন, আমি দাওস গোত্রের একজন কবি ছিলাম। একদা কোন কাজে মক্কায় গিয়েছিলাম। সেখানে পৌছতেই কুরাইশদের কয়েকজন লোক আমাকে ঘিরে ফেলল এবং নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কথা বলল। ফলে তাঁর সম্পর্কে আমার মনে খারাপ ধারণা জন্মাল। আমি ভাবলাম, তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকব। পরদিন আমি দেখলাম তিনি কা'বাগৃহের কাছে নামায পড়ছেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত কয়েকটি বাক্য আমার কানে আসলে আমি অনুভব করলাম, বড় চমৎকার বাণী। মনে মনে বললাম– আমি কবি, যুবক ও বুদ্ধিমান। আমি কোন শিশু নই যে, ঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব না। তাহলে এ ব্যক্তি কী বলেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করি না কেন? অতঃপর নবী ﷺ যখন নামায শেষ করে চলে যেতে লাগলেন তখন আমি তাঁর পিছু নিলাম। তাঁর গৃহে পৌছে তাঁকে বললাম, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার সম্পর্কে আমাকে এসব কথা বলেছিল, ফলে আমি আপনার ব্যাপারে এতই খারাপ ধারণা করেছিলাম যে, নিজের কানে তুলা দিয়েছিলাম, যাতে আপনার কথা শুনতে না পাই। কিন্তু একটু আগে যে কয়েকটি বাক্য আমি আপনার মুখ থেকে শুনেছি তা আমার

কাছে বড়ই চমৎকার মনে হয়েছে। আপনি কী বলেন, আমাকে একটু বিস্তারিত জানান। জবাবে নবী ﷺ আমাকে কুরআনের একটি অংশ শোনালেন। তাতে আমি এত বেশি প্রভাবিত হলাম যে, তখনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম। সেখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি নিজের পিতা ও স্ত্রীকে মুসলিম বানালাম। এরপর নিজের গোত্রের মধ্যে অবিরাম ইসলাম প্রচারের কাজ করতে লাগলাম। এমনকি খন্দকের যুদ্ধের সময় পর্যন্ত আমার গোত্রের সত্তর/আশিটি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল।[২২]

৭. কুরআন প্রচারের সময় গোলমাল সৃষ্টি করত :

কাফিররা যেসব পরিকল্পনার মাধ্যমে নবী ﷺ এর প্রচারকে ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছিল, এটি ছিল তার অন্যতম। তারা মনে করত, এরকম উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মুখ থেকে এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে এই নজিরবিহীন বাণী যে-ই শুনবে সে-ই ঘায়েল হয়ে যাবে। অতএব তারা পরিকল্পনা করল যে, তারা এ বাণী নিজেরাও শুনবে না এবং অন্য কাউকে শুনতেও দেবে না। মুহাম্মাদ ﷺ যখনই তা শোনাতে আরম্ভ করবেন, তখনই তারা হৈ চৈ শুরু করে দেবে। তালি বাজাবে, বিদ্রূপ করবে এবং চিৎকার জুড়ে দেবে। তারা আশা করত, এ কৌশল অবলম্বন করে তারা আল্লাহর নবীকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ﴾

কাফিররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না; বরং তা তিলাওয়াতকালে শোরগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। (সূরা সাজদা- ২৬)

৮. গান-বাজনার আসর বসিয়ে মানুষকে ব্যস্ত রাখত :

কাফিরদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন এ দাওয়াত সম্প্রসারিত হয়েই চলছিল তখন নযর ইবনে হারিস কুরাইশ নেতাদেরকে বলল, তোমরা যেভাবে এ ব্যক্তির মোকাবেলা করছ, তাতে কোন কাজ হবে না। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সে ছিল তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোক। এখন তোমরা বলছ, সে যাদুকর ও পাগল। এ কথা কে বিশ্বাস করবে? থামো, এ রোগের চিকিৎসা আমিই করব। এরপর সে মক্কা থেকে ইয়ামেন চলে যায়। সেখান থেকে অনারব বাদশাহদের কিসসা-কাহিনী সংগ্রহ করে মক্কায় ফিরে এসে গল্পের আসর জমিয়ে তুলতে লাগল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, এভাবে লোকেরা কুরআনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং এসব কাহিনীর মধ্যে ডুবে যাবে।[২৩] এভাবে তারা জনগণকে খেল-তামাশা ও নাচগানে মশগুল করতে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[২২] সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ২২-২৪ পৃঃ ।
[২৩] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩২০-৩২১ পৃঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾

মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অজ্ঞতাবশত অমূলক কাহিনী ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহর দেখানো পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানিয়ে নেয়। এদের জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (সূরা লুক্বমান- ৬)

لَهْوَ الْحَدِيْثِ 'লাহওয়াল হাদীস' এমন কথা, যা মানুষকে অন্য সবকিছু থেকে গাফিল করে দেয়। এ শব্দটি খারাপ ও অর্থহীন কথা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কিসসা-কাহিনী, হাসি-ঠাট্টা এবং গান-বাজনা ইত্যাদি। 'লাহওয়াল হাদীস' কিনে নেয়ার অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি সত্য কথাকে বাদ দিয়ে মিথ্যা কথা গ্রহণ করে এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন কথার প্রতি আগ্রহী হয়, যার মধ্যে দুনিয়াতেও কোন মঙ্গল নেই এবং আখিরাতেও নেই। এর প্রকৃত অর্থ এই যে, মানুষ তার নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কোন বাজে জিনিস ক্রয় করে। লোকেরা এসব সাংস্কৃতিক অপতৎপরতায় ডুবে গিয়ে আল্লাহ, আখিরাত ও নৈতিক চরিত্রের কথা শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এর পরিণামে আল্লাহ তাকে কঠিন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দান করবেন।

৯. নবী ﷺ-কে নামায পড়তেও বাধা দিত :

মুসলিমদের প্রধান ইবাদাত হচ্ছে নামায। কাফির-মুশরিকরা এটাকে কোনভাবে সহ্য করতে পারত না। ফলে মক্কার কাফির-মুশরিকরা নবী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখলে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করত।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু জাহেল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মাদকে কাবার পাশে সালাত আদায় করতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করব। এ কথা জানতে পেরে নবী ﷺ বললেন, সে যদি এমনটি করে তাহলে ফেরেশতারা অবশ্যই তাকে পাকড়াও করবে। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়,

﴿اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى - عَبْدًا اِذَا صَلّٰى - اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى - اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى﴾

তুমি কি এমন এক বান্দাকে দেখেছ, যখন সে নামায পড়ে তখন তারা (কাফিররা) তাকে নিষেধ করে? তুমি কি এটাও লক্ষ্য করেছ যে, যদি সে সৎপথে থাকে অথবা আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয় তখনও (তাকে নিষেধ করে?)
(সূরা আলাক্ব, ৯-১২)

১০. নবী ﷺ এর উপর যাদু করেছে :

হুদায়বিয়া সন্ধির পর মহানবী ﷺ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বার হতে একদল ইয়াহুদি মদিনায় আগমন করে বিখ্যাত যাদুকর লাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা বলল, আমরা

মুহাম্মাদকে ধ্বংস করার জন্য বহুবার যাদু করার চেষ্টা করেছি; কিন্তু তাতে সফল হতে পারিনি। আমরা তোমাকে তিনটি আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা) দিচ্ছি, তুমি তার ওপর খুব শক্ত আকারের যাদু করো। এ সময় এক ইয়াহুদি ছেলে নবী ﷺ এর খাদিম ছিল। তারা তার সাথে যোগাযোগ করে নবী ﷺ এর চিরুনির একটি অংশ সংগ্রহ করে নিল, যার সাথে নবী ﷺ এর চুলও লাগানো ছিল। লাবীদ বা অন্য বর্ণনায় তার যাদুকর বোন এ চিরুনি ও চুলের সঙ্গে এগারটি গিরা বিশিষ্ট এক গাছি সূতা ও সূঁচ বিশিষ্ট একটি মোমের পুতলিসহ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে রেখে 'যারওয়ান' কূপের নিচে একটি পাথরের তলায় চাপা দিয়ে রেখেছিল। নবী ﷺ এর উপর এ যাদুর প্রভাব পড়ল, তিনি শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ এর এ অসুস্থতা ছয় মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অবশেষে নবী ﷺ আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে অবস্থান করে আল্লাহর দরবারে পর পর কয়েকবার দু'আ করলেন। এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, আমি আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কী? নবী ﷺ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম– দু'জন ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে একজন আমার মাথার দিকে ও অপরজন পায়ের দিকে বসলেন। (তারা পরস্পর কথোপকথন করছিলেন এভাবে যে–)

প্রথমজন : এর কী হয়েছে?
দ্বিতীয়জন : তাঁর ওপর যাদু করা হয়েছে।
প্রথমজন : কে যাদু করেছে?
দ্বিতীয়জন : লাবীদ।
প্রথমজন : কিসে যাদু করেছে?
দ্বিতীয়জন : চিরুনি ও চুলে একটি পুরুষ খেজুর গাছের আবরণের মধ্যে।
প্রথমজন : সেটি এখন কোথায় আছে?
দ্বিতীয়জন : যারওয়ান কূপের তলায় পাথরের নিচে।
প্রথমজন : এখন কী করা যায়?
দ্বিতীয়জন : পানি শুকিয়ে তা বের করতে হবে।

অতঃপর নবী ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে কূপের কাছে গেলেন এবং পানি শুকিয়ে জিনিসটা বের করলেন। তারপর জিবরাঈল (আঃ) এসে নবী ﷺ-কে বললেন, আপনি ফালাক ও নাস সূরা দুটি পড়ুন। নবী ﷺ একটি করে আয়াত পড়তে লাগলেন– এতে একেকটি গিরা খুলতে লাগল, এভাবে যখন তিনি এগারটি আয়াত পড়া শেষ করলেন তখন এগারটি গিরা একটি একটি করে খুলে গেল এবং সকল সূঁচ পুতলি হতে বের হয়ে গেল।

এবার নবী ﷺ এর শরীরে শক্তি ফিরে আসল এবং তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। নবী ﷺ লাবীদকে ডেকে এনে কৈফিয়ত চাইলে সে তার দোষ স্বীকার করে নিল। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কারণ ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। কোন কোন সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ খবীসকে হত্যা করব না কেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করে দিয়েছেন– আমি কারো কষ্টের কারণ হতে চাই না।[২৪]

১১. নবী ﷺ-কে দাওয়াত দিয়ে এনে হত্যা করতে চেয়েছে :

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইয়াহুদিদের একটি দল নবী ﷺ ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদেরকে একটি ভোজে আমন্ত্রণ করেছিল। সাথে সাথে তারা গোপনে এ চক্রান্তও করেছিল যে, নবী ﷺ ও সাহাবীগণ এসে গেলে একযোগে তাদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে শেষ করে দেবে এবং এভাবে তারা ইসলামের মূলোৎপাটনে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে সঠিক সময়ে নবী ﷺ এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللهَ ۗ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদের হাত তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত করে দিলেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর মুমিনদের তো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (সূরা মায়েদা- ১১)

১২. নবী ﷺ-কে গ্রেফতার ও হত্যা করার চেষ্টা করেছে :

যখন কুরাইশদের এ আশঙ্কা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ মদিনায় চলে যাবেন। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এ ব্যক্তি মক্কা থেকে বের হয়ে গেলে আরো বিপদ। কেননা সে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। কাজেই তারা তাঁর ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য দারুন নাদওয়ায় জাতীয় নেতৃবৃন্দদের নিয়ে একটি সভা ডাকল। কীভাবে এ বিপদের পথ রোধ করা যায়, এ ব্যাপারে তারা পরামর্শ করল।

---

[২৪] সহীহ বুখারী, হা/৫৭৬৫; মুসনাদে হুমাইদী, হা/২৫৯; ইবনে কাসীর, খণ্ড- ৮; পৃঃ- ৫৩৯।

এক দলের মত ছিল, এ ব্যক্তির হাতে ও পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে এক জায়গায় বন্দী করে রাখা হোক। মৃত্যুর পূর্বে আর তাকে মুক্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ মত গৃহীত হলো না। কারণ তারা বলল, আমরা তাকে বন্দী করে রাখলেও তার যেসব সাথি কারাগারের বাইরে থাকবে, তারা কাজ করে যেতে থাকবে এবং সামান্য একটু শক্তি অর্জন করতে পারলেই তাকে মুক্ত করার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না।

দ্বিতীয় দলের মত ছিল, একে আমাদের এখান থেকে বের করে দাও। তারপর যখন সে আমাদের মধ্যে থাকবে না তখন সে কোথায় থাকে ও কী করে– তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ মতটিও গৃহিত হলো না। তারা বলল, এ ব্যক্তি হচ্ছে কথার যাদুকর। কথার মাধ্যমে মানুষের মন গলিয়ে ফেলার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। সে এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে আরবের অন্যান্য গোত্রকে নিজের অনুসারী বানিয়ে ফেলতে পারে। তারপর প্রচুর পরিমাণ ক্ষমতা অর্জন করে আরবের কেন্দ্রস্থলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে।

সবশেষে আবু জাহেল মত প্রকাশ করল যে, আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে উচ্চ বংশীয় তরবারি চালনায় পারদর্শী যুবক বাছাই করে নিতে হবে। তারা সবাই মিলে একই সঙ্গে মুহাম্মাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তাকে হত্যা করবে। এভাবে মুহাম্মাদকে হত্যা করার দায়িত্বটি সকল গোত্রের ওপর ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আর সবার সঙ্গে লড়াই করা বনু আবদে মানাফের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা রক্তমূল্য গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে।

অবশেষে এ মতটি সবাই পছন্দ করল। অতঃপর হত্যা করার জন্য লোকদের নাম নির্ধারিত হলো। হত্যা করার সময়ও নির্ধারিত হলো। এমনকি যে রাতটি হত্যার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, সে রাতে ঠিক সময়ে হত্যাকারীরাও যথাস্থানে পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই নবী ﷺ বের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আলী (রাঃ)-কে নিজের বিছানায় শুইয়ে আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে "সাওর" নামক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন। এরপর মদিনায় চলে যান। ফলে একেবারে শেষ সময় তাদের পরিকল্পিত কৌশল বানচাল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

স্মরণ করো, যখন কাফিররা তোমাকে বন্দী করা বা হত্যা করা অথবা নির্বাসিত করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। আর তারা ষড়যন্ত্র করে, অপরদিকে আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন; কিন্তু আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্রকারী।

(সূরা আনফাল- ৩০)

১৪. তারা নবী ﷺ-কে দেশ হতে বিতাড়িত করেছে :

বিরোধীরা নবী ﷺ-কে নিজের জন্মভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করল। এরপর আট বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি বিজয়ীর বেশে জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তারপর দু'বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ডকে মুশরিক শূন্য করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, যাতে তারা তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারে। (আর যদি তারা তোমাকে বহিষ্কার করেই ফেলত) তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে থাকতে পারত। অর্থাৎ তোমাকে বহিষ্কার করলে তারাও ধ্বংস হয়ে যেত।

(সূরা বনী ইসরাঈল- ৭৬)

নবী ﷺ-কে নিয়ে ব্যঙ্গকারীরা কাফির ও মুরতাদ

বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কতক বিবেকহীন নাস্তিক আল্লাহর নবী ﷺ সম্পর্কে এতই কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছে যে, এগুলো লিখতে এবং বলতেও লজ্জা হয়। পূর্বযুগের লোকেরা যারা নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে তারা ছিল কাফির-মুশরিক। কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও ব্লগের মধ্যে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও কুরআনসহ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ ও খারাপ মন্তব্য করে যাচ্ছে, তারা নামধারী মুসলিম হলেও কাজকর্মে পূর্বযুগের কাফির-মুশরিক থেকে কোন দিকে কম নয়।

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলদেরকে নিয়ে যারা ব্যঙ্গ করে তারা মুমিন থাকে না। তারা কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَاٰيَاتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ - لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ﴾

আর তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয় বলবে, আমরা তো আলাপ আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব– কারণ তারা অপরাধী। (সূরা তাওবা- ৬৫, ৬৬)

উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন থেকে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন থেকেই তারা তাঁর ব্যাপারে নানা ধরনের ভুল ধারণায় লিপ্ত ছিল। ফলে তারা তাঁর সাথে নানা প্রকার খারাপ আচরণ করত। বর্তমান সময়ে যারা নবী ﷺ এর আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করবে তাদের উপরও একই ধরনের দোষারোপ ও যুলুম নির্যাতন আসবে। যারা দোষারোপ ও যুলুম নির্যাতনের স্বীকার হন না, তারা মুখে যদিও বলে থাকে যে, আমরা হকের দাওয়াত দিচ্ছি, কিন্তু আসলে সেটা হকের দাওয়াত হতে পারে না। কারণ যারা সত্যিকারার্থে নবী ﷺ এর দ্বীন প্রচার করবে তাদের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটবে, যা নবী ﷺ এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এর ব্যতিক্রম কিছু হবে না। এজন্য যারা সত্যিকারার্থে দ্বীনের কাজ করেন, তাদের জন্য কতিপয় সান্ত্বনার বাণী আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ﴾

তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তবে (জেনে রেখো) তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করা হয়েছিল, যারা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি ও অনেক সহীফা এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আগমন করেছিল। (সূরা আলে ইমরান- ১৮৪)

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا﴾

এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু হিসেবে মনোনীত করেছিলাম। তবে পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট ছিল। (সূরা ফুরক্বান- ৩১)

﴿وَإِنْ يُّرِيْدُوْۤا أَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِيْۤ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ﴾

যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। (সূরা আনফাল- ৬২)

﴿يَاۤ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আনফাল- ৬৪)

ইসলামের দুষমনদের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে না :

শত্রুরা যেন মুসলিমদেরকে এমন দুর্বল অবস্থায় না পায় যে, তাদের মিথ্যাচার দেখে তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেলে অথবা তাদের হুমকি ও নির্যাতনে ভীত হয়ে পড়ে। বরং তারা যেন মুসলিমদেরকে ঈমানী চেতনায় ও সুপথ হাসিলের উদ্দেশ্যে এত বেশি মজবুত পায় যে, তাদেরকে কোন প্রকার ভয়ে

ভীত করা সম্ভব নয়, কোন প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ও নির্যাতন চালিয়ে সুপথ থেকে সরানোও সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। (সূরা রূম- ৬০)

﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾

শহরসমূহে কাফিরদের চালচলন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

(সূরা আলে ইমরান- ১৯৬)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে যেমন শক্তিশালী ও গুরুত্ববহ দেখতে চাচ্ছিলেন, তিনি ঠিক তেমনটিই হতে পেরেছিলেন। তাঁর সাথে যে ব্যক্তিই যে ময়দানে শক্তি পরীক্ষা করেছে, সে-ই হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত এ মহান ব্যক্তিত্ব এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেন, যাঁর পথ রোধ করার জন্য আরবের কাফির ও মুশরিকসমাজ নিজেদের সর্বশক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ধৈর্যধারণ করতে হবে :

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করো; কেননা তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। (সূরা তূর- ৪৮)

যারা তাগুতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিজেদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে, তারা নৈতিকতার সকল বাঁধন মুক্ত হয়ে নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে সবরকমের নিকৃষ্ট চক্রান্ত চালাচ্ছিল। তারা অশ্লীলতা, প্রতারণা, জালিয়াতি ও মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করে এমন এক নিষ্কলুষ ব্যক্তির কার্যক্রমকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, যিনি নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য দিন-রাত সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন। তাদের এ তৎপরতা দেখে নবী ﷺ মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

অতএব তুমি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করে দেবে না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা ফাতির- ৮)

নবী ﷺ-কে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এদের ঈমান না আনার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তায় না। কাজেই তুমি কেন অনর্থক নিজেকে দুঃখে ও শোকে দগ্ধীভূত করছ? তোমার কাজ শুধুমাত্র সুখবর দেয়া ও ভয় দেখানো। কাজেই তুমি কেবল নিজের প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাও। যে মেনে নেবে তাকে সুখবর দেবে এবং যে মেনে নেবে না তাকে তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে।

নবী ﷺ-কে যে দুঃখটি ভেতরে ভেতরে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল সেটি ছিল এই যে, তিনি নিজের জাতিকে নৈতিক অধঃপতন ও ভ্রষ্টতা থেকে বের করে আনতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা কোনক্রমেই এ পথে পা বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছিল না। আর এ ভ্রষ্টতার অনিবার্য ফল ধ্বংস ও আল্লাহর আযাব। তাই তিনি তাদেরকে এ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য দিন-রাত প্রাণপণ পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন।

নবী ﷺ নিজেই তাঁর এ মানসিক অবস্থাকে একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো, যে আলোর জন্য আগুন জ্বালাল। আর পতঙ্গরা পুড়ে মরার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। সে এদেরকে যে কোনক্রমে আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, কিন্তু এ পতঙ্গরা তার কোন প্রচেষ্টাকেই ফলপ্রসূ করতে দেয় না। আমার অবস্থাও অনুরূপ। আমি তোমাদের হাত ধরে টানছি; কিন্তু তোমরা আগুনে লাফিয়ে পড়ছ।[২৫]

মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন

অনেক মানুষের ধারণা মুহাম্মাদ ﷺ কেবল একজন নবী এবং ধর্মীয় নেতা ছিলেন। এর বেশি কিছু তারা চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, তাঁর পরিচয় শুধু একজন ধর্মীয় নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি ছিলেন মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয়জীবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে একজন পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক। তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল মানবজাতিকে ইসলামের শিক্ষা প্রদান করা এবং ইসলামকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। নবী ﷺ-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন-

১. মানুষের অভিযোগ খণ্ডন করা :

যখন নবীদের দেয়া শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যায় অথবা মানুষ গোমরাহীর মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে, সেখান থেকে হেদায়াত লাভের কোন উপায় থাকে না; তখন লোকদের জন্য এ ওজর পেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন করার ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এ ধরনের অজুহাত দেখানোর পথ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে পাঠিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ ۢبَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾

---

[২৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৪২৬; সহীহ মুসলিম, হা/৬০৯৭: মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৯৬৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৪০৮।

হে আহলে কিতাব! রাসূল প্রেরণের (দীর্ঘ) বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে। সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে; যাতে তোমরা বলতে না পার যে, আমাদের নিকট তো কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেনি। সুতরাং (এখন তো) তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা মায়েদা- ১৯)

২. সুসংবাদ দেয়া ও ভয় দেখানো :

পৃথিবীর মানুষ কেউ ভালো কাজ করে আবার কেউ খারাপ কাজ করে। যারা ভালো কাজ করে নবীগণ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। আর যারা পাপকাজ করে তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ بِالۡحَقِّ بَشِيۡرًا وَّنَذِيۡرًا﴾

আমিই আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে সত্যসহ প্রেরণ করেছি। (সূরা ফাতির- ২৪)

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيۡرًا﴾

হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। (সূরা আহযাব- ৪৫)

৩. আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে শোনানো :

﴿كَذٰلِكَ اَرۡسَلۡنٰكَ فِيۡۤ اُمَّةٍ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتۡلُوَا۠ عَلَيۡهِمُ الَّذِيۡۤ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ﴾

এভাবে আমি তোমাকে এমন এক জাতির নিকট পাঠিয়েছি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে। এজন্য যে, যা আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি তা তাদেরকে পাঠ করে শোনাবে। (সূরা রা'দ- ৩০)

৪. জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনা :

﴿رَسُوۡلًا يَّتۡلُوۡا عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخۡرِجَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوۡرِ﴾

(আল্লাহ প্রেরণ করেছেন) এমন এক রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন। যাতে করে তিনি মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। (সূরা তালাক্ব- ১১)

৪. পথভ্রষ্ট জাতিকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দেয়া :

﴿هُوَ الَّذِيۡ بَعَثَ فِي الۡاُمِّيّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ ۗ وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِيۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ - وَّاٰخَرِيۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ﴾

তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষর জাতির মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হেকমত (সুন্নত) শিক্ষা দেন; যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। আর তাদের মধ্য হতে অন্যান্য এমন লোকদের জন্যও (তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন) যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান। (সূরা জুমু'আ- ২, ৩)

৫. মানুষের জীবন পরিশুদ্ধ করা :

﴿كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ﴾

আমি তোমাদের মধ্য হতে এমন এক রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। (সূরা বাক্বারা- ১৫১)

জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করা বলতে চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি সবকিছুকেই সুসজ্জিত করা বুঝায়। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত করেছে। তাদের নৈতিক চরিত্র, রীতিনীতি, লেনদেন ও জীবনাচরণকে সবরকমের কলুষতা থেকে পবিত্র করেছে এবং উন্নতমানের নৈতিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। আর তাই ইসলাম কেবল আয়াতসমূহ পড়ে শোনানোকেই যথেষ্ট মনে করে না, বরং মানুষকে আল্লাহর কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বুঝানো এবং মানুষের জীবন পরিশুদ্ধ করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করে।

৬. আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা :

আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে যে সত্য দ্বীন ও হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা শুধু দ্বীন প্রচার করার জন্যই নয়, বরং পৃথিবীর অন্যান্য সকল জীবনাদর্শের উপর ইসলামকে বিজয়ী করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। আল্লাহর দ্বীন মানবরচিত বিধানের অধীনে কোন রকমে টিকে থাকার জন্য পাঠানো হয়নি; বরং জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের উপর এ দ্বীনই হবে বিজয়ী জীবনাদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾

তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে (ঐ দ্বীনকে) অন্যসব দ্বীনের উপর বিজয়ী করা হয়। আর এ বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা ফাতহ- ২৮)

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾

তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে (ঐ দ্বীনকে) অন্যসব দ্বীনের উপর বিজয়ী করা হয়; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা তাওবা- ৩৩; সূরা সাফ- ৯)

কেমন ছিল মুহাম্মাদ ﷺ এর চরিত্র

মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন মহামানব। তাঁর চরিত্রের সাথে আর কারো চরিত্রের তুলনা করা যায় না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে তাঁকে উত্তম চরিত্রের ভূষণ হিসেবে উপাধি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾

নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছ। (সূরা ক্বালাম- ৪)

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা কষ্ট দেয়, তা তার নিকট কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী এবং মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা- ১২৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অধিক ধৈর্যশীল। কোন ব্যতিক্রম ঘটলে বা ক্ষতি হয়ে গেলে তিনি মাথা গরম করতেন না। তিনি ছিলেন খুবই সাহসী ও বীর। আল্লাহ ছাড়া কাউকে তিনি ভয় করতেন না। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী। কোন ব্যাপারে তিনি পক্ষপাতিত্ব করতেন না। আপন-পর, ধনী-গরীব সবার সাথে তিনি সমান ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, কেউ অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করে দিতেন। মহিলাদের মধ্যে মুহরিমাত, নিজ দাসী ও স্ত্রীদের ছাড়া অন্য কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেননি। তিনি নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। ঘরে থাকলে স্ত্রীদের সাথে কাজে শরীক হতেন। নামাযের সময় উপস্থিত হলে মসজিদে চলে যেতেন। তিনি বড়ই লজ্জাশীল ছিলেন। স্বাধীন অথবা ক্রীতদাস সকলের দাওয়াত তিনি কবুল করতেন। সামান্য গোশত বা এক ঢোক দুধও কেউ হাদিয়া দিলে তিনি তা স্বাদরে গ্রহণ করতেন। তিনি যাকাতের মাল খেতেন না। নিজের কোন স্বার্থের জন্য কারও উপর রাগ করতেন না। তবে দ্বীনের ব্যাপারে কেউ আঘাত হানলে রাগ করতেন। সামনে যা উপস্থিত পেতেন তাই খেতেন। কোন খাবার ফেরত দিতেন না। হালাল কোন জিনিস পরিত্যাগ করতেন না। তিনি হেলান দিয়ে খেতেন না এবং টেবিলের উপরে রেখেও খেতেন না। মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে তিনদিন পেটভরে আহার করেননি। এটা দারিদ্রতার কারণে নয় বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য।

তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নরম স্বভাবের ছিলেন, তাঁর মধ্যে কোন অহংকার ছিল না। তিনি খুবই সুন্দর ছিলেন। দুনিয়ার কোন ব্যাপারে তাঁকে কেউ ভয় দেখাতে পারত না।

তিনি সুগন্ধি ভালবাসতেন এবং দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসকে অপছন্দ করতেন। মিসকীনদের সঙ্গে খাবার খেতেন, সম্মানিত লোকদেরকে তিনি সম্মান করতেন। মর্যাদাবান লোকদের সাথেও তিনি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতেন এবং তাদের সাথে সদাচরণ করতেন। সকল আত্মীয়কে সমানভাবে দেখতেন ও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। কারও উপর কঠোরতা আরোপ করতেন না, কেউ কোন দোষ করে ওজর পেশ করলে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। কোন কোন সময় সত্য কথা দ্বারা কৌতুক করতেন। তিনি যা খেতেন ও পরতেন দাস-দাসীদেরকেও তাই দিতেন। তাদেরকে কাজের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করতেন না। তবে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য বা নিজের বিশেষ প্রয়োজনে সময় নির্ধারণ করতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের বাগানে যাতায়াত করতেন। তিনি কোন মিসকীনকে হেয় প্রতিপন্ন করতেন না। আবার কোন বাদশাকে তার বাদশাহীর কারণে ভয়ও করতেন না। সকলকে সমানভাবে আল্লাহর দিকে ডাকতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মুমিনকে কখনো গালি দেননি। কোন স্ত্রীকে বা খাদেমকে তিরস্কার বা লানত করেননি। আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া তিনি কোনদিন কাউকে প্রহার করেননি। আল্লাহর হক ছাড়া তিনি কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি। দু'টি কাজের মধ্যে ইখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন। গুনাহর কাজ থেকে তিনি দূরে থাকতেন। স্বাধীন বা দাস তাঁর কাছে যে-ই আসত তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তিনি নিজেই শরীক হতেন।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খাদেম ছিলেন। তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমার কোন কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অপছন্দনীয় হলে তিনি কোনদিন আমাকে বলেননি এটা কেন করেছ বা এটা করনি কেন?[২৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠানোর আগে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত কিতাবে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ আমার মনোনীত বান্দা। সে কর্কষভাষী নয়, কঠোর হৃদয়ের অধিকারী নয় এবং সে বাজারে গোলমালকারীও নয়। সে মন্দের বদলা মন্দ দিয়ে দেয় না বরং ক্ষমা করে দেয়। তার জন্ম হবে মক্কায় এবং হিজরত হবে মদিনায়। যারা তার সঙ্গী হবে তারাই হবে কুরআন ও ইলমের ধারক-বাহক।

---

[২৬] সহীহ বুখারী, হা/৬০৩৮।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো সাথে সাক্ষাৎ করলে প্রথমে তাকে সালাম দিতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করলে মুসাফাহার জন্য নিজে হাত বাড়িয়ে দিতেন। তিনি যখনই কোথাও বসতেন বা উঠতেন তখনই আল্লাহর যিকির করতেন। নামাযে থাকাকালীন কেউ আসলে তিনি নামায সংক্ষিপ্ত করে তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। লোক চলে যাওয়ার পর, আবার নামায পড়তে শুরু করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাঝে সকল উত্তম গুণাবলি একত্র করে দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজে লেখাপড়া জানতেন না। জন্মগ্রহণ করেছেন ইয়াতীম অবস্থায়, বাল্যকাল কাটিয়েছেন ছাগল চরিয়ে।

মুহাম্মাদ ﷺ এর আদর্শ মানতে হবে

নবী ﷺ এর আনুগত্য করার নির্দেশ :

﴿وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ﴾

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তার রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। (সূরা তাগাবুন- ১২)

﴿يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো। যখন তোমরা তার কথা শ্রবণ কর তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। (সূরা আনফাল- ২০)

মুহাম্মাদ ﷺ এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য :

﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا﴾

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল তবে (মনে রেখো) তোমাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করিনি। (সূরা নিসা- ৮০)

নবী ﷺ এর ফায়সালা মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا﴾

কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোন নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। (সূরা আহযাব- ৩৬)

নবী ﷺ এর ফায়সালা না মানলে মুমিন হওয়া যায় না :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং তা মেনে না নেয়। (সূরা নিসা- ৬৫)

এ নির্দেশটি কেবল রাসূল ﷺ এর জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর হবে। নবী ﷺ আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু এনেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী যে পদ্ধতিতে কাজ করেছেন, তা চিরস্থায়ীভাবে মুসলিমদের জন্য চূড়ান্ত ফায়সালাকারী সনদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সনদটি মানা ও না মানার উপরই কোন ব্যক্তির মুমিন হওয়া না হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে। যে ব্যক্তি এ সনদটি যতটুকু পালন করবে তার ঈমানের পরিমাণটাও ততটুকুই নির্ধারিত হবে।

যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোন হুকুম প্রমাণিত হয়, সে বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান, আদালত, পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রের নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না। মুসলিম হওয়ার অর্থই হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয়া। যে ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আনুগত্যের শির নত করতে হবে। আর যে নত করতে চায় না, সে মুসলিম নয়।

যে ব্যক্তি তার কামনা-বাসনাকে রাসূল ﷺ এর আনীত দ্বীনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে না পারবে, সে কখনই ঈমানদার হতে পারবে না। এটা ঈমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার রব এবং আল্লাহর রাসূলকে তার পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে মানে, সে নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে কখনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না, সে বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষণ করে না এবং ঐসব ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঐসব ব্যাপারে কোন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন কি না এবং দিয়ে থাকলে কী দিয়েছেন সে বিষয়ে আগে জানার চেষ্টা করবে। এ নির্দেশটি শুধু মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের পুরো সামাজিক ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। মুসলিমদের সরকার, বিচারালয় এবং পার্লামেন্ট কোনকিছুই এ আইনের বাহিরে নয়।

নবী ﷺ এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা জরুরি :

﴿وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর। (সূরা হাশর- ৭)

মুসলিমগণ সবসময় সব ব্যাপারেই রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি কোন বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দিলে তা যথাসাধ্য পালন করো। আর যে বিষয়ে বিরত থাকতে বলি তা থেকে দূরে থাকো।[২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার বক্তৃতাকালে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা অমুক অমুক ফ্যাশনকারিণী মহিলাকে লানত করেছেন।" এটা শুনে এক মহিলা বলল, এ কথা আপনি কোথায় পেয়েছেন? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর কিতাব পড়ে থাকলে এ কথা অবশ্যই পেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়েছ?

﴿وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

অর্থাৎ রাসূল তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে আসে, তোমরা তা গ্রহণ করো। আর তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।

(সূরা হাশর- ৭)

তখন সে বলল, হ্যাঁ– এ আয়াত তো আমি পড়েছি। তিনি বললেন, রাসূল ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরূপ কাজে লিপ্ত নারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন। তখন মহিলাটি বলল, এখন আমি বুঝতে পারলাম।[২৮]

নবী ﷺ এর অনুসরণ করার উপকারিতা

নবী ﷺ এর অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহর ভালোবাসা নিহিত :

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো। (যদি কর) তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান- ৩১)

---

[২৭] সহীহ বুখারী, হা/৭২৮৮; সহীহ মুসলিম, হা/৩৩২১।
[২৮] সহীহ বুখারী, হা/৪৮৮৬, সহীহ মুসলিম, হা/৫৬৯৫।

নবী ﷺ এর আনুগত্যকারীরা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে :

﴿وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ﴾

যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে সৎপথ পাবে; আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। (সূরা নূর- ৫৪)

তারা সফলকাম হবে :

﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। (সূরা নূর- ৫২)

﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো মহাসাফল্য লাভ করবে। (সূরা আহযাব- ৭১)

তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে :

﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তাকে তিনি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; আর এটাই তো মহাসাফল্য। (সূরা নিসা- ১৩)

﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলবে আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বহমান থাকবে। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তাদেরকে কষ্টদায়ক আযাব দেয়া হবে। (সূরা ফাতহ- ১৭)

তারা নবীগণ ও শ্রেষ্ঠ লোকদের সাথে থাকবেন :

﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; আর তারা কতই না উত্তম সঙ্গী! (সূরা নিসা- ৬৯)

মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসরণ না করার পরিণাম

নবী ﷺ এর বিরুদ্ধাচরণকারীরা লাঞ্ছিত হবে :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে, যেমন লাঞ্ছিত করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। (সূরা মুজাদালা- ৫)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾

নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তারা লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে। (সূরা মুজাদালা- ২০)

তাদের ওপর বিপর্যয় বা আযাব আসবে :

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের ওপর বিপর্যয় পতিত হবে অথবা তাদের ওপর পতিত হবে মর্মান্তিক শাস্তি। (সূরা নূর- ৬৩)

তাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমলকে নষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মাদ- ৩৩)

তারা পরকালে আফসোস করবে :

﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾

যারা কুফরী করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে সেদিন তারা কামনা করবে, যদি তারা মাটির সঙ্গে মিশে যেত! আর তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না। (সূরা নিসা- ৪২)

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾

সেদিন যালিম ব্যক্তি নিজ হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! (সূরা ফুরক্বান- ২৭)

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾

যেদিন তাদের চেহারা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে- হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন করতাম! (সূরা আহযাব- ৬৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২য় অধ্যায়

মুহাম্মাদ ﷺ এর জীবনী

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরবের ধর্মীয় অবস্থা

আরবের লোকেরা মূলত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) এর অনুসারী ছিল। ইসমাঈল (আঃ) এর দাওয়াত প্রচারের কারণেই তারা ইবরাহীম (আঃ) এর প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী হয়ে উঠে এবং সেটাকেই যুগ যুগ ধরে ধরে রাখে। কিন্তু কালের আবর্তে পৃথিবীর অন্যান্য ভ্রান্ত জাতির মতো এক সময় তারা এ বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। একপর্যায়ে তারা আল্লাহর একত্ববাদ বাদ দিয়ে ওসীলা গ্রহণের অজুহাতে মূর্তিপূজা করতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে যে, এসব মূর্তির পূজা করার মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হয়।

মূর্তিপূজার প্রতি বিশ্বাস :

যখন আরবের প্রায় সর্বত্রই ইবরাহীম (আঃ) এর দ্বীন বিলুপ্তির পথে, তখনই মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হয়। আর এর প্রচলন করে আমর ইবনে লুহাই। ইবরাহীম (আঃ) এর সামান্য কিছু নিয়মনীতি সমাজের মাঝে তখনো প্রচলিত ছিল। এসব নিয়মনীতির প্রতি আমর ইবনে লুহাই এর বেশ অনুরাগ থাকায় লোকেরা তাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত এবং তার কথা মেনে নিত। একদা সে শাম দেশে ভ্রমণে গিয়ে 'হুবল' নামক একটি মূর্তি নিয়ে আসে। অতঃপর সে এটি কাবাঘরে স্থাপন করে এর পূজা করতে শুরু করে এবং মক্কাবাসীদেরকেও পূজা করার জন্য আহ্বান জানায়। ফলে মক্কাবাসীরা তার ডাকে সাড়া দেয়; এমনকি হেজাজবাসীরাও এতে উৎসাহী হয়ে উঠে। এবার আমর ইবনে লুহাই এর দেখাদেখি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মূর্তির পূজা শুরু হয়। যেমন– লাত, মানাত, উযযা, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি। আরবরা এগুলোর আকৃতিতে ছোট-বড় অনেক মূর্তি তৈরি করে নিজেদের ঘরে ঘরে রাখতে শুরু করে– এমনকি সেগুলোকে কাবা ঘরেও স্থাপন করতে থাকে। আর এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে মূর্তিপূজার প্রচলন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা বিজয় করে কাবাঘরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সেখানে ৩৬০টি মূর্তি পেয়েছিলেন। তারপর তিনি সেগুলো স্বীয় লাঠি দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলেন।

মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করে আরবদের মধ্যে অনেক ধরনের শিরক প্রচলিত ছিল। যেমন–

১. আরবরা তাদের সকল ধরনের প্রয়োজন ও বিপদাপদের সময় এসব মূর্তির কাছেই প্রার্থনা করত। এতে তারা মনে করত যে, মূর্তিরূপী এসব দেব-দেবী তাদের প্রার্থনা কবুল করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবে। ফলে তাদের প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হবে।[২৯]

২. তারা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন, মূর্তিকে তাওয়াফ এবং সিজদা করত।

৩. তারা মূর্তির উদ্দেশ্যে প্রাণী বলি দিত এবং যেকোন পশু যবেহ করার সময় মূর্তির নাম নিয়ে যবেহ করত।

৪. তারা মূর্তিদের নামে উৎসর্গ করত এবং তাদের নামেই মানত করত।

গণক ও তীরের প্রতি বিশ্বাস :

কুরআন মাজীদে গণক এবং তীরের প্রতি বিশ্বাস করাকে আযলাম নামে অভিহিত করা হয়েছে। আযলাম হচ্ছে যালামুন শব্দের বহুবচন। আর যালাম বলা হয় এমন তীরকে, যার উপর পালক লাগানো থাকে না। আরবরা এসব তীর দ্বারা তাদের ভাগ্য গণনা করত এবং যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও এসব তীরের দারস্থ হতো। বিশেষ করে কোন স্থানে ভ্রমণ করা, কাউকে বিবাহ করা, কোন ব্যবসা শুরু করা, নেতৃত্ব নির্ধারণ করা, কারো ব্যাপারে সন্দেহ দূর করা ইত্যাদি কর্যাবলি সম্পাদনের ব্যাপারে এগুলো ব্যবহার করত।

জুয়ার প্রচলন :

আরবদের প্রায় কার্যক্রমেই জুয়ার প্রচলন ছিল। যেমন– ক্রয়-বিক্রয় করা, মূল্য নির্ধারণ করা, পশু যবেহ করা ও মাংস বণ্টন করা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে তারা নানা ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করত। যেমন– কোন কিছু নিক্ষেপ করা, নির্দিষ্ট চিহ্নের তীর বের করা ইত্যাদি।

কোন নির্ধারিত খেলার নাম জুয়া নয়। যেসব খেলায় আর্থিক লাভ-লোকসানের ব্যবস্থা রয়েছে সেটাই জুয়া, যাকে ইসলামে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এটা জয়ী-পরাজয়ীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনে। কাজেই জুয়া যেমন অর্থোপার্জনের জন্য খেলা হারাম তেমনি বিনোদনের জন্যও খেলা হারাম।

যাদুর প্রতি বিশ্বাস :

পূর্বযুগের ধারাবাহিকতায় আরবে আইয়ামে জাহেলিয়াতেও যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তারা যাদুকরদেরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করত, তাদের কথাবার্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত। অনেক সময় তারা নিজেদের

[২৯] সূরা ইউনুস- ১৮।

উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে যাদের উপর যাদু করা হতো তাদের অনেকেই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

জ্যোতিষীদের প্রতি বিশ্বাস :

আরবরা জ্যোতিষীদেরকে বিশ্বাস করত। যে কোন কাজকর্মে তারা জ্যোতিষীদের পরামর্শ মেনে চলত। জ্যোতিষীরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, উদয়-অস্ত, আগমন-প্রত্যাগমন ইত্যাদি লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের আবহাওয়া কিংবা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন কোন ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাভাষ প্রদান করত। আবার কোন কোন জ্যোতিষী এসব সম্পাদনের জন্য জিনদেরকে ব্যবহার করত।

কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস :

আরবের লোকেরা নানা ধরনের কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত। তাদের এসব কুসংস্কারের কোন শেষ ছিল না। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

সপ্তাহের কোন কোন দিনকে তারা অশুভ মনে করত।

দিন বা রাতের কোন কোন সময়কে অশুভ মনে করত।

কোন কোন বাড়িঘর অথবা স্থানকে তারা অশুভ মনে করত।

কিছু কিছু লোকের চেহারা দেখাকে অশুভ মনে করত।

হত্যাকৃত লোকের আত্মা প্রতিশোধ গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত আশেপাশে ঘুরাফেরা করে বলে মনে করত।

কিছু কিছু পশুর গোশত পুরুষদের জন্য আবার কিছু কিছু পশুর গোশত নারীদের জন্য আবার কিছু কিছু পশুর গোশত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত।

ইয়াহুদি ধর্ম :

সে সময় ইয়াহুদিদের অবস্থা ছিল আরো করুণ। তারা তাদের মূল ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেদের মতামতকে আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিত। তারা অনেক হালালকে হারাম বলে চালিয়ে দিত। বিভিন্ন অসৎ ও অনৈতিক কার্যাবলিকে বৈধ মনে করত। তারা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া নিয়মানুযায়ী জীবন পরিচালনা করত। এমনকি তারা নিজেদের জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করত। ফলে তারা যত অপরাধই করত সেগুলোকে কোন অপরাধই মনে করত না। আর এসব কাজে তাদের আলেমরাই বেশি ভূমিকা পালন করত। তাদের আলেমরা যা-ই বলত তারা তা-ই বিশ্বাস করত। এভাবে তারা তাদের আলেমদেরকে আল্লাহর আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

খ্রিস্টান ধর্ম :

সে সময় খ্রিস্টানরাও ছিল নানা ধরনের সত্যবিবর্জিত শিরক ও পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত। তারা আল্লাহর একত্ববাদের পরিবর্তে ত্রিত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহর সাথে শিরক করত। ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং মারইয়াম (আঃ)-কে আল্লাহর স্ত্রী মনে করত (নাউযুবিল্লাহ)। তবে এ ধর্ম তখনকার আরবে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

এছাড়া অবশিষ্ট আরবদের ধর্মীয় অবস্থা মুশরিকদের মতোই ছিল। কারণ তাদের অন্তঃকরণ একই ছিল। বিশ্বাসসমূহে পরস্পরের সাদৃশ্য ছিল এবং রীতি-নীতিতেও সামঞ্জস্য ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম ও বংশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ইবরাহীম (আঃ) এর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর। ইবরাহীম (আঃ) এর দু'জন পুত্র ছিল। একজন হলেন ইসহাক (আঃ) এবং অপরজন হলেন ইসমাঈল (আঃ)। ইসহাক (আঃ) এর বংশে অনেক নবীর আগমন হলেও ইসমাঈল (আঃ) এর বংশে কেবল শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর আগমন হয়েছিল। তিনি মক্কার বিখ্যাত বনু হাশেম গোত্রে ৯ রবিউল আওয়াল সোমবার[৩০] দিবাগত রাতে সুবহে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি পঞ্জীকা অনুযায়ী তারিখটি ছিল ২০/২২ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম ছিল আমিনা এবং তাঁর দাদার নাম ছিল আবদুল মুত্তালিব। তাঁর জন্মের পরপরই মাতা আমিনা আবদুল মুত্তালিবের নিকট এ সুসংবাদটি প্রদান করেন। তখন তিনি খুবই আনন্দের সাথে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে কাবাঘরে চলে আসেন। সেখানে তিনি তাঁর মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ। ইতিপূর্বে আরবের মধ্যে এ নামে আর কারও নামকরণ করা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্ণ বংশ পরিচয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্ণ বংশ পরিচয়টি হলো : মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব (শায়বা) বিন হাশেম (আমর) বিন আবদে মানাফ (মুগীরাহ) বিন কুসাই (যায়েদ) বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর (তার উপাধি ছিল কুরাইশ এবং উক্ত সূত্রেই

[৩০] সহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৫।

কুরাইশ বংশের উদ্ভব) বিন মালেক বিন নাযর (কায়েস) বিন কেনানা বিন খুযায়মা বিন মুদরেকা (আমের) বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'দ বিন আদনান[৩১] বিন আদ বিন হামিসায়া বিন সালমান বিন আউস বিন বুয বিন কামওয়াল বিন উবাই বিন আওয়াম বিন নাশিদ বিন হেযা বিন বালদাস বিন ইয়াদলাফ বিন তারিখ বিন জাহিম বিন নাহিস বিন মাখী বিন আইস বিন আবকার বিন উবাইদ বিন আদদোয়া বিন হামদান বিন সুনবর বিন ইয়াসরাবী বিন ইয়াহযুন বিন ইয়ালহান বিন আরআওয়া বিন আইয বিন যীশান বিন আইসার বিন আফনাদ বিন আইহাম বিন মুকশির বিন নাহিস বিন যারেহ বিন সুমাই বিন মুযী বিন অওয়াহ বিন এরাম বিন কাইদার বিন ইসমাঈল (আঃ) বিন ইবরাহীম (আঃ) বিন তাবেহ (আযর) বিন নাহুর বিন সারুহ (অথবা সারুগ) বিন রাউ বিন ফালেখ বিন আবের বিন শালেখ বিন আরফাখশাদ বিন শাম বিন নূহ (আঃ) বিন লামেক বিন মাতুশলখ বিন আখনুখ {কথিত আছে যে, এই নাম ছিল ইদরীস (আঃ) এর} বিন ইয়াদ বিন মহালায়েল বিন কায়নান বিন আনুশ বিন শীশ বিন আদম (আঃ)।[৩২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর লালন পালন

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মের কিছুদিন পূর্বে তাঁর পিতা মারা যান। সুতরাং তিনি জন্মগ্রহণের পর থেকেই ইয়াতীম অবস্থায় লালিত পালিত হন। তাঁর জন্ম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম তাঁকে দুধ পান করান মাতা আমিনা, তারপর আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা।

তারপর তখনকার আরবদের নিয়ম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুস্থ-সবল ও সুস্পষ্টভাষী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দাদা আবদুল মুত্তালিব ধাত্রী মা হালিমা বিনতে যুবায়েরের নিকট সমর্পণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুকালে সেখানেই লালিত পালিত হতে থাকেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর লালন পালন করার জন্য চুক্তির দুই বছর পূর্ণ হয়ে যায়, তখন হালিমা বিনতে যুবায়ের রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাতা আমিনার কাছে ফেরত দিতে যান। তখন হালিমা শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে আরো কিছুদিন নিজেদের কাছে রাখার জন্য আবেদন করেন। এতে মাতা আমিনা রাজি হয়ে যান। ফলে মা হালিমা শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে ফেরত না দিয়ে আরো কিছুদিন নিজের কাছে রাখার জন্য সাথে করে নিয়ে আসেন।

---

[৩১] সহীহ বুখারী, 'সাহাবীদের মার্যাদা' অধ্যায় ৫৭ নং অনুচ্ছেদ 'নবী ﷺ এর আগমন'।
[৩২] আর রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৮৮।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বক্ষবিদারণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বক্ষবিদারণের ঘটনাটি ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা। এটি ঘটেছিল হালিমা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়ে আসেন তার পর। তখন তাঁর বয়স ছিল চার অথবা পাঁচ বছর। এ ঘটনাটির বর্ণনায় হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِىْ طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِىْ مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلٰى أُمِّهِ يَعْنِىْ ظِئْرَهُ فَقَالُوْا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ. فَاسْتَقْبَلُوْهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرٰى أَثَرَ ذٰلِكَ الْمِخْيَطِ فِىْ صَدْرِهِ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তখন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে ধরে শুয়ে দিলেন এবং বুক চিরে তাঁর হৃদপিণ্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তিনি তা থেকে একটি রক্তপিণ্ড বের করলেন এবং বললেন, এ অংশটি হলো শয়তানের। এরপর হৃদপিণ্ডটিকে একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন এবং তা যথাস্থানে স্থাপন করলেন। তখন ঐ শিশুরা দৌড়ে তাঁর দুধ মায়ের (হালীমা এর) কাছে গেল এবং বলল, মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করা হয়েছে। কথাটি শুনে সবাই সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল যে, তিনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বুকে সেই সেলাই এর চিহ্ন দেখেছি।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মায়ের মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বক্ষবিদারণের ঘটনায় ধাত্রীমাতা হালীমা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে তিনি তাঁকে ছয় বছর বয়সে মাতা আমিনার কাছে ফেরত পাঠান। অতঃপর তাঁর মাতা আবদুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় তাঁকে নিয়ে ইয়াসরিব তথা মদিনায় গমন করে স্বামী আবদুল্লাহর কবর যিয়ারত করতে যান। তখন তিনি সাথে করে দাসী উম্মে আয়মানকেও নিয়ে যান। অতঃপর কবর যিয়ারত শেষে সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। তারপর মক্কায় ফেরত আসার সময় যখন তারা আবওয়া[৩৪] নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মাতা আমিনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর সেই অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় তিনি সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

---

[৩৩] সহীহ মুসলিম, হা/৪৩১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৫২৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা/৩৭৭১২; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানা, হা/২৫৭; মিশকাত, হা/৫৮৫২।

[৩৪] মদনা থেকে মক্কার পথে ২৫০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত একটি শহরের নাম।

আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন দাদা আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে প্রিয় পুত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্মের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে আবদুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। তারপর যখন মাতা আমিনাও মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি তাঁকে (মুহাম্মাদকে) নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেন। এদিকে তিনি ইয়াতীম হয়ে পড়ায় তাঁর প্রতি আবদুল মুত্তালিবের ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে সবসময় নিজের কাছাকাছি রাখতেন এবং সকল বিপদাপদে তিনি তাঁকে আড়াল করে রাখতেন।

দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে পদার্পণ করলেন তখন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবও ইন্তেকাল করেন। ফলে তিনি আবার একা হয়ে যান এবং শোক যন্ত্রণা ও ব্যথা-বেদনা অনুভব করতে শুরু করেন। মৃত্যুকালে আবদুল মুত্তালিবের বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাদাকেও হারালেন তখনই চাচা আবু তালিব তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর লালন পালনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। তাছাড়া আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আবু তালিবকে সেই উপদেশই দিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আবদুল মুত্তালিবের মতো তিনিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবসময় আগলে রাখতেন এবং নিজের পুত্র থেকে তাঁকে বেশি স্নেহ করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে চাচা আবু তালিবের সাথে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সিরিয়া গমন

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বয়স যখন ১২ বছর তখন তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে আবু তালিবের সাথে সিরিয়া গমন করেন। সে সময় সিরিয়া 'শাম' নামে পরিচিত ছিল। সফরের এক পর্যায়ে তারা বসরায় গিয়ে উপস্থিত হন। সে সময় বসরা ছিল শাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

সেখানে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক (রাহেব) বসবাস করত। তাঁর উপাধি ছিল বুহায়রা। তিনি কখনো কোন কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গীর্জা থেকে বের হতেন না। কিন্তু যখন এ কাফেলাটি সেখানে গিয়ে শিবির স্থাপন করল,

তখন তিনি গীর্জা থেকে বের হয়ে এলেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। তারপর বালক মুহাম্মাদ ﷺ এর হাত ধরে বললেন, ইনি হচ্ছেন বিশ্বজাহানের সরদার। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন। এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন, আপনি কীভাবে জানলেন যে, ইনিই হচ্ছেন শেষ নবী? তখন তিনি বললেন, গিরিপথের ঐ প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টিগোচর হয়ে আসছিল তখন আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোন বৃক্ষ কিংবা পাথর ছিল না– যা তাঁকে সিজদা করেনি। এসব জিনিস নবী-রাসূল ছাড়া সৃষ্টিকুলের মধ্যে অন্য কাউকে কখনই সিজদা করে না। উপরন্তু মোহরে নবুওয়াত দেখেও আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। তাঁর স্কন্দদেশের নিচে কড়ি হাড্ডির পাশে 'সেব' ফলের আকৃতিবিশিষ্ট একটি দাগ রয়েছে। সেটাই হচ্ছে মোহরে নবুওয়াত। আর এগুলো আমি বাইবেল থেকে অবগত হয়েছি। তারপর তিনি আবু তালিবকে বললেন, আপনি একে সাথে নিয়ে আর বিদেশে ভ্রমণ করবেন না; বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যান। কেননা ইয়াহুদিরা এর পরিচয় জানতে পারলে একে হত্যা করে ফেলতে পারে। ফলে আবু তালিব খুব শীঘ্রই তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।[৩৫]

হিলফুল ফুযূল প্রতিষ্ঠা

ফুজ্জার যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হিংস্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই ব্যথিত হন। এ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক চিন্তা করে তিনি মানুষের সেবা-যত্ন করার জন্য একটি সংঘঠন প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। তাই তিনি চাচা যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নিকট এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ফলে যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিব এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তারপর তাদের উভয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ধীরে ধীরে এর সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে জুদ'আনের ঘরে বিভিন্ন গোত্রপতির উপস্থিতি ও সম্মতি সাপেক্ষে এ মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদিত হয় যে,

১. দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা সর্বদাই সচেষ্ট থাকব।
২. বিদেশি লোকদের ধনসম্পদ ও মানসম্মান রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
৩. দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তাদানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

---

[৩৫] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/১৮০-৮৩; তিরমিযী, হা/৩৬২০।

৪. অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে দুর্বল লোকদেরকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

এ অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের সময় উপস্থিত ছিলেন বনু হাশেম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন আবদুল উযযা, বনু যোহরা বিন কিলাব এবং বনু তামীম বিন মুররাহ প্রমুখ গোত্রের প্রধানগণ।

যেহেতু এ অঙ্গীকারনামাটি ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য, তাই এ সংগঠনের নাম দেয়া হয় 'হিলফুল ফুযূল' বা শান্তি সংঘ।

এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়তে থাকে। কিন্তু ইসলাম আগমনের মধ্য দিয়ে এর কার্যকারিতা স্তিমিত হয়ে যায়।

খাদীজা (রাঃ) এর ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ

সে সময় পুরো কুরাইশ গোত্র জীবিকা অর্জনের জন্য নানা ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত থাকত। যার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মাঝে মধ্যে এসব কাজে বেরিয়ে পড়তেন। তখন বিভিন্ন প্রকার শর্তের ভিত্তিতে একে অপরের ব্যবসায় অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ, উত্তম চরিত্র ও একনিষ্ঠ আমানতদার। ফলে যে কেউ তাঁর সাথে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে সাচ্ছন্দবোধ করত। তাঁর এই সুনাম যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন তিনি মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খাদীজা (রাঃ) এর দৃষ্টিগোচর হন। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে তার সাথে ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করার জন্য এক চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। এরপর তিনি চুক্তি অনুযায়ী খাদীজা (রাঃ) এর ক্রীতদাস মায়সারাকে সাথে নিয়ে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বারের মতো শাম তথা সিরিয়া গমন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর।

অতঃপর তিনি ফিরে এসে খাদীজা (রাঃ)-কে মূলধনসহ এত বেশি পরিমাণ অর্থ ফেরত দেন যে, ইতিপূর্বে খাদীজা (রাঃ) এত অর্থ আর কখনো পাননি। এতে খাদীজা (রাঃ) তাঁর উপর অনেক খুশি হয়ে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে খাদীজা (রাঃ) এর বিবাহ

খাদীজা (রাঃ) ছিলেন মক্কার ধনাঢ্য মহিলাদের মধ্যে একজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন একটি সফল ব্যবসায়িক অভিযান শেষে ফিরে আসলেন এবং তাঁর ক্রীতদাস মায়সারার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত মন-মানসিকতা, আমানতরক্ষায় আন্তরিকতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার মনোবাসনা তার মধ্যে জাগতে থাকে। তিনি বিষয়টি নিয়ে বান্ধবী 'নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ' এর সাথে আলোচনা

করলেন এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আলোচনা করার অনুরোধ জানালেন। ফলে বান্ধবী নাফীসা খাদীজা (রাঃ) এর প্রস্তাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রস্তাবটি সম্পর্কে চাচা আবু তালিবের সাথে আলোচনা করলেন। আবু তালিব এ ব্যাপারে খাদীজা (রাঃ) এর অভিভাকের সাথে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। তারা একটি দিন নির্ধারণ করে তাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদীজা (রাঃ) এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এটিই ছিল প্রথম বিবাহ। অপর পক্ষে খাদীজা (রাঃ) এর ছিল তৃতীয় বিবাহ। প্রথমে আবু হালা ইবনে যাররাহ আত-তামীমীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করলে আতীক বিন আবিদ আল মাখযুমীর সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা (রাঃ) এর জীবদ্দশায় অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। ইবরাহীম ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যান্য সকল সন্তানই খাদীজা (রাঃ) এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের প্রথম সন্তানের নাম ছিল কাসেম, যার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপনাম হয়েছিল আবুল কাসেম অর্থাৎ কাসেমের পিতা। এরপর জন্মগ্রহণ করেন যথাক্রমে যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ এর উপাধি ছিল তাইয়েব এবং তাহের। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সকল পুত্রসন্তান বাল্যকালেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাতিমা (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য সকল কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর ৬ মাস পর মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

হাজরে আসওয়াদ নিয়ে সৃষ্ট বিবাদের মীমাংসা

এ ঘটনাটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন। সে সময় কাবাঘর পুনঃনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কেননা তখন কাবা ঘরটি ছিল চারটি দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত; কিন্তু এর উপর কোন ছাদ ছিল না। উপরন্তু এটি ক্রমেই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, এমনকি অনেক সময় এর থেকে অনেক কিছু চুরি হয়ে যেত। তাছাড়া ঐ বছরই মক্কা নগরীতে বন্যা হওয়ায় কাবাঘরের দেয়ালগুলো প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। যার কারণে কুরাইশরা কাবা ঘরকে পুনরায় নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন কাবাঘর নির্মাণ কাজ চলতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে সকল গোত্রই হাজরে আসওয়াদ নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই দাবি করছিল যে, হাজরে আসওয়াদটি তারাই পুনঃস্থাপন করবে।

ফলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দাবিতে অটল থাকে। কেননা সকলেই জানত যে, এই পাথরটি একটি বরকতময় পাথর। সুতরাং যারা এটিকে পুনঃস্থাপন করবে তারা আলাদা মর্যাদা লাভ করবে। অবশেষে বিবাদটি সেদিনের জন্য স্থগিত রাখা হলো এবং 'আবু উমাইয়া মাখযুমী' নামক এক ব্যক্তির প্রস্তাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, তাঁর উপরেই এ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বর্তাবে। অতঃপর উপস্থিত সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেল এবং সকাল হওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগল। অবশেষে যখন সকাল হলো তখন দেখা গেল যে, মুহাম্মাদ ﷺ সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন, যিনি ছিলেন সকলের কাছে প্রিয়পাত্র। তখন সকলেই খুশি হয়ে বলে উঠল, "এই তো আমাদের আল-আমীন। আমরা সকলেই তাঁর উপর আস্থাশীল। তিনিই হলেন মুহাম্মাদ"।

অতঃপর সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট সমস্যাটি উত্থাপন করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাদর নিয়ে তার উপর নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ নামক পাথরটি রাখলেন। অতঃপর তিনি সকল গোত্রপতিকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আপনারা সকলে মিলে একসাথে চাদরটির চার কোণায় ধরুন এবং পাথরটি বহন করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে চলুন। ফলে তা-ই করা হলো। অতঃপর নির্দিষ্ট স্থানে পাথরটি মুহাম্মাদ ﷺ নিজ হাতে পুনঃস্থাপন করলেন এবং এতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে গেল। আর এভাবেই এত বড় একটি বিবাদের মীমাংসা খুব সহজেই হয়ে গেল।[৩৬]

উল্লেখ্য যে, এ সময় অর্থের অভাবে কাবা ঘরটি ইসমাঈল (আঃ) এর ভিত্তির উপর নির্মাণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বাধ্য হয়ে নির্মাণ কাজ করার সময় উত্তর দিক থেকে প্রায় নয় ফিট কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। কেননা কুরাইশরা এর নির্মাণ কাজে ব্যয় করার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র ও হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদের শর্ত করেছিল। কিন্তু তাদের কাছে এ ধরনের সম্পদের পরিমাণ এত কম ছিল যে, এটি নির্মাণ করার জন্য পরিমিত অর্থ সংগৃহীত হয়ে উঠেনি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নবুওয়াত লাভ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বয়স যখন ৪০ বছর ঠিক তখনই তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। নবুওয়াত লাভ করার কিছুদিন পূর্ব থেকেই তিনি আস্তে আস্তে জনগণ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন এবং অধিক নির্জনতাপ্রিয় হয়ে গেলেন। তিনি প্রতিদিন মক্কার দুই মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় ধ্যানমগ্ন

[৩৬] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১৯৭; আহমাদ, হা/১৫৫৪৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/১৬৮৩।

থাকতেন। তিনি ঠিক কোন্ দিনটিতে নবুওয়াত লাভ করে সর্বপ্রথম ওহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সে ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। তবে একথা স্পষ্ট যে, সেটি ছিল রমাযান মাস এবং কদরের রাত্রি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ﴾

রমাযান তো সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং হেদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও ফুরক্বান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)। (সূরা বাক্বারা- ১৮৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ﴾

আমি একে (কুরআনকে) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। আর তুমি কি জান, লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হলো, হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (সূরা ক্বদর, ১-৩)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿حٰمٓ - وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ - اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ﴾

হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাত্রিতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (সূরা দুখান, ১-৩)

সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, কদরের রাত্রিটি রমাযান মাসের শেষ দশ রাত্রির বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে নিহিত।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ঘুমের মধ্যে স্বপ্নরূপে ওহীর সূচনা হয়। স্বপ্নে তিনি যা দেখতেন তা-ই প্রভাতের আলোর ন্যায় তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে যেত। কিছুদিন এ অবস্থা চলার পর তাঁর অন্তরে লোকালয় হতে সংস্রবহীন নির্জনে থাকার প্রেরণা উদিত হয়। তিনি (মক্কা নগরী হতে তিন মাইল দূরে) হেরা নামক পর্বত গুহায় নির্জনে (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) বাস করতে লাগলেন। তিনি তাঁর পরিবারের নিকট না গিয়ে সেথায় কয়েক রাত পর্যন্ত ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। এজন্য তিনি সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। তারপর খাদীজা (রাঃ) এর নিকট ফিরে আসতেন। পুনরায় কিছু পানাহার সামগ্রী নিয়ে (একাধারে ইবাদাতে রত হওয়ার জন্য) হেরা গুহায় চলে যেতেন।

এমনিভাবে হেরা গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকাকালে হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট ওহী এলো। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে হাজির হয়ে বললেন, (হে নবী) আপনি পড়ুন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কথা শুনে জিবরাঈল (আঃ) আমাকে ধরে আলিঙ্গন করে এমন

জোরে চাপ দিলেন, যাতে আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন! জবাবে আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। এটা শুনে ফেরেশতা আবার আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতে লাগলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন, আপনি পড়ুন। জবাবে আমি আগের ন্যায় বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। এটা শুনে জিবরাঈল (আঃ) তৃতীয় বার আমাকে আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

﴿اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

পড়ো, তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা রক্তপিণ্ড হতে। পড়ো, তোমার প্রতিপালক অতি মহান। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের দ্বারা। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। (সূরা আলাক্ব, ১-৫)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াতসমূহ (তিলাওয়াত করতে করতে) বাড়ি ফিরলেন। তখন ভয়ে তাঁর অন্তর থর থর করে কাঁপছিল। তিনি স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দাও। অতঃপর খাদীজা (রাঃ) তাঁকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি স্ত্রী খাদীজাকে সব ঘটনা খুলে বললেন এবং বললেন, আমি আমার জীবন নিয়ে ভয় করছি। তখন তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারিণী খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! কিছুতেই নয়, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনো চিন্তায় ফেলবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন; ইয়াতীম, বিধবা, অন্ধ ও অক্ষমদের খাওয়া-পরা ও থাকার ব্যবস্থা করে থাকেন, বেকারদের কর্মসংস্থান করেন, মেহমানের সম্মান করে থাকেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের সাহায্যে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকেন (অতএব এ অবস্থায় আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই)।

এরূপ সান্ত্বনা দেয়ার পর খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাথে নিয়ে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল এর নিকট গেলেন। যিনি জাহেলিয়াতের যুগে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইব্‌রানী ভাষায় কিতাব লিখতেন। সুতরাং সুরইয়ানী ভাষার ইঞ্জীল কিতাব হতে তিনি ইব্‌রানী ভাষায় আল্লাহর ইচ্ছায় সামর্থানুযায়ী অনেক কিছু লিখেছেন (এক কথায় তিনি আসমানী কিতাবে পারদর্শী ছিলেন)। তিনি সে সময় খুব বৃদ্ধ হওয়ায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাকে বললেন, হে চাচাতো

ভাই! আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তখন ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সব ঘটনা খুলে বললেন, যা তিনি দেখেছিলেন। ঘটনাটি শোনার পর ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, উনি তো সেই মঙ্গলময় বার্তাবাহক, জিবরাঈল ফেরেশতা, যাকে আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! (তোমার নবুওয়াতের প্রচারকালে) যদি আমি ক্ষমতাশালী যুবক হতাম! যদি আমি সেদিন জীবিত থাকতাম যেদিন তোমার কওম তোমাকে দেশান্তরিত করে ছাড়বে!

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আমার দেশবাসী কি আমাকে বিতাড়িত করবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ! তুমি যে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, ইতিপূর্বে এরূপ সত্য ধর্ম নিয়ে যারাই তাদের কওমের নিকট এসেছিলেন, তাদের কওম তাদের সাথে শত্রুতা না করে ছাড়েনি। (আমি তোমাকে কথা দিলাম) যদি আমি সেদিন জীবিত থাকি, তাহলে অবশ্যই প্রবলভাবে তোমাকে সাহায্য করব।

কিন্তু এর কিছু দিন পরই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন। এরপর কিছুদিন ওহী আগমন করা বন্ধ ছিল।[৩৭]

সাময়িকভাবে ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে যাওয়া

হঠাৎ ওহী প্রাপ্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাময়িকভাবে কিছুটা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যাতে সহজেই এ অবস্থা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিকভাবে আবারও ওহীর প্রতি আগ্রহী হন, সম্ভবত সে কারণেই কিছুদিন ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল।

পুনরায় ওহীর আগমন

কিছুদিন ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ধীরে ধীরে নিজেকে স্বাভাবিক করে তুললেন। সেসময় তাঁর মনে এ ধারণাও বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তিনি আল্লাহর রাসূল বা বার্তাবাহক। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করেছেন। সর্বপ্রথম যিনি তাঁর নিকট আগমন করেছিলেন তিনিই ছিলেন আসমানী দূত জিবরাঈল (আঃ)। তিনি ওহী গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেন এবং আগ্রহী হয়ে উঠেন। তখন একদিন জিবরাঈল (আঃ) আবারও ওহী নিয়ে আগমন করেন। হাদীসে এসেছে,

---

[৩৭] সহীহ বুখারী, হা/৩; সহীহ মুসলিম, হা/৪২২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬০০১; মিশকাত, হা/৫৮৪১।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, (হেরা গুহার ঘটনার) পর আমার নিকট ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর একদিন আমি রাস্তা দিয়ে চলছিলাম, এমনসময় আকাশ হতে এক আওয়াজ শুনলাম। তখন আমি আকাশের দিকে তাকালাম। দেখলাম, হেরা গুহায় আমার নিকট যিনি এসেছিলেন, ইনি সেই ফেরেশতা। আসমান ও জমিনের মাঝখানে একটি 'কুরসী' এর উপর বসে আছেন। আমি তাকে দেখে ভীত হয়ে গেলাম; এমনকি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর আমি পরিবার-পরিজনের কাছে এসে বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো, আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন–

﴿يَاۤ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠো, লোকদেরকে সতর্ক করো। তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, তোমার পোশাক পবিত্র করো এবং অপবিত্রতা দূর করো– (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ১-৫)।[৩৮]

এরপর থেকে অবিরাম ধারায় ওহী নাযিল হতে থাকে। অতঃপর পরবর্তীতে আরো একবার ওহীর আগমন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মাদের রব তাকে ছেড়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা যোহা নাযিল করে বলেন,

﴿وَالضُّحٰى - وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى﴾

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, তোমার পালনকর্তা তোমাকে ত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। (সূরা যোহা, ১-৩)

দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা

মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহী নাযিল হওয়ার মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ধীরে ধীরে বিভিন্নভাবে আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট প্রচার করতে থাকেন এবং তাদের নিকট আল্লাহর সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে থাকেন। তারপর তিনি আল্লাহ সম্পর্কে তাদের নানা ধরনের শিরকী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মক্কী জীবনের দাওয়াতী কার্যক্রমকে পর্যালোচনা করলে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

[৩৮] সহীহ বুখারী, হা/৩২৩৮; সহীহ মুসলিম, হা/৪২৫; তিরমিযী, হা/৩৩২৫; মিশকাত, হা/৫৮৪৩।

প্রথম পর্যায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়টি ছিল খুবই গোপনীয়। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে গোপনে দাওয়াত দিতেন এবং বিষয়টি কেবল নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন। বিশেষ করে তিনি তাদেরকেই দাওয়াত দিতেন, যারা তাঁর প্রতি বেশ আগ্রহী এবং যাদের কথাবার্তা ও চালচলনে সত্যপ্রীতির ছাপ রয়েছে। তিনি তাদের নিকট আল্লাহর বাণীগুলো পাঠ করে শোনাতেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো সুস্পষ্ট ও নম্র ভাষায় তুলে ধরতেন। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রথম আহ্বানেই যারা সাড়া দিয়েছিলেন তারা হলেন– নারীদের মধ্যে স্ত্রী খাদীজা (রাঃ), পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ), শিশুদের মধ্যে আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ), ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ)। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথেই তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং বিনা দ্বিধায় তাঁর কথা মেনে নিয়েছিলেন।

এরপর তারা তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দাওয়াতী কাজ গতিশীল করতে থাকেন এবং তাদের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আবু বকর (রাঃ) এর নিজ প্রচেষ্টায় উসমান (রাঃ), জুবায়ের (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া এ পর্যায়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- বেলাল (রাঃ), আবু উবায়দা (রাঃ), আমের বিন জাররাহ (রাঃ), আবু সালামা বিন আবদুল আসাদ (রাঃ), আরকাম বিন আবিল আরকাম (রাঃ), উসমান বিন মাযউন (রাঃ), কুদামা ইবনে মাযউন (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে মাযউন (রাঃ), উবায়দা বিন হারিস ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ (রাঃ), সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ), ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রাঃ), খাব্বাব বিন আরাত (রাঃ) ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সৌভাগ্যবান সাহাবীবৃন্দ।

সালাত আদায়ের নির্দেশ :

প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব আয়াত নাযিল হয় তাতে সালাতের নির্দেশনা বিদ্যমান ছিল। তবে সে সময় কেবল ফজরের দুই রাক'আত এবং মাগরিবের দুই রাক'আত সালাত আদায় করা ফরয ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾

সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। (সূরা মু'মিন- ৫৫)

এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ সালাত আদায় করার জন্য গোপন ঘাঁটিতে চলে যেতেন এবং সেখানে সালাত আদায় করতেন। একদা আবু তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আলী (রাঃ)-কে সালাত আদায় করতে দেখেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করে প্রকৃত বিষয়টি অবগত হওয়ার পর তিনি তাঁদেরকে এর উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া :

এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রথম পর্যায়ের দাওয়াতী কার্যক্রম ধীরে ধীরে চুপিসারে এগিয়ে যেতে থাকে। তারপরও কুরাইশদের নিকট বিষয়টি প্রকাশ পায়। কিন্তু তখনও তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এসব কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করেনি। তারা বিষয়টিকে সে যুগের প্রচলিত হানীফ সম্প্রদায়ের মতো মনে করেছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতী কার্যক্রম ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁর অনুসারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে, তখন ধীরে ধীরে বিষয়টিকে তারা বেশ গুরুত্বের সাথে দেখতে থাকে। আর এমন পরিস্থিতিতেই কেটে যায় তিনটি বছর। এ সময়ের মধ্যেই ঈমানদারদের একটি ছোট দলও তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যারা একে অপরের সাথে শক্ত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তারা এমনভাবে তৈরি হয়েছিলেন যে, সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আহ্বানে জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন এবং তারা সর্বদাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যথাযথ মর্যাদা প্রদানে সচেষ্ট থাকতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে গোপনে গোপনে প্রায় তিন বছর ইসলাম প্রচার বা দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো হয়। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি আদেশ দেয়া হয়। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে নির্দেশ প্রদান করা হয় সেটি হলো,

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ﴾

আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। (সূরা শু'আরা- ২১৪)

এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতকে আরো গতিশীল করার জন্য প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বেরিয়ে আসেন এবং প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করা শুরু করেন।

নিকটাত্মীয়দেরকে দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর একদিন তিনি বনু হাশেম গোত্রকে নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করলেন। সেখানে বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফেরও একদল লোক উপস্থিত ছিল। এতে উপস্থিত লোকের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। সম্মেলনের শুরুতেই চাচা আবু লাহাব হঠাৎ করে বলে উঠল যে, দেখো ভাতিজা! এরা সকলেই তোমার নিকটাত্মীয়– চাচা, চাচাতো ভাই ইত্যাদি। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করো। তোমার জানা উচিত যে, তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সাথে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখাই হচ্ছে তাদের কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য তোমার পিতৃ পরিবারই যথেষ্ট। তুমি যদি তোমার ধ্যান-ধারণা এবং কথাবার্তায় অটল থাকো, তাহলে এটা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক যে, সমগ্র কুরাইশ গোত্র তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে এবং অন্যান্য আরব গোত্র এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবে।

আবু লাহাবের এমন কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ঐ নীরবতার মধ্য দিয়েই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরেক দিন নিকটাত্মীয়দেরকে একত্রিত করে আবারো সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রদান করেন। সেটি হলো– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তারপর তিনি বলেন, কল্যাণকামী পথপ্রদর্শক আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথে কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না। সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ জানেন তোমরা সকলেই সেভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হবে যেমনটি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো এবং সেভাবেই পুনরায় উত্থিত হবে যেমনটি তোমরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হও। পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে পুণ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আবাসস্থল জান্নাতে ও পাপাচারের ফলশ্রুতি হিসেবে কঠিন আযাব ও দুঃখ-কষ্টের আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ কথা শুনে চাচা আবু তালিব বললেন, আমরা কতটুকু তোমার সাহায্য করতে পারব! তোমার উপদেশ আমাদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং তোমার কথাবার্তা কতটুকু সত্য বলে আমরা জানব! এখানে সমবেত লোকজন তোমার পিতৃপরিবারের সদস্য এবং আমিও অনুরূপ একজন সদস্য। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, তোমার সহযোগিতার জন্য তাদের তুলনায় আমি অগ্রগামী আছি। অতএব তোমার নিকট যে নির্দেশনাবলি নাযিল হয়েছে সে অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকো। আল্লাহ ভরসা! আমি অবিরামভাবে তোমার কাজ-কর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করব এবং তোমার প্রতি আমার সদয় সহানুভূতি সবসময় থাকবে। তবে আবদুল মুত্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, আল্লাহর শপথ! এ হচ্ছে অন্যায়। একে অন্যদের আগে তোমরাই থামিয়ে দাও। তখন আবু তালিব বললেন, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি মুহাম্মাদের হেফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব।

সাফা পর্বতের উপর আরোহণ করে দাওয়াত প্রদান

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এসব সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ বারের মতো নিকটাত্মীয়দেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করার জন্য সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। তখনকার যুগে প্রচলন ছিল যে, যদি কখনো কোন ধরনের বিপদাপদ দেখা দিত অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করার প্রয়োজন হতো, তখন তারা সাফা পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করে 'ইয়া সাবাহাহ' অর্থাৎ হায় প্রাতঃকাল! বলে চিৎকার করতে থাকত। এতে লোকজন সবাই তার কথা শোনার জন্য একত্রিত হয়ে যেত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন। তিনি সেখানে ঐ শব্দগুলো উচ্চারণ করে বললেন, ওহে বনু ফিহর! ওহে বনু আদী! তখন সকলেই একত্রিত হলো। এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষে সেখানে উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হলেও ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা বলো, আজ (এই পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে) আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, পর্বতের আড়ালে এক বিরাট শত্রু বাহিনী তোমাদের সবকিছু লুণ্ঠন করে নেয়ার জন্য লুকিয়ে আছে, তাহলে তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করবে কি? সকলে সমস্বরে উত্তর দিল, হ্যাঁ– নিশ্চয়। আপনার কথা বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই; আর আমরা আপনাকে কখনই মিথ্যা বলতে শুনিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তা-ই হয় তবে শুনো, আমি

তোমাদেরকে পাপ ও আল্লাহদ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম এবং তার জন্য অবশ্যম্ভাবী কঠোর দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি।
এতটুকু শুনে আবু লাহাব ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল, তোর সর্বনাশ হোক! এজন্যই কি তুই এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস? তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।[৩৯]
এ ঘটনার আরেকটি অংশ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর (আযাব) থেকে নিজেদেরকে কিনে নাও (বাঁচাও)। তোমাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমাদেরকে আমি রক্ষা করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব! তোমাকেও আমি রক্ষা করতে পারব না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সাফিয়া! আমি আল্লাহর (আযাব) থেকে তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে আল্লাহর রাসূলের কন্যা ফাতিমা! তোমার যা ইচ্ছা চাও। আল্লাহর (আযাব) থেকে আমি তোমাকেও রক্ষা করতে পারব না।[৪০]

কাফিরদের প্রতিক্রিয়া ও আবু তালিবের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ গোত্রকে দাওয়াত দেয়ার পর এ দাওয়াত ক্রমেই মক্কার বাহিরেও প্রসারিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় দাওয়াতী কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে এবং এতে অটল থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে বলেন,

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করো। (সূরা হিজর- ৯৪)
এরপর থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বহুত্ববাদের বিশ্বাস এবং মিথ্যার পর্দা উন্মোচন করে প্রতিমার প্রকৃতি, মর্যাদা এবং মূল্যের অসারতা সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে কথা বলা শুরু করলেন। এই প্রতিমাগুলোর জড়ত্ব, অসামর্থতা ও অকর্মাণ্যতা যুক্তি-প্রমাণসমূহ তিনি জোরালো কণ্ঠে তুলে ধরেন এবং যারা এদেরকে আল্লাহ এবং নিজের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তৈরি করে নিয়েছে তারা যে কত বড় ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে তাও বলতে লাগলেন। এতে মুশরিকরা ক্রমেই ক্ষিপ্ত হতে শুরু করল। এদিকে তিনি

[৩৯] সহীহ বুখারী, হা/২৭৫৩; সহীহ মুসলিম, হা/২০৮; মিশকাত, হা/৫৩৭২-৭৩।
[৪০] সহীহ মুসলিম, হা/৫২৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬০৬৬।

আবু তালিবের মতো সম্মানিত লোকের আশ্রয়ে থাকার কারণে তারা তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেও কুণ্ঠাবোধ করল। অবশেষ তারা কোন পথ খুঁজে না পেয়ে সকলে মিলে আবু তালিবের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করল। তারা আবু তালিবকে বলল, হে আবু তালিব! আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে গালিগালাজ করছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে, আমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেকহীন মূর্খ বলছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ধর্মভ্রষ্ট বলছে। অতএব হয় আপনি তাকে এ জাতীয় কাজকর্ম থেকে বিরত রাখুন, নতুবা আমাদের এবং তার মধ্য থেকে আপনি দূরে সরে যান। কারণ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী আপনিও আমাদের মতোই ভিন্নধর্মের অনুসারী। সুতরাং আমরাই আপনার ভাতিজার জন্য যথেষ্ট হব।

তখন আবু তালিব তাদের এসব আবেগপূর্ণ কথা শুনে তাদেরকে বুঝিয়ে কোনভাবে বিদায় করলেন। ফলে তারা চলে গেল। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাওয়াতী কাজ পূর্ণ গতিতে চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং এতে কোন রকম প্রভাবান্বিত হলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের কলা-কৌশল

যখন কুরাইশরা দেখল যে, আবু তালিবের কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে কোন লাভ হলো না; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাজ আরো দ্রুত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা এ দাওয়াত প্রতিরোধ করার জন্য নানা ধরনের কলা-কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করল। যেমন–

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্য মক্কার কাফির-মুশরিকরা প্রথমত যে পদক্ষেপটি হাতে নেয়, সেটি হলো তাঁর বিরুদ্ধে নানাবিধ অপবাদ আরোপ করে তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বিভিন্ন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ আরোপ করত। যেমন– কখনো বলতো তিনি একজন পাগল[৪১], আবার কখনো বলতো তিনি একজন কবি[৪২], আবার কখনো বলতো তিনি একজন যাদুকর[৪৩], আবার কখনো বলতো তিনি একজন মিথ্যুক[৪৪], আবার কখনো বলতো তিনি একজন গণক[৪৫], আবার কখনো বলতো তিনি একজন পথভ্রষ্ট[৪৬], আবার কখনো বলতো তিনি একজন ধর্মত্যাগী ইত্যাদি।

---

[৪১] সূরা সাফফাত- ৩৬।
[৪২] সূরা সাফফাত- ৩৬।
[৪৩] সূরা সোয়াদ- ৪।
[৪৪] সূরা ফুরকান- ৪।
[৪৫] সূরা তূর- ২৯।
[৪৬] সূরা মুতাফফিফীন- ৩২।

হজ্জযাত্রীদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা :

মক্কায় প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে অনেক লোকের সমাগম হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবসময় এ সুযোগটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। এভাবে তিনি এ দাওয়াতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেন। কুরাইশরা এটা বুঝতে পেরে মক্কায় আগত হজ্জযাত্রীদেরকে আগে থেকেই নানাভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সতর্ক করে দিত এবং তাঁর ব্যাপারে নানা ধরনের অপবাদ দিয়ে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করত।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ :

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে দাওয়াত দিতে যেতেন, তখন কুরাইশরা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। তারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যাবাদী বলা, তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, অবমাননাকর উক্তি করা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করত।

জনমনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা :

মানুষ যাতে কোনভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দ্বীন গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয় অথবা এ নিয়ে ভাবার সময় না পায় সেজন্য কুরাইশরা জনমনে নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। যেমন– এগুলো পূর্ব যুগের কাহিনী, এগুলো কোন জ্বিন এসে তাঁকে শিক্ষা দিয়ে যায় ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করত।

কিসসা-কাহিনীর আসর বসানো :

জনগণ যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী শোনা থেকে বিরত থাকে সেজন্য তারা নানা ধরনের কিসসা-কাহিনীর আয়োজন করত। ফলে অধিকাংশ মানুষ সেসব কিসসা-কাহিনী শোনার মধ্যে ব্যস্ত থাকত। আর এজন্য তারা কোন কোন সময় অন্য দেশ থেকে গল্পকারকে নিয়ে আসত।

নাচ-গানের আসর :

কুরাইশরা এ দাওয়াত থেকে মানুষদেরকে দূরে রাখার জন্য কিসসা-কাহিনীর মতো নাচ-গানেরও আয়োজন করত। যাতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অহেতুক প্রশ্নকরণ :

কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভ্রান্ত করার জন্য ইয়াহুদি নেতাদের সাথে পরামর্শ করে অতীতে ঘটে যাওয়া নানা ধরনের ঘটনাবলি সম্পর্কে অহেতুক প্রশ্ন করত। যেমন– আসহাবে কাহাফের ঘটনা, যুলক্বারনাইনের ঘটনা, ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা ইত্যাদি। আবার কখনো কখনো ফেরেশতাদের সম্পর্কে অথবা রূহ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করত। তখন আল্লাহ তা'আলা

ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করতেন।[৪৭]

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর আরোপিত সকল ধরনের কলা-কৌশল যখন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল, তখন কাফিররা ইয়াহুদি পণ্ডিতদের কাছ থেকে আরো একটি বিস্ময়কর কৌশল শিখে নিল। আর তা হলো, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব দিবে। ফলে তিনি ব্যর্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এর বিপরীত। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ প্রস্তাব দিল তখন তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে এ কাজটি করতে রাজি হয়ে গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের ইশারা করলে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং তা সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।[৪৮] এমনকি পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছ থেকেও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি জানা গেল।[৪৯] কিন্তু এত স্পষ্ট নিদর্শন থাকার পরও কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করল না। বরং তারা উল্টো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বড় যাদুকর বলে অপবাদ আরোপ করতে থাকল।

আপোষমুখী প্রস্তাব পেশ :

কাফিররা যখন আর কোনভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর বিজয়ী হতে পারছিল না, তখন তারা কিছু কিছু বিষয়ে আপোষ করতে চাইল। তাদের ধারণা ছিল যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সেসব প্রস্তাব মেনে নিবেন। অথচ তাদের সকল ধরনের আপোষমুখী প্রস্তাবই ছিল শিরক মিশ্রিত, যা কখনো মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সেসকল প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। যেমন– একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবাঘরে তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় কাফিরদের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! এসো তুমি যার ইবাদাত কর আমরাও তার ইবাদাত করি। আর আমরা যার ইবাদাত করি, তুমিও তার ইবাদাত করো। আমরা এবং তুমি আমাদের কাজে একে অপরের শরীক হই। অতঃপর তুমি যার ইবাদাত কর তিনি যদি আমরা যার ইবাদাত করি তার চেয়ে উত্তম হন, তাহলে আমরা তার ইবাদাতে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করব। আর আমরা যাদের ইবাদাত করি তারা যদি তুমি যার ইবাদাত কর তার চেয়ে উত্তম হয়, তাহলে তুমি তাদের ইবাদাতে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের এসব প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাফিরূন নাযিল করেন এবং তাদের এসব অযৌক্তিক প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।[৫০]

---

[৪৭] ফাতহুল বারী, ৪৭২১ নং হাদীসের আলোচনা; সহীহ মুসলিম, হা/২৭৯৪; তিরমিযী, হা/৩১৪০।
[৪৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৬৮-৭১; সহীহ মুসলিম, হা/২৮০০; মিশকাত, হা/৫৮৫৪-৫৫।
[৪৯] তাফসীরে ইবনে জারীর, হা/৩২৬৯৯; কুরতুবী, হা/৫৭৩৭।
[৫০] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৬২।

মুসলিমদের প্রতি কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের এক বৎসর অতিক্রম করে নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে পদার্পণ করলেন এবং ব্যাপক সফলতা অর্জন করে ফেললেন তখন মক্কার কাফির-মুশরিকরা তাঁর প্রতি আরো উত্তেজিত হয়ে গেল। এ প্রেক্ষাপটে তারা ২৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করল, যার নেতৃত্বে ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচা আবু লাহাব। তাদের মূল কাজ ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইসলাম প্রচার করা থেকে বিরত রাখা এবং মুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনা। এতে প্রয়োজনে তারা কোনরূপ অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতনের আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

এরপর থেকে মুসলিমদের উপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। বিশেষ করে যারা সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোক ছিল তারা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতো এবং তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য কেউ আসত না। আর ক্রীতদাস হলে তো কোন কথাই নেই। মোটকথা নির্যাতনের একপর্যায়ে মুসলিমদের পক্ষে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। বিলাল (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুমাইয়া (রাঃ) ইত্যাদি গরীব সাহাবীগণ ছিলেন এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। কুরাইশদের এ নির্যাতন থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও রেহাই পাননি। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। এটা দেখে আবু জাহেল ও তার সাথিরা মিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঘাড়ের উপর উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে দিল। অতঃপর ফাতিমা (রাঃ) খবর পেয়ে তাঁর উপর থেকে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে নাম ধরে অভিশাপ দিয়েছিলেন।[৫১]

উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে তার চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রেখে নিচ থেকে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া দিত। মুস'আব বিন উমায়ের (রাঃ) এর মা তার ইসলাম গ্রহণ করার কথা জানতে পেরে তার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেই তিনি অশেষ আরাম-আয়েশে ও সুখ-সাচ্ছন্দে জীবনযাপন করছিলেন।

এভাবে প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ গোত্রের নওমুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাত। কিন্তু যেসব নওমুসলিম কোন গোত্রের সাথেই সম্পৃক্ত থাকত না, তাদের উপর এত অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো যে, পাষাণ-হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিটিও তা প্রত্যক্ষ করে অস্থির কিংবা বিচলিত না হয়ে পারত না।

---

[৫১] সহীহ মুসলিম, হা/৪৭৫০।

মুসলিমদের ঘাঁটি

মুসলিমদের এমন কঠিন দিনে তারা আরকাম বিন আবুল আরকাম মাখযুমীর বাড়িটিকে গোপন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করত। এটি ছিল সাফা পর্বতের উপর কাফির-মুশরিকদের দৃষ্টির আড়ালে এবং তাদের সম্মেলন কেন্দ্র থেকে দূরে। আর এ বাড়িটিকেই ইসলামের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও গণ্য করা হয়।

মুসলিমদের হাবশায় হিজরত

মুসলিমগণ হাবশায় দুই বার হিজরত করেছিলেন। প্রথমবার হিজরত করেছিলেন ৫ম নববী বর্ষের রজব মাসে। আর দ্বিতীয়বার হিজরত করেছিলেন উক্ত বছরের যিলকদ মাসে।

প্রথম হিজরত :

প্রথমবার যারা হিজরত করেছিলেন তারা ছিলেন ১২ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা। তাদের দলনেতা ছিলেন উসমান (রাঃ)। আর এই দলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যা রুকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। মক্কায় যখন কাফিররা মুসলিমদের উপর চরমভাবে নির্যাতন শুরু করে দিয়েছিল, তখন তিনি সাহাবীগণের পরামর্শক্রমে উক্ত দলটিকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দেন। কেননা তিনি ইতিপূর্বেই জানতে পেরেছিলেন যে, হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজ্জাশী একজন ন্যায়নিষ্ঠ শাসক। তার রাজ্যে সকলেই সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দেয়া হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ আশা পোষণ করেছিলেন যে, যদি নির্যাতিত মুসলিমদেরকে সেখানে পাঠানো হয়, তাহলে তারা আপাতত কুরাইশ কাফিরদের হাত থেকে রেহাই পাবে।

দ্বিতীয় হিজরত :

দ্বিতীয়বার যারা হাবশায় হিজরত করেন তারা ছিলেন ৮২/৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮/১৯ জন মহিলা। তাদের দলনেতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ)। হাবশায় প্রথমদল হিজরত করার মাধ্যমে কুরাইশরা যখন জানতে পেরেছিল যে, সেখানে তারা নিরাপদে বসবাস করছে, তখন তারা খুবই রাগান্বিত হলো। ফলে তারা মুসলিমদের হিজরত করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক হয়ে গেল। কিন্তু এরপরও মুসলিমদের এই বৃহত্তম দলটি তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হাবশায় হিজরত করতে সক্ষম হন।

এদিকে কুরাইশরা তাদের হাবশায় গমনের সংবাদ পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে যায়। ফলে তারা তাদেরকে ফেরত আনার জন্য আমর ইবনুল 'আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবী'আকে দায়িত্ব দিয়ে হাবশায় প্রেরণ করে।

তারা সেখানে গিয়ে প্রথমে নাজ্জাশীর দরবারে উপঢৌকন পেশ করল। তারপর বলল, হে বাদশাহ! আপনার দেশে আমাদের কিছু মূর্খ লোক পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে– যারা তাদের সম্প্রদায়ের দ্বীন পরিত্যাগ করেছে; এমনকি তারা আপনাদের ধর্মেও প্রবেশ করেনি। তারা এমন এক নতুন দ্বীন নিয়ে এসেছে, যে ব্যাপারে আমরা কখনো শুনিনি এবং আপনিও কিছু জানেন না। আমাদের সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি তাদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফেরত পাঠান।

তাদের কথা শেষ হলে উপস্থিত পাদ্রীনেতাগণ কুরাইশ দূতদ্বয়ের সমর্থনে মুহাজিরগণকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করল। তখন বাদশাহ বললেন, আল্লাহর কসম! এটা কখনোই হতে পারে না। তারা আমার দেশে এসেছে এবং অন্যদের চেয়ে আমাকে পছন্দ করেছে। অতএব তাদের বক্তব্য না শুনে কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। ফলে তিনি আশ্রিত মুসলিম দলটিকে বাদশার দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন।

সে অনুযায়ী পরের দিন জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) তাঁর সাথিদের নিয়ে বাদশার দরবারে উপস্থিত হন। যখন তিনি বাদশার দরবারে উপস্থিত হন, তখন তিনি ইসলামিক নিয়ম অবলম্বন করে অন্যান্যদের মতো সিজদা করলেন না। ফলে বাদশাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা প্রথানুযায়ী আমাকে সিজদা করলে না কেন? যেমনিভাবে ইতিপূর্বে তোমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদ্বয় এসে করেছে? বাদশাহ আরো বললেন, তোমরা বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং আমাদের ধর্ম গ্রহণ না করে নতুন যে ধর্ম গ্রহণ করেছ সেটা কী, আমাকে শোনাও!

তখন জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ) বললেন, হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না। বাদশাহ বললেন, এসব কথা তোমাদেরকে কে শিখিয়েছেন? জাফর (রাঃ) বললেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা মূর্তিপূজা ও অশ্লীলতা এবং অন্যায় ও অত্যাচারে নিমজ্জিত ছিলাম। আমরা শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে শোষণ করতাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাদের মধ্য হতে তাঁর শেষ নবীকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর নাম মুহাম্মাদ। তিনি আমাদের চোখের সামনে বড় হয়েছেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারিতা, সংযমশীলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণাবলি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। নবুওয়াত লাভের পর তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় এক আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে সাথে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম হতে তওবা করে সৎকর্মশীল

হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এক আল্লাহর ইবাদাত করছি ও হালাল-হারাম মেনে চলছি। এতে আমাদের সম্প্রদায়ের নেতারা আমাদের উপর রাগান্বিত হয়েছে এবং আমাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছে। ফলে আমরা বাধ্য হয়ে আপনার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আমরা অন্য স্থান বাদ দিয়ে আপনাকে পছন্দ করেছি এবং আমরা আপনার এখানেই থাকতে চাই। কেননা আমরা জানি যে, আপনি ন্যায়বিচার করে থাকেন। আশা করি আমরা আপনার নিকট অত্যাচারিত হব না।

জাফর (রাঃ) আরো বললেন, হে বাদশাহ! অভিবাদন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, জান্নাতবাসীদের পরস্পরে অভিবাদন হলো 'সালাম' এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পরস্পরে 'সালাম' করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন বাদশাহ বললেন, ঈসা ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে তোমরা কী বলতে চাও? উত্তরে জাফর (রাঃ) সূরা মারইয়ামের শুরু থেকে নিয়ে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শোনান। যেখানে যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ) এর বর্ণনা, মারইয়াম (আঃ) এর প্রতিপালন, ঈসা (আঃ) এর জন্মগ্রহণ ও লালন-পালন, শিশুকালে ঈসা (আঃ) এর কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। আর বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং তাওরাত-ইঞ্জীলের পণ্ডিত। ফলে তিনি কুরআনের অপূর্ব বাকভঙ্গি ও ভাষালঙ্কার এবং ঘটনার সারমর্ম উপলব্ধি করে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। সাথে সাথে উপস্থিত পাদ্রীগণও কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর নাজ্জাশী বলে উঠলেন, নিশ্চয় এই কালাম এবং ঈসার নিকট যা নাযিল হয়েছিল দুটি একই আলোর উৎস থেকে নির্গত। তারপর তিনি কুরাইশ দূতদ্বয়ের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা চলে যাও! আল্লাহর কসম! আমি কখনই এদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না। ফলে সেদিনকার মতো আমর ইবনে আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবী'আহ বাদশার দরবার থেকে বেরিয়ে যায়।

অতঃপর তারা পরের দিন আবার বাদশার দরবারে আগমন করে বলল, হে বাদশাহ! এরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সব কথা বলে থাকে। এ কথা শুনে বাদশাহ মুসলিম দলটিকে আবার ডাকালেন। তখন তারা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা নাসারারা ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য হিসেবে মানে। কিন্তু মুসলিমরা তাকে আল্লাহর বান্দা বলে থাকে। অবশেষে তারা কোনরূপ বাহানার আশ্রয় না নিয়ে সত্য বলার ব্যাপারে মনস্থির করলেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলেন। অতঃপর তারা বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হলে বাদশাহ তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে দলনেতা জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ) বললেন, তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রেরিত রূহ এবং তাঁর নির্দেশ, যা তিনি মহীয়সী কুমারী

মাতা মারইয়ামের উপর ফুঁকে দিয়েছিলেন। কোন পুরুষ লোক তাকে [মারইয়াম (আঃ)-কে] স্পর্শ করেনি।

এসব কথা শুনে বাদশাহ নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি কাঠের টুকরো উঠিয়ে নিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যা বলেছ ঈসা ইবনে মারইয়াম তার চেয়ে এই কাঠের টুকরা পরিমাণও বেশি ছিলেন না। তারপর তিনি জাফর (রাঃ) ও তার সাথিদের উদ্দেশ্যে বললেন, যাও! তোমরা আমার দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে ব্যক্তি তোমাদের গালি দিবে, তার জরিমানা হবে। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, তোমাদের কাউকে কষ্ট দেয়ার বিনিময়ে যদি কেউ আমাকে স্বর্ণের পাহাড় এনে দেয়, তবুও আমি তা পছন্দ করব না। অতঃপর তিনি কুরাইশ দূতদ্বয়ের প্রদত্ত উপঢৌক ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৫২]

এরপর থেকে তারা সেখানে দীর্ঘদিন যাবত নিরাপদে অবস্থান করেন এবং ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের দিন মদিনায় ফিরে আসেন।

আবু তালিবের প্রতি কুরাইশদের পক্ষ থেকে হুমকি

এত কিছুর পরও যখন মুসলিমদের থামানো সম্ভব হচ্ছিল না তখন কুরাইশরা আবু তালিবকে আরো বড় ধরনের হুমকি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যাতে করে আবু তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পথ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা হতে নিবৃত্ত করতে পারে। সুতরাং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা একদিন আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল, আপনি আমাদের মাঝে মান-মর্যাদার অধিকারী একজন বয়স্ক ব্যক্তি। আমরা ইতিপূর্বে আপনার নিকট আবেদন করেছিলাম যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে নিন্দা করা থেকে বিরত রাখুন। কিন্তু আপনি তা করেননি। আপনি মনে রাখবেন, আমরা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি না যে, আমাদের পিতা, পিতামহ এবং পূর্বপুরুষদের গালমন্দ করা হবে, আমাদের বিবেককে নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করা হবে এবং আমাদের দেব-দেবীদেরকে নিন্দা করা হবে। আমরা আবারও আপনাকে অনুরোধ করছি, হয় আপনি তাকে সেসব থেকে নিবৃত্ত রাখুন, নতুবা আমাদের দুই দলের মধ্যে এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতেই থাকবে।

কুরাইশ নেতাদের এমন কঠোর হুমকিতে আবু তালিব খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। ফলে তিনি তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডেকে পাঠালেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, বাবা– একটু ভেবে চিন্তে কাজ করো। যে ভার বহন করার শক্তি আমার নেই, সে ভার তুমি আমার উপর চাপিয়ে

[৫২] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৩৩৩-৩৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪০; যাদুল মা'আদ, ৩/২৬।

দিয়ো না। চাচার এ ধরনের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেকটা চিন্তিত হয়ে গেলেন এবং কুরাইশদের কঠোরতা কিছুটা অনুভব করলেন। কিন্তু তিনি এতে কোনরকম প্রভাবান্বিত না হয়ে চাচাকে বললেন, চাচাজান; আল্লাহর কসম! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি আমার এই কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও পিছপা হব না। এতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে হয় জয়যুক্ত করবেন, নতুবা আমি ধ্বংস হয়ে যাব।

আবু তালিব এক দিকে কুরাইশদের কঠোরতা এবং অপরদিকে ভাতিজা মুহাম্মাদ ﷺ এর অনমনিয়তা প্রত্যক্ষ করে নিজের মধ্যে অসহায়ত্ব অনুভব করলেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি নির্দ্বিধায় তোমার কাজ করে যাও। আল্লাহর কসম! আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করব না।

এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

পুনরায় আবু তালিবের নিকট কুরাইশদের আগমন

কুরাইশরা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে আবু তালিবকে এত কঠোর হুমকি দেয়ার পরও কোন ফলাফল পাওয়া গেল না, তখন তারা একটি অভিনব অফার নিয়ে পুনরায় আবু তালিবের কাছে গমন করল। তারা বলল, হে আবু তালিব! এ হচ্ছে কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ধীমান যুবক। আপনি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করুন। এর রক্তপাতের খেসারত এবং সাহায্যের অধিকারী আপনিই হবেন। এই যুবক আজ হতে আপনার সন্তান বলে গণ্য হবে। এর পরিবর্তে আপনার ভাতিজাকে আমাদের হাতে তুলে দিন। সে আপনার ও আমাদের পিতা-পিতামহদের বিরোধিতা করছে, তাকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। এক ব্যক্তির বিনিময়ে এক ব্যক্তিই যথেষ্ট।

কুরাইশদের এ ধরনের অভিনব প্রস্তাবে আবু তালিব বললেন, তোমরা যে কথা বললে এর চেয়ে জঘন্য এবং অর্থহীন কথা আর কিছু হতে পারে কি? তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে এই উদ্দেশ্যে দিচ্ছ যে, আমি তাকে খাইয়ে-পরিয়ে লালনপালন করব। আর আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে এ উদ্দেশ্যে তুলে দেব যে, তোমরা তাকে হত্যা করবে। আল্লাহর কসম! কখনই এমনটি হতে পারে না।

এভাবে আবু তালিবের সাথে কুরাইশদের আরো কিছুক্ষণ বিতর্ক চলার পর তাদের এ আগমনটাও ব্যর্থ হয়ে গেল। আর কুরাইশদের আগমনের এ ঘটনা দুটি ঘটেছিল নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচার সাথে বারবার আলোচনা করার পর যখন কুরাইশরা বিন্দু পরিমাণ সফল হতে পারল না, তখন তারা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে ক্রমেই কঠোর থেকে কঠোর হতে থাকল। এক সময় এ দাওয়াতকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার কথা চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু এমন কঠিন মুহূর্তে কুরাইশদের শক্তির অন্যতম বড় উৎস হামযা ও উমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের সকল পরিকল্পনায় ভাটা পড়ে যায়। এতে ইসলামের শক্তি আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় মক্কার কাফির-মুশরিকরা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। যার কয়েকটি চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. একদিন উতায়বা ইবনে আবু লাহাব উত্তেজিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জামা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলল এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বদদু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! তোমার কুকুরগুলোর মধ্য থেকে এর জন্য একটি কুকুর নিযুক্ত করে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ দু'আ আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেল। যার ফলে একদিন সে কয়েকজন কুরাইশ ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলো। তারপর যখন তারা শাম দেশের জারকা নামক স্থানে তাবু স্থাপন করল, তখন রাতের বেলায় একটি বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলল।

২. একদিন আবু জাহেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য কাবা ঘরের চত্বরে একটি পাথর নিয়ে বসেছিল। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে আগমন করে সালাত আদায় করতে লাগলেন, তখন আবু জাহেল পাথরটি উঠিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে পরাস্ত সৈনিকের মতো পালাতে লাগল। এ সময় তাকে খুবই বিবর্ণ ও ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। তার এ অবস্থা দেখে লোকেরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। তখন সে বলল, আমি তাকে হত্যা করার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন আমি তার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম, তখন একটি উট আমার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। ইতিপূর্বে আমি এরকম মাথা, ঘাড় ও দাঁত বিশিষ্ট উট আর কখনো দেখিনি। মনে হলো যে, সে আমাকে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

অতঃপর এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বললেন, উটের রূপ ধারণ করে সেখানে জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়েছিলেন। আবু জাহেল যদি আমার নিকট আসত তাহলে তার উপর মহাবিপদ নেমে আসত।

হামযা (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ

সময়টি ছিল নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের জিলহজ্জ মাস। ইসলামের দাওয়াত তার নিজ গতিতেই এগিয়ে চলছিল এবং কাফিররাও তাদের বিরোধিতার চরম মুহূর্তে অবতীর্ণ হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচা হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। আর তিনি ছিলেন খুবই শক্তিশালী একজন ব্যক্তি। ঘটনাটি ছিল এই যে, একদিন আবু জাহেল সাফা পর্বতের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন সে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে নীরবে বাড়ি ফিরে যান। তারপর আবু জাহেল কাবা ঘরের কাছে এসে উক্ত কর্মের জন্য বড়াই করতে থাকে।
এদিকে ঘটনাটি এক ক্রীতদাসী সাফা পর্বত থেকে ভালোভাবে লক্ষ্য করছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচা হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব তীর-ধনুকে সজ্জিত অবস্থায় শিকার থেকে ঘরে ফিরছিলেন। তখন উক্ত দাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আবু জাহেলের ব্যবহারের কথা তাকে জানাল। এতে তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে যান। ফলে আবু জাহেলকে খোঁজ করে তাকে মসজিদুল হারামে পেয়ে যান। তারপর তাকে তীব্র ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং ধনুক দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন। এতে সে রক্তাক্ত হয়ে যায়। তারপর তিনি তাকে বললেন, তুমি তাকে গালি দিয়েছ, অথচ আমি তার দ্বীনের উপরে আছি। আমি তাই বলি যা সে বলে।
অতঃপর বিষয়টি নিয়ে আবু জাহেলের বনু মাখযুম গোত্র এবং হামযার বনু হাশেম গোত্রের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। তখন আবু জাহেল বলল, তোমরা আবু উমারাহ [হামযা (রাঃ)]-কে ছেড়ে দাও। আমি তার ভাতিজাকে নিকৃষ্ট ভাষায় গালি দিয়েছি। ফলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।[৫৩]
হামযা (রাঃ) কর্তৃক এভাবে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আকস্মিক এবং গোত্রপ্রীতির কারণে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলামপ্রীতি জোরদার করে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি দ্বীনের রশি শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আর এ ঘটনার মাধ্যমে ইসলামের শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ

হামযা (রাঃ) সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মাত্র তিনদিন অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে মুসলিমরা কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করে ফেলেছে। এমন সময় হঠাৎ আরো একটি আকস্মিক ঘটনা সকলকেই হতভম্ব করে দিল।

---

[৫৩] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/১৯১-৯২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৪৮৭৮।

ঘটনাটি মুমিনদেরকে আনন্দিত করল এবং কাফির-মুশরিকদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো আঘাত হানল। আর সেটি হচ্ছে, উমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ। ইতিপূর্বে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মর্মে দু'আ করেছিলেন যে,

اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِيْ جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

হে আল্লাহ! আবু জাহেল অথবা উমর ইবনে খাত্তাব– এ দুই ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি তোমার নিকট বেশি প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।[৫৪]

ফলে আল্লাহ তা'আলা উমর (রাঃ)-কে পছন্দ করলেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দিলেন। ঘটনাটি হচ্ছে,

উমর (রাঃ) ছিলেন উগ্রমেজাজ, রূঢ় প্রকৃতি ও বীরত্বের দিক থেকে আরব সমাজের বিখ্যাত ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের বিপজ্জনক শত্রু। একদিন তিনি কোন একটি বিষয়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য খোলা তরবারি হাতে নিয়ে রাস্তায় বের হন। পথিমধ্যে বন্ধু নাঈম বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এর সাথে দেখা হয়। তিনি ইতিপূর্বে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে উমর (রাঃ) তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতেন না। তিনি উমর (রাঃ)-কে বললেন, হে উমর! কী উদ্দেশ্যে বের হয়েছ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। তখন নাঈম (রাঃ) পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য উমর (রাঃ) এর বোন ফাতিমা (রাঃ) এবং তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিলেন। এতে উমর (রাঃ) আরো উত্তেজিত হয়ে প্রথমে নিজের বোনের বাড়ির দিকে ছুটলেন। সেখানে খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। অতঃপর উমর (রাঃ) এর আগমনের বিষয়টি বুঝতে পেরে খাব্বাব (রাঃ) সেখানেই আত্মগোপন করলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) সহীফাটি লুকিয়ে রাখলেন। তারপর উমর (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে বোন ফাতিমা (রাঃ)-কে বকা-ঝকা করতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে বোন এবং ভগ্নিপতি উভয়কে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। একসময় তাঁর বোনের গণ্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সাথে সাথে তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। এতে উমর (রাঃ) বিনম্র হলেন এবং বিব্রতবোধ করলেন। তারপর ইতিপূর্বে তারা যা পাঠ করছিল সেটি পড়তে চাইলেন। তখন ফাতিমা (রাঃ) তাকে গোসল করে আসতে বললেন। ফলে তিনি তাই করলেন। তারপর তিনি সহীফাটি হাতে নিয়ে সূরা ত্ব-হা- এর নিম্নোক্ত অংশটি পাঠ করলেন–

﴿إِنَّنِيْٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ﴾

[৫৪] তিরমিযী, হা/৩৬৮১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৬৯৬; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৪৪৮৫।

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ; আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত করো এবং আমাকেই স্মরণ করার উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করো। (সূরা ত্ব-হা- ১৪)

এ অংশটুকু পাঠ করে উমর (রাঃ) খুবই অভিভূত হলেন এবং তখনই তাকে মুহাম্মাদ ﷺ এর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। উমর (রাঃ) এর এ কথা শুনে খাব্বাব (রাঃ) লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে এসে উমর (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দু'আ করার বিষয়টির সুসংবাদ দিলেন।

সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতের নিকটস্থ গোপন ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন। ফলে তারা উমর (রাঃ)-কে সেখানেই নিয়ে গেলেন। তখন সেখানে হামযা (রাঃ) সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আগমনের কারণে সাধারণ মুসলিমরা প্রাথমিকভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেও হামযা (রাঃ) এর উপস্থিতির কারণে কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন যে, হে সর্বশক্তিমান প্রভু! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এই উমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।[৫৫]

এতে উমর (রাঃ) খুবই প্রভাবান্বিত হলেন এবং সাথে সাথেই শাহাদাত বাক্য পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে সালাত আদায়

এতদিন পর্যন্ত মুসলিমরা কেবল গোপনেই সালাত আদায় করে যাচ্ছিলেন। প্রকাশ্যে সালাত আদায় করার মতো সাহস ছিল না। অতঃপর যখন উমর (রাঃ) মুসলিম হয়ে গেলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই– যদিও আমরা জীবিত থাকি অথবা মারা যাই? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অবশ্যই! সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি জীবিত থাক কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তবুও তোমরা সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছ।

এ কথা শুনে উমর (রাঃ) সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাহলে গোপনীয়তার কী প্রয়োজন? সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে বের হব। ফলে মুসলিমরা দুটি সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উভয় সারির মধ্যে নিয়ে বাইরে বের হলেন। এক সারির সামনে ছিলেন হামযা (রাঃ) এবং অন্য সারির সামনে ছিলেন উমর (রাঃ)। তারা সকলেই দল বেধে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। তারপর তারা সেখানে সালাত আদায় করলেন। আর এটিই ছিল ইসলামের প্রথম প্রকাশ্যে সালাত আদায়।

---

[৫৫] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৪৪৮৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৬৯৬; তিরমিযী, হা/৩৬৮১।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট কুরাইশদের প্রতিনিধি প্রেরণ

হামযা (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর মতো প্রতাপশালী দুজন বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসলিমদের উপর মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। যার কারণে মুশরিকদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। তবে এর পরিবর্তে তারা বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করার প্রতি মনোযোগী হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আবুল ওয়ালীদ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে একটি লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করল। যাতে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতের কাজ থেকে সরে আসেন। সে বলল, হে ভাতিজা! তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ এবং মানুষকে যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছ তার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, এর মাধ্যমে তুমি কিছু ধনসম্পদ অর্জন করতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে এত বেশি ধনসম্পদ একত্রিত করে দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনসম্পদের মালিক হয়ে যাবে কিংবা যদি তুমি এটা চাও যে, মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমার কাম্য, তাহলে আমাদের নেতৃত্ব তোমার হাতে সমর্পণ করে দেব এবং তোমাকে ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান কিংবা মীমাংসা আমরা করব না। যদি এমনও হয় যে, তুমি রাজা-বাদশাহ হতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত করে দেব। তাছাড়া তোমার নিকট যে আগমন করে সে যদি জিন কিংবা ভূতপ্রেত হয়– যাকে তুমি দেখছ অথচ নিজে নিজে তার কুপ্রভাব প্রতিহত করতে পারছ না, তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেব এবং তোমার পূর্ণ সুস্থতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন আমরা তা করতে প্রস্তুত থাকব। কেননা কখনো কখনো এমনও হয় যে, জিন-ভূতেরা মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে এবং এজন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ কথাগুলো শোনার পর তাকে সূরা ফুসসিলাতের প্রথম আয়াত থেকে সিজদার আয়াত পর্যন্ত বা ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। তারপর আর কিছু না বলেই তাকে বিদায় দিয়ে দিলেন।

এ বাণীগুলো শোনার পর সে খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। ফলে সে মুশরিকদের নিকট ফিরে গিয়ে নিজের আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কথা ব্যক্ত করে বলল, আমি এমন বাণী শুনে এসেছি যে, এগুলো কোনদিনই শুনিনি। আল্লাহর শপথ! সেগুলো কবিতা নয় এবং যাদুও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমার কথা মেনে নিয়ে ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও। আমার মত এই যে, ঐ ব্যক্তিকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। সে পৃথক হয়ে থাক।

আল্লাহর কসম! আমি তার মুখ থেকে যে বাণী শুনে এলাম তার দ্বারা অতি শীঘ্রই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি তাকে কোন আরবি ব্যক্তি হত্যা করে ফেলে, তাহলে তো তোমাদের কর্মটা অন্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি আরবিদের উপর বিজয়ী হয়ে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়, তাহলে তার রাজত্ব পরিচালনা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রাজত্ব হিসেবে গণ্য হবে। এর অস্তিত্ব বা টিকে থাকা সবচেয়ে বেশি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

কিন্তু লোকেরা আবুল ওয়ালীদের মুখে এসব কথা শুনে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তাকেও একজন যাদুগ্রস্ত মনে করল।

মুশরিক কর্তৃক মুসলিমদেরকে পূর্ণাঙ্গ বয়কট

তাদের এসব একের পর এক ব্যর্থ মিশন খুব দ্রুতই সংঘটিত হচ্ছিল। ফলে তারা বারবার হোঁচট খেয়ে দিশেহারা হচ্ছিল। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, যদি তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করে তাহলে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে তারা একদিন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মুহাসসাব নামক উপত্যকায় খাইফে বনু কেনানা এর ভেতরে একত্রিত হলো। সেখানে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে,

১. বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিবের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ও কুশল বিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে।

২. কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদেরকে কন্যা দান করতে পারবে না।

৩. তাদের সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, মেলা-মেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোন কিছুই করা যাবে না।

৪. যতদিন পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের হাতে তুলে না দেবে ততদিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

এ বয়কটের দলীলস্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদিত হয় এবং এটি কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, যার ফলে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের সকল মুসলিম ও অমুসলিম সদস্য আতঙ্কিত হয়ে শিয়াবে আবু তালিব গিরিপর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন– কেবল আবু লাহাব ব্যতীত। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল নবুওয়াতের ৭ম বছরের মুহাররম মাসের শুরুতে।

শিয়াবে আবু তালিবের অবস্থা

কাফির-মুশরিকদের এ ধরনের বয়কটের কারণে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের লোকদের জীবনযাপন করা খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাদের জন্য

খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমনকি পানি সরবরাহ পর্যন্তও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের অবস্থা এমন হলো যে, তাদেরকে গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে হতো। যার ফলে তাদের পায়খানা ছাগলের পায়খানার মতো হয়ে গিয়েছিল। আবার যদি তারা কখনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য বাইরে বের হতো, তখন তাদের থেকে এত বেশি দাম হাঁকানো হতো যে, সেগুলো তাদের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব ছিল না।

এদিকে আবু তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। ফলে সকলেই যখন নিজ নিজ বিছানায় শয়ন করতেন, তখন আবু তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে নিজের বিছানায় শয়ন করিয়ে দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিছানায় অন্য কাউকে শয়ন করাতেন।

এরূপ অবরুদ্ধ অবস্থাতেও যখন হজ্জের সময় আসত, তখন মুসলিমগণ শিয়াবে আবু তালিব থেকে বের হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগত লোকদেরকে দাওয়াত দিতেন। শিয়াবে আবু তালিবের এ অবস্থাটি তিন বৎসর স্থায়ী ছিল।

আবু তালিবের মৃত্যু

মুশরিকদের বয়কটের কারণে আবু তালিব পূর্বের তুলনায় খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি এ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। উপরন্তু বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির কারণে তার সে অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি এক সময় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তখন ছিল নবুওয়াতের ১০ম বৎসরের রজব মাস।

যখন চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট যান এবং সেখানে আবু জাহেলও গমন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চাচা! আপনি কেবল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্যটি উচ্চারণ করুন, যাতে আমি সেটা বিচারের দিন আল্লাহর কাছে পেশ করতে পারি। তখন আবু জাহেল ও আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়ে যাবেন? এভাবে উভয় পক্ষের বাদানুবাদ চলতেই থাকল। অবশেষে আবু তালিব নিজের পিতৃপুরুষদের ধর্মের উপরই মৃত্যুবরণ করেন।

খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যু

খাদীজা (রাঃ) আবু তালিবের মৃত্যুর ঠিক দুই মাস পর নবুওয়াতের ১০ম বছরের রমাযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন পর্যন্ত অন্য কাউকে বিবাহ করেননি। অথচ তখন তার বয়স ছিল ৫০ বছর।

খাদীজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামতস্বরূপ ছিলেন। তিনি সবসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলেন। ইসলামের প্রয়োজনে তিনি সকল সম্পত্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। যখন সকল মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরোধিতা করে আসছিল, তখন তিনি ছায়ার মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্ন কথাবার্তার মাধ্যমে সান্ত্বনা প্রদান করে সাহস যোগাতেন। তার এ মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন।

দুঃখের বছর

একই বছর প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিব এবং সহধর্মিণী খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানসিকভাবে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হন। কেননা এতদিন বহিরাগত যত শত্রুতাই থাকুক না কেন, তাদের দুজনের কাছ থেকে শক্তি-সাহস পেতেন। কিন্তু তাদের মৃত্যুতে শক্তি-সাহস যোগানোর মতো এখন আর কেউ রইল না। উপরন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করল তখন মুশরিকদের মধ্যে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে আর কোন বাধা অবশিষ্ট থাকল না। ফলে তাদের পক্ষ থেকে নেমে আসতে থাকল অবিরাম ধারায় নির্যাতন। মুশরিকদের পক্ষ থেকে আগত নির্যাতনের ধারা এতই বেশি ছিল যে, ইতিপূর্বের সকল মাত্রা অতিক্রম করে ফেলল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবন আরো দুর্বিসহ ও বিষাদময় হয়ে উঠল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছরের নাম দেন– আমুল হুযন অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের বছর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাওদা (রাঃ) এর বিবাহ

খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম সাওদা বিনতে যাময়াহ (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। তখন ছিল নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাস। ইতিপূর্বে সাওদা (রাঃ) সাকারীন বিন আমর (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তারা উভয়েই প্রাথমিক যুগের মুসলিম ছিলেন এবং হাবশায় হিজরত করেছিলেন। অতঃপর হাবশায় থাকা অবস্থাতেই স্বামী সাকারীন বিন আমর (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। তারপর সাওদা (রাঃ) মক্কায় ফিরে এসে ইদ্দত পালন শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

তায়েফ গমন

নবুওয়াতের ১০ম বছর শাওয়াল মাস অর্থাৎ ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মুশরিকদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দাওয়াত প্রদানের জন্য তায়েফ গমন করেন। তায়েফ মক্কা থেকে আনুমানিক ৬০ মাইল দূরত্বে

অবস্থিত। এ দীর্ঘ পথ তিনি পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করেছিলেন। সাথে ছিলেন মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারিস (রাঃ)। পথিমধ্যে যে গোত্রের মধ্যেই উপস্থিত হতেন তাদের কাছেই ইসলামের দাওয়াত প্রদান করতেন। কিন্তু এতে কেউ সাড়া দিত না।

সে সময় তায়েফে সাকীফ গোত্র বসবাস করত। সে গোত্রের তিন নেতা যথাক্রমে আবদে ইয়ালাইল, মাসউদ ও হাবীব তাদের নেতৃত্ব প্রদান করত। এরা তিনজনই ছিল সহোদর ভাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আল্লাহর আনুগত্য করার এবং ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাওয়াত প্রদান করলেন। তখন তারা সবাই ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করেছিল। একজন বলেছিল, তুমি যদি আল্লাহর রাসূল হয়ে থাক, তাহলে কাবা ঘরের পর্দা ফেঁড়ে দেখাও। দ্বিতীয়জন বলেছিল, নবী পাঠানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাননি? আর তৃতীয়জন বলেছিল, তোমার সাথে আমি কোন ক্রমেই কথা বলব না। কেননা তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাক, তাহলে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমাদের জন্য বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যাচার করে থাক, তাহলে তোমার সাথে আমাদের কথা বলা উচিত নয়।

তাদের এ ধরনের কথাবার্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং ফিরে আসার সময় তাদেরকে এসব আলোচনা গোপন রাখতে বললেন।

কিন্তু তারা বিষয়গুলো গোপন না রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরো অপমানের সাথে তাড়িয়ে দিল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসার সময় শিশু-কিশোর ও যুবকদের দ্বারা উত্যক্ত ও অপমানের শিকার হয়েছিলেন। এ সময় তারা তাঁকে নানা ধরনের অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করেছিল এবং পাথর ছুড়ে মেরেছিল। আর যায়েদ বিন হারিস (রাঃ) তাকে যথাসম্ভব আড়াল করে রেখেছিলেন। এরপরও আঘাতের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পায়ের জুতা পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বাগানটি ছিল রাবিয়ার পুত্র উতবা ও শায়বার। এটি ছিল তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগানে প্রবেশ করলে দুরাচার তায়েফবাসীরা নিজ নিজ ঘরের দিকে ফিরে যায়।

জিবরাঈল (আঃ) এর প্রস্তাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তায়েফবাসীদের দ্বারা অপমানের শিকার হয়ে উক্ত বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে বললেন, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি

পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাকে আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন। আপনি তাদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! কথা একটাই, আপনি যদি চান এদেরকে আমি দুই পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি, তাহলে তাই হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না– বরং আমার আশা এই যে, আল্লাহ তা'আলা এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তাঁর ইবাদাত করবে এবং অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না।[৫৬]

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এত নির্যাতন ও অপমানের পরও তাদের প্রতি চরম সহমর্মিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিবাহ

সাওদা (রাঃ) এর বিবাহের ঠিক এক বছরের মাথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান বিন মাযউন (রাঃ) এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) এর প্রস্তাবে আবু বকর (রাঃ) এর কন্যা আয়েশা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৫৭] এ সময় আয়েশা (রাঃ) নাবালিকা ছিলেন। অতঃপর তিন বছর অতিক্রান্ত হলে যখন তিনি সাবালিকা হন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঘরে গমন করেন। সে সময় তার বয়স হয়েছিল নয় বছর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন, তখন ছিল নবুওয়াতের ১১তম বর্ষ। আর যখন তিনি তাঁকে ঘরে নেন তখন ছিল হিজরীর প্রথম বর্ষ শাওয়াল মাস।[৫৮]

জিনদের ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফ থেকে ফেরার পথে ওয়াদীয়ে নাখলা নামক স্থানে অবতরণ করলেন এবং সেখানেই রাত অতিবাহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কয়েক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

সেখানে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিনের মতো এক রাতে সালাত আদায় করার সময় কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় একদল জিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেয়ে থেমে যায় এবং মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করে। অতঃপর তারা নিজ জাতির কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে বর্ণনা করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে তখনো কোন কিছু অবগত ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

---

[৫৬] সহীহ বুখারী, হা/৩২৩১; সহীহ মুসলিম, হা/১৭৯৫; মিশকাত, হা/৫৮৪৮।

[৫৭] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৮১০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/২৭০৪।

[৫৮] সহীহ বুখারী, হা/৩৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হা/১৪২২।

আয়াত নাযিল করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবকিছু জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْاۤ اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ - قَالُوْا يَا قَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ - يَا قَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَاۤءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ﴾

যখন আমি একদল জিনকে তোমার দিকে নিয়ে এসেছিলাম, যাতে তারা কুরআন শুনে। যখন তারা ঐ জায়গায় পৌঁছল (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে) তখন একে অপরকে বলছিল, তোমরা চুপ থাকো। তারপর যখন কুরআন পড়া শেষ হয়ে গেল, তখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারী হয়ে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনলাম, যা মূসা (আঃ) এর পরে নাযিল করা হয়েছে, যা এর আগের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করে এবং সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়। হে আমাদের সম্প্রদায়! যে আল্লাহর দিকে ডাকে তাঁর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবেন। আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না তার জন্য দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই, যে আল্লাহকে পরাজিত করতে পারে। আর তার এমন কোন সহায়কও নেই (যে তাকে আল্লাহর থেকে বাঁচাতে পারে)। এসব লোক স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছে। (সূরা আহকাফ, ২৯-৩২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিরাজ

মিরাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে উর্ধ্বগমন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দাওয়াতী কাজ সাহসীকতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর আত্মবিশ্বাসকে আরো বেশি করে বৃদ্ধি করার জন্য তাঁকে সাত আসমানের উপর একেবারে নিজের কাছে ডেকে নেন। অতঃপর সেখান থেকে ফেরত পাঠানোর সময় তাঁর উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত উপহার হিসেবে দান করেন। এ ঘটনাটি ঠিক কবে সংঘটিত হয়েছিল এ ব্যাপারে কোন সঠিক মতামত পাওয়া যায় না। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর তথা নবুওয়াতের ১০ম বছরে হিজরতের প্রায় কাছাকাছি সময়ের মধ্যে।

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার জন্য বুরাক পাঠানো হলো। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। দৃষ্টি যতদূর যায় এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি এতে আরোহণ করলাম এবং বাইতুল মাকদাস এসে পৌছলাম। তারপর অন্যান্য নবীগণ তাদের বাহনগুলো যে খুঁটির সাথে বাঁধতেন, আমি সে খুঁটির সাথে আমার বাহনটিও বাঁধলাম। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম ও দু'রাক'আত সালাত আদায় করে বের হলাম। জিবরাঈল (আঃ) একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, আপনি ফিতরাতকেই গ্রহণ করলেন।

তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে গেলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌছে দ্বার খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি আদম (আঃ) এর দেখা পাই। তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে চললেন এবং দ্বিতীয় আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি ঈসা ইবনে মারইয়াম ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ) এর দেখা পেলাম। তারা আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন।

তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে চললেন এবং তৃতীয় আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। আমি সেখানে ইউসুফ (আঃ) এর দেখা পেলাম। তাঁকে সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক দেয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল।

জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। আমি সেখানে ইদরীস (আঃ) এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায় (সূরা হাদীদ- ১৯)।
তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে হারূন (আঃ) এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।
তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। সেখানে মূসা (আঃ) এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।
তারপর জিবরাঈল (আঃ) সপ্তম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ! পাঠানো হয়েছিল। তারপর আমাদের জন্য দ্বার খুলে দেয়া হলো। আমি সেখানে ইবরাহীম (আঃ) এর দেখা পেলাম।
সেখানে আছে বাইতুল মা'মূর। বাইতুল মা'মূরে প্রত্যেকদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন এবং যারা একবার আসেন তারা সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না।
তারপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায়[৫৯] নিয়ে গেলেন। সে বৃক্ষের পাতাগুলো হাতির কানের ন্যায়; আর ফলগুলো বড় বড় মটকার মতো। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যে ওহী করার তা করলেন।

[৫৯] "সিদরাতুল মুনতাহা" হচ্ছে সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। সেখানে একটি বরই গাছ রয়েছে। আর এটিই হচ্ছে ফেরেশতাদের বিচরণের শেষ সীমা। এর উপরে ফেরেশতারা গমন করতে পারে না।

তিনি আমার উপর দিনরাত মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করলেন। এরপর আমি যখন মূসা (আঃ) এর কাছে ফিরে আসলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কী নির্দেশ দিয়েছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং একে আরো সহজ করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এ নির্দেশ পালনে সক্ষম হবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তখন আমি আবার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার রব! আমার উম্মতের জন্য এ হুকুম সহজ করে দিন। তখন পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। তারপর মূসা (আঃ) এর নিকট ফিরে এসে বললাম, আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমানো হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এও পারবে না। আপনি ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে আমি একবার মূসা (আঃ) ও একবার আল্লাহর কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। শেষে আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! যাও দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করা হলো। প্রতি ওয়াক্ত সালাতে দশ ওয়াক্ত সালাতের সমান সওয়াব রয়েছে। এভাবে (পাঁচ ওয়াক্ত হলো) পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান। (আল্লাহ তা'আলা আরো বললেন,) যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের নিয়ত করল এবং তা কাজে পরিণত করতে পারল না, আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখব; আর তা কাজে পরিণত করলে তার জন্য দশটি সওয়াব লিখব। পক্ষান্তরে যে কোন মন্দ কাজের নিয়ত করল অথচ তা কাজে পরিণত করল না, তার জন্য কোন গুনাহ লিখা হয় না। আর তা কাজে পরিণত করলে তার উপর একটি মাত্র গুনাহ লিখা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর আমি মূসা (আঃ) এর নিকট নেমে এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং আরো সহজ করার প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ বিষয়টি নিয়ে বারবার আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আসা-যাওয়া করেছি, এখন আবার যেতে লজ্জা হচ্ছে।[৬০]

অন্য বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় জান্নাত ও জাহান্নামকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন– এমনকি তিনি কিছু কিছু জাহান্নামীর শাস্তিও প্রত্যক্ষ করেন।

এ ঘটনাটি ছিল একটি বড় পরীক্ষা। কারণ প্রকৃত ঈমানদার ব্যতীত এটা মেনে নেয়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে যে রাতে এ ঘটনাটি ঘটেছিল সেদিন সকালে তিনি যখন মানুষের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করলেন,

[৬০] সহীহ মুসলিম, হা/১৬২; সহীহ বুখারী, হা/৩৮৮৭।

তখন কাফিররা তো বিশ্বাস করলই না; বরং অনেক মুসলিমও বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে বিব্রতবোধ করছিলেন। তবে একমাত্র আবু বকর (রাঃ) এসব কথা শোনামাত্রই সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সিদ্দীক তথা সত্যবাদী উপাধীতে ভূষিত করেন।[৬১]

তাছাড়া এ ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নানা ধরনের প্রশ্ন করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও মুশরিকরা কোনভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

মিরাজ স্বশরীরে হয়েছিল না স্বপ্নযোগে হয়েছিল :

মিরাজ স্বশরীরে হয়েছিল না স্বপ্নযোগে হয়েছিল এটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, স্বপ্নযোগে হয়েছিল। এটা অত্যন্ত দুর্বল কথা। পূর্ব ও পরের অধিকাংশ উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের অভিমত হলো প্রিয়নবী ﷺ এর জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। এর বিপরীত অন্য ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই।

আকাবার প্রথম শপথ

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে নিয়মিত দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছিলেন এবং লোকশ্রুতিতেও তাঁর নবুওয়াতের কথা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সেই সুবাদে মক্কার বাহিরেও কিছু কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। সেসব সৌভাগ্যবান লোকদের মধ্যে অন্যতম হলেন সুয়াইদ বিন সামিত (রাঃ), ইয়াস বিন মুয়ায (রাঃ), আবু যর গিফারী (রাঃ), তোফায়েল বিন আমর দাওসী (রাঃ), যিমাদ আযদী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী। বিশেষ করে নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিব তথা মদিনা থেকে ৬ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যারা সকলেই ছিলেন মদিনার জ্ঞানী ব্যক্তি। তারা হলেন–

১। আসয়াদ বিন যুরারাহ (রাঃ)
২। আউন বিন হারিস বিন রিফাআহ (রাঃ)
৩। রাফে বিন মালিক বিন আজলান (রাঃ)
৪। কুতবা বিন আমের বিন হাদীদাহ (রাঃ)
৫। উকবা বিন আমের বিন নাবী (রাঃ) এবং
৬। হারিস বিন আবদুল্লাহ বিন রিআব (রাঃ)।

এসব ব্যক্তিবর্গ যখন হজ্জব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ

---

[৬১] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৪৪০৭; সিলসিলা সহীহাহ, হা/৩০৬।

করেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। এদিকে তারা মদিনার ইয়াহুদিদের কাছ থেকে ইতিপূর্বেই জানতে পেরেছিল যে, অতি শীঘ্রই একজন নবীর আগমন ঘটবে এবং তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। আর তারা তাদেরকে এ বলেও হুমকি দিত যে, তারা সেই নবীর সাথে যুক্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিজের নবুওয়াতের কথা এবং তাওহীদের কথা তাদের সামনে উপস্থাপন করেন, তখন তারা নিশ্চিত হলো যে, ইনিই হলেন সেই নবী, যার ব্যাপারে ইয়াহুদিরা তাদেরকে হুমকি দিত। ফলে তারা সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে বাই'আত প্রদান করেন।

এটি ছিল কেবল ইসলাম গ্রহণের উপর সাধারণ বাই'আত। যেহেতু এ বাই'আতটি মিনার নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে করা হয়েছিল, তাই একে বাই'আতে আকাবা তথা আকাবার বাই'আত বলা হয়। আর এটিই ছিল আকাবার প্রথম বাই'আত। এতে কোন শর্ত বা কোন বিশেষ নির্দেশনা ছিল না। যার কারণে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ এটিকে বাই'আত হিসেবে গণনা করেননি।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

আকাবার প্রথম শপথের মাধ্যমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা সকলেই ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে ইয়াসরিববাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। ফলে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরবর্তী বর্ষে হজ্জের মৌসুমে তথা নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষের জিলহজ্জ মোতাবেক ৬২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ১২ জন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন নতুন ইসলাম গ্রহণকারী। তারা হলেন–

১। মুয়ায ইবনে হারেস বিন রিফা'আহ (রাঃ)
২। যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়েস (রাঃ)
৩। উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)
৪। ইয়াযীদ ইবনে সালাবাহ (রাঃ)
৫। আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাযালাহ (রাঃ)
৬। আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান (রাঃ)
৭। ওয়ায়েম ইবনে সাঈদাহ (রাঃ)

আর বাকিরা ছিলেন প্রথম বাই'আতে অংশগ্রহণকারী। প্রথম বাই'আতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেবল জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) অনুপস্থিত ছিলেন।

এরা গভীর রাতে পূর্ব নির্ধারিত আকাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থেকে দ্বীনের ব্যাপারে

কয়েকটি কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এসব অঙ্গীকারনামার বিষয়সমূহ পরবর্তীতে হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র এবং মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের নিকট থেকে গৃহীত অঙ্গীকারনামারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেগুলো হলো–

১. আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না।
২. চুরি করবে না।
৩. যিনা করবে না।
৪. নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না।
৫. কাউকে মনগড়া অপবাদ দেবে না।
৬. ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে আমার অবাধ্যতা করবে না।

যারা এসব কথা মান্য করবে এবং পূর্ণ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোন একটি করে বসে এবং তার শাস্তি এখানেই প্রদান করা হয়, তাহলে সেটা তার মুক্তি লাভের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এসবের মধ্যে কোন কিছু করে বসে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন, তাহলে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। সুতরাং তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।[৬২]

ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনাটিই আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত হিসেবে পরিচিত। এর ফলে ইসলামের অনেক উপকার সাধিত হয়। এসব অঙ্গীকার নিয়ে যখন তারা সকলেই নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে একটি ধর্ম প্রচারকের দলও প্রেরণ করেন। যাতে করে তারা তাদেরকে ইসলামের বিষয়গুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারেন এবং যাবতীয় হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। আর এটিই ছিল ইয়াসরিব তথা মদিনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রথম ধর্ম প্রচারক দল। এদের নেতা ছিলেন, মুসআব বিন উমায়ের আবদারী (রাঃ)।

আকাবার তৃতীয় শপথ

মুসয়াব (রাঃ) মদিনায় গিয়ে আসয়াদ বিন যুররা (রাঃ) এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে থাকেন। এতে তিনি এত সফলতা পান যে, যার কারণে তিনি মুকরিউন তথা পাঠদানকারী উপাধিতে ভূষিত হন। এসব দাওয়াতের ফলে সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) তাঁর গোত্রসহ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি পরবর্তী হজ্জের মৌসুম পর্যন্ত মদিনায় কেবলমাত্র বনু উমাইয়া বিন যায়েদ, খাতমা ও ওয়ায়েলের বাড়ি ছাড়া এমন কোন বাড়ি ছিল না, যাদের পুরুষ ও মহিলাদের কিছু সংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করেনি।

---

[৬২] সহীহ বুখারী, হা/১৮; সহীহ মুসলিম, হা/১৭০৯।

অতঃপর মুসয়াব (রাঃ) নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষের হজ্জের মৌসুমে এসব অভাবনীয় সফলতার সুসংবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আগমন করেন এবং সাথে করে বাই'আত প্রদানের জন্য বিশাল একটি দলও নিয়ে আসেন। সুতরাং পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা আইয়ামে তাশরীকের মধ্য রাতে তথা জিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে জামরায়ে উলা অর্থাৎ জামরায়ে আকাবার নিকটবর্তী একটি সুরঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে খুব গোপনে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করেন। বাই'আতের বিষয়বস্তু এরূপ ছিল যে,

১. সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আমার (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর) কথা শুনতে হবে এবং মেনে নিতে হবে।
২. অভাব ও সচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করতে হবে।
৩. ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।
৪. আল্লাহর পথে দণ্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর পরোয়া করবে না।
৫. যখন আমি তোমাদের কাছে হিজরত করে যাব, তখন যেমনভাবে স্বীয় জান-মাল ও সন্তানদের হেফাযত করো সেভাবেই আমার হেফাযত করবে। এগুলো পালন করলে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।[৬৩]

এ অঙ্গীকার নেয়ার সময় মদিনাবাসীদের মধ্য থেকে সর্বমোট ৭৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে দুজন ছিলেন মহিলা। তারা হলেন, উম্মে আম্মারা নাসীরা বিনতে কা'ব (রাঃ) এবং উম্মে মানী আসমা বিনতে আমর (রাঃ)। ইসলামের ইতিহাসে এ অঙ্গীকারটিই আকাবার তৃতীয় শপথ বা আকাবার বড় শপথ নামে পরিচিত। এর ফলে ইসলামের গতিধারায় এক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং মদিনা ও মদিনার আশেপাশে ক্রমেই ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছিল।

শয়তান কর্তৃক বাই'আতের কথা ফাঁস

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে তাদের বাই'আত প্রদানের পর্ব যখন প্রায় শেষ প্রান্তে, তখন একটি শয়তান বিষয়টি জেনে যায়। ফলে সে এ খবরটি মুশরিকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে সুড়ঙ্গের পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে থাকে যে, হে তাবুওয়ালারা! মুহাম্মাদকে দেখো, বেদ্বীনরা এখন তার সাথে রয়েছে। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার

[৬৩] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৪৯৬; সিলসিলা সহীহাহ, হা/৬৩।

জন্য একত্রিত হয়েছে। তখন কাব বিন মালেক (রাঃ) বললেন, এরূপ দূরবর্তী আওয়াজ ইতিপূর্বে আমরা কখনো শুনিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা হচ্ছে সুড়ঙ্গের শয়তান। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! অচিরেই আমি তোর জন্য বেরিয়ে পড়ব। এ কথা শুনে আব্বাস বিন উবাদাহ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি চাইলে আগামীকালই আমরা মিনাবাসীদের উপর তরবারি নিয়ে হামলা চালাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সে জন্য আদিষ্ট হইনি। তোমরা স্ব স্ব তাবুতে ফিরে যাও। ফলে তারা সকলেই নিজ নিজ তাবুতে ফিরে গেলেন।[৬৪]

কুরাইশদের ক্ষোভ

শয়তান কর্তৃক বাই'আতের কথা ফাঁস হওয়ার বিষয়টি কুরাইশদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা খুবই চিন্তিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা পরের দিন সকালে রাগান্বিত হয়ে মদিনাবাসীদের কাছে গমন করে তাদেরকে ধমকাতে থাকে। কিন্তু এসময় তারা যে কোনভাবেই হোক এটা বুঝাতে সচেষ্ট হয় যে, আসলে ওখানে কিছুই হয়নি এবং সে ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। ফলে এ পর্যায়ে কুরাইশরা শান্ত হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসে। কিন্তু তারা এ বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখে। অতঃপর যখন তারা নিশ্চিত হয় যে, আসলেই কিছু হয়েছিল, তখন তারা আবার মদিনাবাসীদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মদিনাবাসীরা মক্কা ছেড়ে মদিনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। ফলে কুরাইশরা আর তাদের নাগাল পেল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-কে তারা ধরে ফেলেছিল। তারপর তারা মদিনার মধ্য দিয়ে নিজেদের বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের কথা চিন্তা করে তাকে ছেড়ে দেয়।

এরপর থেকে কুরাইশরা মক্কায় অবস্থিত মুসলিমদের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে দেয়। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, মুসলিমদের পক্ষে মক্কায় বসবাস করা আর সম্ভব হচ্ছিল না।

মুসলিমদের হিজরত

দ্বিতীয় বাই'আতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের জন্য মদিনাকে হিজরতের ভূমি হিসেবে নিশ্চিত করেন। ফলে এর কিছু দিন পর থেকেই মুসলিমরা একে একে আল্লাহর অনুমতিক্রমে নিজেদের ধনসম্পদ, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে হিজরত করে মদিনায় চলে যেতে

[৬৪] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৮৩৬।

থাকেন। সর্বপ্রথম যিনি মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করার জন্য যাত্রা করেছিলেন তিনি ছিলেন আবু সালামা (রাঃ)। তারপর উমর (রাঃ) সহ আরো অনেকেই।[৬৫] আবার মাঝে মধ্যে হিজরত করার ব্যাপারে কুরাইশদের পক্ষ থেকে বাধা আসতে থাকে। এদিকে আবু বকর (রাঃ)-ও হিজরত করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। বাকি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতি। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করো। কেননা আমি আশা করছি যে, আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। আপনার জন্যও কি হিজরতের অনুমতি আশা করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এরপর আবু বকর (রাঃ) মক্কাতেই থেকে গেলেন, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সফর সঙ্গী হতে পারেন। এজন্য তিনি দুটি উটনীকে ভালোভাবে বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন এবং হিজরতের জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন।

দারুন নদওয়ায় কুরাইশদের বৈঠক

মুসলিমরা যখন এক এক করে হিজরত করতে লাগলেন, তখন মক্কা নগরী ধীরে ধীরে খালি হতে লাগল। এদিকে মুসলিমরা মদিনায় আশ্রয় নেয়ায় বিষয়টি কুরাইশদেরকে আরো চিন্তিত করে তুলেছিল। কেননা কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সবেচেয়ে বড় কেন্দ্র 'সিরিয়া' যেতে হতো মদিনাকে অতিক্রম করেই। এসব চিন্তা করে কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের ২৬ শে সফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম ভাগে তাদের সভাকেন্দ্র দারুন নদওয়াতে একত্রিত হয় এবং এতে কুরাইশ গোত্রের সকল নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। অতঃপর যখন তারা আলোচনা শুরু করে, তখন ইবলিসও ছদ্মবেশে তাদের সাথে যোগ দেয়।

উক্ত সভায় অনেক শলা-পরামর্শের পর সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করা হবে এবং এ হত্যাকাণ্ডে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সুঠামদেহী ও শক্তিশালী যুবক অংশ গ্রহণ করবে। ফলে এর দায় সবার উপর বর্তাবে। আর এটাই সবচেয়ে নিরাপদ। কেননা এমনটি হলে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের পক্ষে সবার সাথে লড়াই করা সম্ভব হবে না।

[৬৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৯২৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হিজরত

যখন দারুন নদওয়ায় বসে কুরাইশরা এ ধরনের ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আগমন করেন। তারপর তিনি তাঁকে সবকিছু জানিয়ে দেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করার জন্য অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই আবু বকর (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়িতে যান। অতঃপর তিনি তার সাথে সবকিছু আলোচনা করে ঐ রাতেই হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কুরাইশ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রাঃ) এর বাড়ি থেকে ফিরে এসে হিজরতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। আর অপরদিকে কুরাইশরা তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ১১ জন যুবককে নির্বাচিত করে রাখে। তারা হলো– আবু জাহেল ইবনে হিশাম, হাকাম ইবনে আস, উকবা ইবনে আবু মু'আইত, নাযার ইবনে হারিস, উমাইয়া ইবনে খালফ, যাময়াহ ইবনে আসওয়াদ, তোয়াইমা ইবনে আদী, আবু লাহাব, উবাই ইবনে খালফ, নুবাইহ ইবনে হাজ্জাজ এবং তার ভাই মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ।

কর্মসূচী অনুযায়ী তাদের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়বেন তখন তারা সবাই একযোগে আক্রমণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করে ফেলবে।

হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহত্যাগ

যাই হোক, ঐ রাত্রে কুরাইশরা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ)-কে তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে বললেন। ফলে তিনি একটি চাদর গায়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ شَاهَتِ الْوُجُوْهُ। তথা "চেহারাসমূহ ধূলি মলিন হোক" এ বাক্যটি পাঠ করে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন।[৬৬]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিছুক্ষণের জন্য কুরাইশদেরকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেললেন, যার ফলে তারা কিছুই দেখতে পায়নি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ

---

[৬৬] মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৫৮৩; সিলসিলা সহীহাহ, হা/২৮২৪।

ফাঁকে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ফলে তারা পূর্বের অবস্থাতেই থেকে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।
দিনটি ছিল নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের ২৭শে সফর মোতাবেক ১০ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দ।

সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা আবু বকর (রাঃ) এর কাছে গেলেন। আবু বকর (রাঃ) আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। তারপর তাঁরা দুজন বাড়ির পেছনের একটি জানালা দিয়ে বের হয়ে যান। তারপর তাঁরা মদিনার ঠিক বিপরীত দিক তথা দক্ষিণ দিক দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। যাতে করে কুরাইশরা সহজে তাঁদেরকে ধরতে না পারে। আর সে সময় তাঁরা খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন, যাতে তাঁরা রাত শেষ হওয়ার পূর্বেই কুরাইশদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারেন। অবশেষে তাঁরা সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কুরাইশদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

এদিকে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বিছানায় না পেয়ে চরম উত্তেজিত হয়ে গেল। তারপর তারা আবু বকর (রাঃ) এর বাড়িতে গেল। কিন্তু তারা সেখানে তাকেও না পেয়ে বুঝতে পারল যে, তাঁরা উভয়েই হিজরত করার জন্য বের হয়ে গেছেন। ফলে তারা মক্কা এবং মক্কার আশেপাশের এলাকাগুলোতে পাগলের মতো খুঁজতে শুরু করল। এক পর্যায়ে কুরাইশরা সওর পর্বতের সেই গুহায় এসে পড়ল এবং তাঁদেরকে প্রায় দেখে ফেলেছিল। তখন আবু বকর (রাঃ) ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, হে আবু বকর! তুমি ভয় করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[৬৭] তারপর তাঁরা আল্লাহর উপর ভরসা করে নীরবে বসে রইলেন। এদিকে মুশরিকরা কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল; কিন্তু তবুও তাঁদের অবস্থানের বিষয়টি জানতে পারল না। আর এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য।

গুহা থেকে মদিনার পথে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ) এ অবস্থায় তিন দিন কাটিয়ে দিলেন। এদিকে কুরাইশদের খোঁজাখুঁজিও কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেল। হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার দিন আবু বকর (রাঃ) তার প্রস্তুতকৃত উট দুটি কিছু

[৬৭] সহীহ বুখারী, হা/৩৬৫৩; সহীহ মুসলিম, হা/২৩৮১; সূরা তাওবা- ৪০।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আবদুল্লাহ ইবনে আরীকত নামক এক ব্যক্তির কাছে রেখে এসেছিলেন। কথা ছিল যে, ঠিক তিন দিন পর চতুর্থ রাত্রিতে সওর পর্বতের গুহায় নিয়ে আসবে। ফলে সে কথামতো তাই করল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ)-কে পথ প্রদর্শন করে মদিনায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও সে-ই পালন করল। সে প্রথমে তাঁদেরকে নিয়ে ইয়ামেনের পথে অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়ার পর সমুদ্র তীরের দিকে মোড় নিয়ে খুবই বিচক্ষণতার সাথে একটি অপরিচিত পথ দিয়ে মদিনায় পৌঁছে দিল।

গুহা থেকে বের হয়ে মদিনার পথে যাত্রা শুরু করার রাতে আসমা (রাঃ) তাঁদের পাথেয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাথেয় বেঁধে রাখার মতো কোন রশি না পেয়ে তিনি নিজের কোমরবন্ধনী খুলে দুই ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে পাথেয় বেঁধে দিয়েছিলেন এবং অপরটি দিয়ে নিজের কোমর বেঁধেছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে 'যাতুন নিতাকাইন' উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কুবায় আগমন

সর্বপ্রথম নবী ﷺ মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকা কুবা নামক স্থানে অবতরণ করেন। সে দিনটি ছিল নবুওয়াতের ১৪তম বর্ষের ৮ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দ। সেখানে তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যা এখনো মসজিদে কুবা নামে খ্যাত। এ সময় তিনি কুলসুম বিন হাদাম (রাঃ) এর বাড়িতে উঠলেন। অতঃপর সেখানে তিনি চার দিন তথা সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অবস্থান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মদিনায় প্রবেশ

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শুক্রবার দিন সকালে মদিনায় প্রবেশ করেন। মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ) এর বের হয়ে যাওয়ার কথা মদিনাবাসীরা আগে থেকেই জানতে পেরেছিল। কাজেই তারা প্রতিদিনই তাঁদের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকত। সেদিন একজন ইয়াহুদি কোন এক প্রয়োজনে বাড়ির ছাদে উঠল। এ সময় সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ)-কে মদিনায় আগমন করতে দেখল। ফলে সে দেখামাত্রই উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল ওহে আরবের লোকেরা! তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, তোমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত অতিথি এসে গেছেন। এ কথা শোনার পর মুসলিমগণ তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এগিয়ে আনার জন্য ছুটে গেল। তারপর তারা তাঁকে অতি আনন্দের সাথে মুবারকবাদ জানিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে মদিনায় নিয়ে আসল।

যেহেতু সে দিনটি ছিল জুমু'আর দিন, কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় পৌঁছার পর বনু সালেম ইবনে আউফের আবাসস্থলে পৌঁছলে জুমু'আর নামাযের সময় হয়ে যায়। ফলে তিনি উক্ত স্থানে বাতনে ওয়াদীতে সাহাবীদেরকে নিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করেন। সেই জামা'আতে সর্বমোট ১০০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাসস্থান নির্ণয়

জুমু'আর নামাযের পর শুরু হয় আরেক প্রতিযোগিতা। সেটি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কার বাড়িতে অবস্থান করবেন? কেননা সবাই চাচ্ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সাথেই থাকুক। অবশেষে এর সমাধান রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই করে নিলেন। তিনি নিজের উটনীর লাগাম ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, এ উটনীটি যেখানে গিয়ে বসে পড়বে তিনি সেখানেই অবস্থান করবেন।

অতঃপর দেখা গেল যে, উটনীটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় গিয়ে বসে পড়ল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানেই অবতরণ করলেন। অতঃপর বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজ নিজ ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন শুরু করল। তাদের মধ্যে আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) ও আসয়াদ বিন যুরারাহ (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কার বাড়ি এখান থেকে সবচেয়ে নিকটে? আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাড়িই সবচেয়ে নিকটে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রাঃ) দুজনই সেখানে অবস্থান করলেন।

এর কিছু দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিবার এবং আবু বকর (রাঃ) এর পরিবারও মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মেয়ে যয়নব (রাঃ) তাঁর স্বামী আবু আস এর নিকট থেকে গিয়েছিলেন। কেননা তার স্বামী তাকে আসতে বাধা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি বদর যুদ্ধের পর মদিনায় চলে এসেছিলেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরত করার পর সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন সেটি হচ্ছে, মসজিদ নির্মাণ। আর এজন্য তিনি ঐ জায়গাটিকেই বেছে নিলেন, যেখানে তাঁর উটনী সর্বপ্রথম বসেছিল। ঐ স্থানটির মালিক ছিল দুজন ইয়াতীম বালক। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ স্থানটি তাদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করে নিলেন।

ঐ জায়গায় মুশরিকদের কয়েকটি কবর ছিল এবং কিছু অংশ পতিতও ছিল। তাছাড়া এতে খেজুর ও গারকাদ নামক গাছও ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের কবরগুলো পরিষ্কার করে নিলেন এবং পতিত জায়গাটি সমতল করলেন। অতঃপর খেজুর ও অন্যান্য গাছগুলো কেটে মসজিদ নির্মাণের জন্য খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করলেন। এ মসজিদের দরজার দুই বাহুর স্তম্ভগুলো ছিল পাথর দ্বারা এবং দেয়ালগুলো ছিল কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত। আর এর ছাদ তৈরি করা হয়েছিল খেজুর গাছের ডালপালা দ্বারা এবং মেঝেতে বিছানো হয়েছিল বালি ও ছোট ছোট কাঁকর। এতে তিনটি দরজা লাগানো হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের পাশ দিয়ে আরো কিছু ঘর নির্মাণ করলেন। আর এগুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীদের আবাসগৃহ। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব নির্মাণ কাজে নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আযানের প্রবর্তন

মসজিদ নির্মাণের পর সাহাবীগণ নিজ নিজ দায়িত্বে নামাযের সময় হলে মসজিদে চলে আসতেন। কিন্তু এতে তাদেরকে বেশ সমস্যায় ভুগতে হতো। ফলে একদিন তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আহ্বানের জন্য পরামর্শসভায় একত্রিত হন। তখন সাহাবীগণ বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেন। কেউবা খ্রিস্টানদের মতো ঘণ্টা বাজাতে বলেন, কেউবা ইয়াহুদিদের মতো শিঙ্গা ব্যবহার করতে বলেন, আবার কেউবা ঝাণ্ডা উড়াতে বলেন। কিন্তু কোন পরামর্শই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মনঃপুত না হওয়ায় ঐ দিনের মতো পরামর্শসভা স্থগিত রাখা হয়।

অতঃপর সে রাতেই আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি একটি "নাকূশ" হাতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি এটি আমার কাছে বিক্রি করবে? লোকটি প্রশ্ন করল, এটা নিয়ে তুমি কী করবে? জবাবে তিনি বললেন, ওটা দিয়ে আমরা লোকদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান জানাব। তখন লোকটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পন্থা বলে দেব? আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, অবশ্যই। তখন ঐ ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিল এবং কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, যখন লোকজন জামা'আতে সমবেত হয়ে যাবে তখন এই বাক্যগুলো ইকামত হিসেবে বলবে।

এভাবে ঐ ব্যক্তিটি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে আলাদা-আলাদাভাবে "আযান" এবং "ইকামত" এর বাক্যসমূহ শিখিয়ে দিয়েছিল।

অতঃপর সকাল হওয়া মাত্র, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উপস্থিত হয়ে স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। সব শুনে নবী ﷺ বললেন, এটা সত্য স্বপ্ন; ইনশা-আল্লাহ্– এখন তুমি বিলাল এর কাছে যাও এবং স্বপ্নে যেভাবে শুনেছ, ঠিক সেভাবে তাকে শিখিয়ে দাও। যাতে সে ঐ বাক্যগুলো ব্যবহার করে সবাইকে সালাতের জন্য একত্রিত করে। কেননা বিলাল এর কণ্ঠস্বর তোমার চেয়েও উচ্চ।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) স্বপ্নে প্রাপ্ত আযানের বাক্যগুলো বিলাল (রাঃ)-কে শিখালেন এবং বিলাল (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে সর্বপ্রথম আযান শুরু করলেন।

এদিকে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) নিজের বাড়িতে থাকা অবস্থায় আযানের ঐ বাক্যগুলো শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌঁছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার মাধ্যমে সত্যকে পাঠিয়েছেন, আমিও ঐ বাক্যগুলো কিছুদিন আগে স্বপ্নে শুনেছি, যা এখন শুনতে পাচ্ছি। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই।[৬৮]

তারপর সেই দিন থেকে এখন পর্যন্ত আযানের মধ্য দিয়ে মুসলিমগণকে জামা'আতে ফরয সালাত আদায়ের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

ইসলাম হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। ফলে মাত্র কয়েকদিন পূর্বেও যারা একে অপরকে চিনত না, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের মাঝেই এমন সম্পর্ক তৈরি হয়, যেন তারা একই মায়ের ঔরসজাত ভাই। আনসাররা মুহাজিরদেরকে এতই গুরুত্ব দিতেন যে, তাদের নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মুহাজির ভাইদেরকে সর্ব ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করতেন। তাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

আর মুহাজিরদের (আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরীতে (মদিনায়) বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে, তারা তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) ভালোবাসে

---

[৬৮] ইবনে মাজাহ, হা/৭০৬; তিরমিযী, হা/১৮৯; আবু দাউদ, হা/ ৪৯৯; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/৩৬৩।

এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। তারা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর যারা নিজেদেরকে কৃপণতা হতে মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর- ৯)

মদিনা সনদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনের পর আরো একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, যা ছিল মদিনায় বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য প্রযোজ্য। আর এ চুক্তিটিই ইতিহাসে মদিনা সনদ হিসেবে খ্যাত। এ সনদের ধারা ছিল সর্বমোট ৫১টি। নিম্নে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো :

১. মদিনায় বসবাসকারী সকলেই অন্যদের মোকাবেলায় এক উম্মত হিসেবে গণ্য হবে।
২. কুরাইশ মুহাজিরগণ পূর্বের মতো নিজেদের মধ্যে রক্তপণ আদায় করবে ও তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাদেরকে মুক্ত করবে এবং আনসারদের সকল গোত্রও পূর্বের মতো নিজেদের মধ্যে রক্তপণ আদায় করে পরস্পর দোষমুক্ত হবে।
৩. ঈমানদারগণ কোন সহায় সম্পদহীনকে মুক্তিপণ ও দিয়াত প্রদানের ব্যাপারে উত্তম পন্থা অবলম্বন এবং সম্মান করা থেকে বিমুখ হবে না।
৪. সকল ধর্মপ্রাণ মুমিন ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, যারা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার ও গণ্ডগোলের পথ বেছে নেবে।
৫. মুমিনগণ তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ আপন পুত্রও হয়।
৬. কোন কাফিরের পরিবর্তে কোন মুমিনকে হত্যা করা যাবে না।
৭. যেসকল ইয়াহুদি মুসলিমদের অনুগামী হবে, তাদেরকে প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে এবং তারা অন্য মুসলিমদের মতো হয়ে যাবে। তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা যাবে না কিংবা তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্যও করা যাবে না।
৮. মুসলিমদের সম্পাদিত সন্ধি হবে একই। কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সন্ধি করবে না; বরং সকলে সমতা ও ন্যায়ের উপর ভিত্তি করেই তা করবে।
৯. মুসলিমরা ঐ রক্তপাতের ব্যাপারে সমান অধিকার রক্ষা করবে, যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হবে।

১০. কোন কুরাইশ মুশরিককে আশ্রয় দেবে না, তাদের ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করবে না। আর কোন মুমিনের হেফাযতের ব্যাপারে মুশরিকদেরকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবে না।

১১. যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করে এবং তা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তার নিকট থেকে হত্যার বদলা গ্রহণ করা হবে, যদি নিহতের অভিভাবক তাতে রাজি থাকে।

১২. কোন মুমিনের জন্য এটি সঙ্গত হবে না যে, যারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে তাদের কার্যকলাপে সাহায্য করবে অথবা তাকে আশ্রয় দেবে কিংবা যে তাকে সাহায্য করে তাকে আশ্রয় দেবে। যে এরূপ করবে কিয়ামতের দিন সে অভিশাপ ও গযবে পতিত হবে এবং তার ফরয ও নফল কোন ইবাদাতই কবুল হবে না।

১৩. তোমাদের মধ্যে যখনই কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হবে, তখনই তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধিবিধান মতো ফায়সালার ব্যবস্থা করবে।

১৪. কেউ কারো উপর যুলুম করলে মাযলুমকে সাহায্য করা হবে।

১৫. চুক্তি চলাকালীন সময় চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে সকলকেই এর খরচ বহন করতে হবে।

এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে মদিনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের উপর নেমে আসে কেবল শান্তি আর শান্তি। তাদের মাঝে চলমান সকল ধরনের ঝগড়া-বিবাদের বিলুপ্তি ঘটে এবং মদিনা একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যার পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ।

যুদ্ধের অনুমতি

কুরাইশদের পক্ষ থেকে যখন বারবার হুমকি আসতেই থাকল তখন মদিনাবাসী তথা মুসলিমদের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও তাদের জিহাদ করার অনুমতি ছিল না। ফলে মুসলিমরা একটি যুদ্ধের অনুমতি কামনা করছিলেন। অবস্থার এমন প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দিলেন। তিনি বলেন,

﴿أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۚ وَإِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ - اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللهُ﴾

তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। (সূরা হাজ্জ- ৩৯, ৪০)

যুদ্ধের জন্য এ ধরনের অনুমতি পাওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মদিনার আশেপাশে বসবাসরত গোত্রগুলোর সাথে যুদ্ধে না জড়ানোর ব্যাপারে তাদের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন এবং মদিনার রাজপথে টহলদারী দল প্রেরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রেরিত প্রথম সারিয়া

সারিয়া বলা হয় ঐসব অভিযানকে, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেননি; বরং অন্য কোন সাহাবীকে নেতৃত্ব প্রদান করে একটি দল প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম এ ধরনের দল প্রেরণ করেন হিজরী ১ম বর্ষের রমাযান মাস মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। এ অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি চাচা হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর অধীনে ৩০ জন মুহাজির সৈন্য প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া থেকে আগত কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা। অপরদিকে কুরাইশ দলটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। তাদের নেতা ছিল আবু জাহেল। অতঃপর ঈস নামক জায়গায় উভয় দলের সাক্ষাৎ ঘটে। অবশেষে উভয় দলের মিত্র জুহাইনা গোত্রের নেতা মাজদী ইবনে আমর এর মধ্যস্থতায় উত্তেজনার অবসান ঘটে।

যুদ্ধ ফরয হওয়ার ঘোষণা

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। (সূরা বাক্বারা- ১৯০)

এখানে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর কাজে তোমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান অনুযায়ী তোমরা জীবনব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করতে চাও বলে যারা তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তোমাদের সংশোধন ও সংস্কার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য যুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। এর আগে মুসলমানরা যতদিন দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত ছিল, ততদিন তাদেরকে কেবলমাত্র ইসলাম প্রচারের হুকুম দেয়া হয়েছিল এবং বিপক্ষের যুলুম-নির্যাতনের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করার তাকীদ করা হয়েছিল। এখন মদিনায় তাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, যারাই এ

সংস্কারমূলক দাওয়াতের পথে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে অস্ত্র দিয়েই তাদের জবাব দাও। এরপরই অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ। তারপর একের পর এক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতেই থাকে।

বদর যুদ্ধ

বদর হচ্ছে মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। এটি মদিনা থেকে প্রায় ৭০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনে এটিই ছিল কুরাইশদের সাথে সর্বপ্রথম বড় যুদ্ধ। নিম্নে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

প্রেক্ষাপট :

মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল সিরিয়া। আর এ উভয় শহরের যোগাযোগ পথেই মদিনার অবস্থান। সুতরাং সিরিয়া যাতায়াত করার জন্য মক্কাবাসীকে মদিনা অতিক্রম করেই যেতে হয়। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ পেলেন যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় আগমন করছে। অতঃপর তিনি এও সংবাদ পেলেন যে, সে কাফেলায় মক্কাবাসীদের প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। তাতে রয়েছে, এক হাজার উট এবং প্রতিটি উট কমপক্ষে ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের মালপত্র বহন করছে। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কাফেলার সাথে ৪০ জন কর্মীও রয়েছে।

অতএব মদিনাবাসীদের জন্য এটি একটি বিশাল সুযোগ। যদি এগুলো ছিনিয়ে নিতে পারে তাহলে তারা সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে যেতে পারবে। পক্ষান্তরে কুরাইশদের জন্য ছিল এসব ক্ষেত্রে বড় ধরনের ক্ষতির কারণ। কেননা এ কাফেলার সমস্ত মালপত্রের সাথে মক্কাবাসী সবাই অংশীদার ছিল। এসব বিভিন্ন দিক চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দেন যে, সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী একটি কুরাইশ কাফেলার সাথে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ো। হয়তো আল্লাহ তা'আলা গনীমত হিসেবে এসকল মালপত্র তোমাদের হাতে দিয়ে দেবেন।

এ ঘোষণার পরপরই মুসলিমগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তুতি নিতে থাকে। এদিকে মক্কার কুরাইশরা যখন এ সংবাদ পেল যে, মুসলিমরা তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তারাও সাথে সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিল এবং মদিনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ দলটিকেই মুসলিমদের মুখোমুখি করে দিলেন।

এ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের মধ্যে ৮২ জন, মতান্তরে ৮৩ অথবা ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির। আর অন্যরা ছিলেন আনসার। তাদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং নবী ﷺ।

পক্ষান্তরে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৩০০। তাদের কাছে ছিল ১০০ ঘোড়া এবং ৬০০ লৌহবর্ম। তাছাড়া অসংখ্য উটও ছিল। তাদের সর্বাধিনায়ক ছিল আবু জাহেল ইবনে হিশাম।

বদর অভিমুখে যাত্রা :

এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ছাড়াই মদিনা থেকে যাত্রা শুরু করেন। পক্ষান্তরে কুরাইশরা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বিশাল শক্তিশালী একটি বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়।

কুরাইশদের মতভেদ :

যখন আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলাকে নিরাপদে মুসলিম বাহিনী থেকে এড়িয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো, তখন পথিমধ্যে যুদ্ধের জন্য আগত কুরাইশ বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাত হয়ে যায়। তখন কুরাইশদের অনেকেই মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। ফলে তাদের মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কুরাইশদের নেতা আবু জাহেল যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নেয়। যার ফলে কুরাইশদের সফরসূচী পূর্বের অবস্থাতেই বহাল থাকে এবং তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য যাত্রা অব্যাহত রাখে।

মুসলিম বাহিনীর বিব্রতকর অবস্থা :

পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার এড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কে এবং কুরাইশদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত হন। এতে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণও অনেকটা বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু পরক্ষণেই এর ফলাফলের কথা চিন্তা করে আল্লাহর বিশেষ রহমতে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। কেননা এ পরিস্থিতিতে যদি কুরাইশ বাহিনীকে ছেড়ে দেয়া হয় অথবা তাদের হাতে পরাজয় বরণ করা হয়, তাহলে মদিনায় মুসলিমদের আধিপত্য অনেকটাই হ্রাস পেয়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতী কাজকর্মও স্তিমিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কুরাইশদের সাথে লড়াই করে তাদের উপর বিজয়ী হওয়া যায়, তাহলে আরব ভূমিতে মুসলিমদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রও অনেক গুণ প্রশস্ত হবে। এসব বিভিন্ন দিক চিন্তা করে মুসলিমদের উপর এ যুদ্ধ করাটা একেবারেই আবশ্যক হয়ে উঠে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য সাহাবীদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

সিদ্ধান্তের প্রতি একমত পোষণ করেন এবং এতে দৃঢ় থাকার জন্য অঙ্গীকার প্রদান করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদেরকে নিয়ে বদর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

মুসলিম বাহিনীর অবস্থান :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে বদর অভিমুখে খুব দ্রুত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। যাতে করে সেখানে সর্বপ্রথম তাঁরাই অবস্থান নিতে পারেন এবং সেখানে অবস্থিত ঝর্ণা নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেন। কেননা সেখানকার পানি সংগ্রহের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল ঝর্ণা। সুতরাং যদি ঝর্ণা নিয়ন্ত্রণে নেয়া যায়, তাহলে শত্রু পক্ষকে অনেকটা সংকটে ফেলা সম্ভব হবে। তারপর দেখা গেল যে, মুসলিম বাহিনীই সেখানে সর্বাগ্রে গমন করে শিবির স্থাপন করেন এবং ঝর্ণা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। তারপর তারা সেখানে নেতৃত্ব প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য এমন একটি জায়গায় ছাউনী নির্মাণ করেন, যেখান থেকে সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রটি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান :

পক্ষান্তরে কুরাইশ বাহিনী উপত্যকার বাইরের দিকে শিবির স্থাপন করে। ফলে তারা উক্ত উপত্যকার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ :

উভয় পক্ষ নিজ নিজ শিবিরে অবস্থান নেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা উক্ত রাতেই মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যা ছিল মুসলিমদের জন্য রহমতস্বরূপ এবং কুরাইশদের জন্য আযাবস্বরূপ। কেননা এর কারণে মুসলিমরা আরো অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়। আর তা হলো, মুসলিম বাহিনী যেখানে অবস্থান করছিল, সে স্থানটি ছিল বালুময় এবং উঁচুভূমি। সেখানে বৃষ্টি হওয়ার ফলে বালুর স্তরগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনীর চলাচলের ক্ষেত্রে অনেকটাই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

পক্ষান্তরে কুরাইশ বাহিনী যেখানে অবস্থান করছিল সেটি ছিল নিচুভূমি। বৃষ্টি বর্ষণের কারণে সেখানে কাদা জমে যায় এবং তাদের চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

চূড়ান্ত যুদ্ধ :

অবশেষে সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয়। দিনটি ছিল হিজরী ২য় বর্ষের ১৭ই রমাযান শুক্রবার সকাল। এর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীকে যথাযথভাবে কাতারবন্দী করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তারপর যখন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হলো, তখন নিয়মানুযায়ী উভয় দলের পক্ষ থেকে তিনজন করে এগিয়ে আসলো। প্রথমে কুরাইশদের পক্ষ থেকে এগিয়ে আসলো– উতবা,

শায়বা এবং তার পুত্র ওয়ালীদ। তারপর তারা মুসলিমদের মধ্য থেকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালে প্রথমে আউফ ইবনে হারিস (রাঃ), মু'আব্বির ইবনে হারিস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এগিয়ে আসলেন। কিন্তু কুরাইশরা এদেরকে বাদ দিয়ে তাদের সমগোত্রিয় কাউকে এগিয়ে আসতে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুমতিক্রমে হামযা (রাঃ), উবাদা ইবনে হারিস (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এগিয়ে আসলেন। অতঃপর তাদের মধ্যে মুখোমুখি যুদ্ধ বেধে গেল। এতে মুসলিমগণ তিন প্রতিপক্ষকেই হত্যা করে ফেলেন এবং তাঁরা জয় লাভ করেন।

এরপর শুরু হয় যুদ্ধের মূল পর্ব। যখন কুরাইশরা দেখল যে, তাদের নেতাগণ পরাজিত হয়েছে তখন তারা আরো উত্তেজিত হয়ে একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে তাদের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দু'আ :

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীকে কাতারবন্দী করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ, তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করছি।

তারপর যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ মর্মে প্রার্থনা করলেন যে, হে আল্লাহ! এ দলটিকে যদি আজ তুমি ধ্বংস করে দাও, তাহলে আর তোমার উপাসনা করা হবে না। হে আল্লাহ! তুমি যদি এটাই চাও, তাহলে আজকের পর আর কখনো তোমার ইবাদাত করা হবে না।

ফেরেশতাদের অবতরণ :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটু তন্দ্রা আসলো। ফলে তিনি মাথা হেলিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, হে আবু বকর! খুশি হয়ে যাও। ইনি হলেন জিবরাঈল, তার দেহ ধুলো-বালিতে ভরপুর। অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) ফেরেশতাদের নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লৌহ বর্ম পরিহিত অবস্থায় ছাউনী থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

ইবলিসের পলায়ন :

যুদ্ধ শুরুর পূর্বে অভিশপ্ত ইবলিস সোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশুম মুদলিজীর আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তারপর যখন সে ফেরেশতাদের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করল তখন পেছনে ফিরে পলায়ন করতে থাকল। তখন মুশরিকরা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি; তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।

কুরাইশ দলের বিশৃঙ্খলতা :

এরপর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তাদের পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকল। তারপর এক সময় তারা পিছু হটতে থাকল, এমনকি দৌড়ে পালাতে লাগল। এই সুযোগে মুসলিম বাহিনী তাদেরকে হত্যা, জখম ও বন্দী করতে করতে পিছু ধাওয়া করে চলতে লাগলেন।

ফলাফল :

অবশেষে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। মুসলিমরা কুরাইশদের সকল গর্ব ও অহংকার ভেঙ্গে দিয়ে তাদের উপর বিজয়ী হলেন। ফলে কুরাইশরা চরমভাবে লাঞ্ছিত হলো। এ যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্য হতে মাত্র ১৪ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। তার মধ্যে ৬ জন ছিলেন মুহাজির এবং ৮ জন ছিলেন আনসার। পক্ষান্তরে কুরাইশরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে আবু জাহেল, উতবা ও শায়বা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দরা ছিল অন্যতম।

গনীমতের সম্পদ বণ্টন :

সে সময়ের নিয়মানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ শেষ করে তিনদিন পর্যন্ত বদরের প্রান্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তখনও তিনি মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেননি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের সম্পদের ব্যাপারে নির্দেশ দেন যে, যার কাছে যা আছে সে যেন তা তাঁর কাছে জমা দেয়। তখন সাহাবীগণ তা-ই করলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা এর সামাধানে এ আয়াত নাযিল করেন–

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তাদেরকে বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের জন্য। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক বিষয় সংশোধন করে নাও। আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আনফাল- ১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যা রুকাইয়া (রাঃ) এর মৃত্যু :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ যুদ্ধে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন রুকাইয়া (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্বামী উসমান (রাঃ)-কে সেবা-শুশ্রূষার জন্য মদিনায় রেখে গিয়েছিলেন।[৬৯] রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধে বিজয় লাভ করে মদিনায় ফিরছিলেন তখন তাঁর নিকট কন্যা রুকাইয়া (রাঃ) এর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে। তারপর মদিনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দাফন কার্য সম্পাদন করেন।

---

[৬৯] বায়হাকী, হা/১৮৩৬৬; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৪৯৫৯।

বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের তৎপরতা

বদর যুদ্ধ হচ্ছে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে সর্বপ্রথম অস্ত্রের লড়াই। এর মাধ্যমে কারা সত্যের পথে এবং কারা বাতিলের পথে রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে কুরাইশরা চরমভাবে অপমানিত হয়। চারদিক থেকে সবাই তাদেরকে ধিক্কার দিতে থাকে। ফলে কুরাইশরা মুসলিমদের উপর আরো ক্রোধান্বিত হতে থাকে। অপরদিকে মুসলিমদের মধ্যে বয়ে যায় প্রশান্তির বাতাস। মদিনার আকাশ-বাতাস তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হতে থাকে।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার দল মদিনায় মুসলিমদের মধ্যে নানা ধরনের অপবাদ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন তাদের কাছে বদর যুদ্ধের বিজয়ের সংবাদ এসে গেল তখন তারা নিজেদের মান-মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য কোন পথ খুঁজে পেল না। ফলে তারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের অন্তরের মধ্যে কুফর লুকিয়ে রেখেছিল।

মদিনা ও মদিনার আশপাশে বসবাসরত কিছু গোত্র তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নেতৃত্ব মেনে নিতে পারছিল না। ফলে যখন তারা মুসলিমদের এ বিজয়ের সংবাদ শ্রবণ করে তখন খুবই ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। যার কারণে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে খুবই তৎপর হয়ে উঠে। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাদের এসব অবস্থা খুবই সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তাদের যে কোন চক্রান্ত ধূলিস্যাৎ করে দিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। নিম্নে এরই কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

১. বনু সুলাইম অভিযান :

বদর যুদ্ধের পর মুসলিমরা সর্বপ্রথম যে সংবাদটি পান সেটি হচ্ছে, গাতফান গোত্রের শাখা বনু সুলাইমের লোকেরা মদিনার উপর চড়াও হওয়ার জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২০০ জন উষ্ট্রারোহীকে সাথে নিয়ে তাদের উপর আকস্মিকভাবে ধাওয়া করেন। এতে বনু সুলাইম গোত্র হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ফেলে রেখে পলায়ন করে।

এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরী ২য় বর্ষের শাওয়াল মাসে এবং বদর হতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাত দিন পর।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র :

বদর যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে মক্কার কুরাইশরা একেবারেই কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের অনেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাভাবে চক্রান্ত করতে লাগল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল উমায়ের ইবনে ওহাব। তার ছেলে বদর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। একদা সে

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এর সাথে বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। আর এটি ছিল খুবই গোপনীয়। তারপর সে পরিকল্পনা অনুযায়ী মদিনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে দেখা করে। কিন্তু তার এ চক্রান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে ইতিপূর্বেই জেনে গিয়েছিলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এসব পরিকল্পনা তার কাছে বলে দেন, তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে এবং সত্যকে চিনতে পারে। যার কারণে সে তখনই ইসলাম গ্রহণ করে।

৩. বনু কাইনুকার অভিযান :

বনু কাইনুকা ছিল মদিনায় বসবাসরত একটি ইয়াহুদি গোত্র। মদিনা সনদ প্রণয়নের সময় তারাও এতে স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু যেহেতু তারা পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সহ্য করতে পারত না, তাই বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে তারা মুসলিমদের উপর আরো ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে এবং সেটা তাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাদেরকে বারবার সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এরপরও তাদের হিংসা যেন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

তারা যে এলাকায় বসবাস করত, সেটা তাদের গোত্রের নামেই পরিচিত ছিল। আর তাদের মধ্যে একটি বাজার ছিল। সেখানে তারা ক্রয়-বিক্রয় করত। যখনই কোন মুসলিম সেখানে যেতেন তখন তারা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত এবং তাকে নানা ভাবে কষ্ট দিত। একদা এক মুসলিম মহিলা বিশেষ কোন প্রয়োজনে তাদের বাজারে গেলেন। তখন এক ইয়াহুদি উক্ত মুসলিম মহিলাকে চরমভাবে অপমানিত করে এবং তাকে নিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে উঠে। তখন এক মুসলিম ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করলে ইয়াহুদিরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে।

এ ঘটনা জানতে পেরে মুসলিমগণ খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথেই সেনাবাহিনী নিয়ে বনু কাইনুকার দিকে অগ্রসর হন। তখন ইয়াহুদিরা মুসলিম বাহিনীকে দেখামাত্রই দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দুর্গ অবরোধ করেন। দিনটি ছিল হিজরী ২য় বর্ষের শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ শুক্রবার। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ১৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে বনু কাইনুকার ইয়াহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল তাদেরই একজন মিত্র। বনু কাইনুকার এ অবস্থা দেখে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাদেরকে হত্যা করা হতে অব্যাহতি দিলেন এবং মদিনা থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

৪. সাভীক অভিযান :

বদর যুদ্ধের পর থেকে ইসলামের শত্রুরা নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করেই যাচ্ছিল। একদিকে যেমন মক্কার কুরাইশরা, অন্যদিকে মদিনা ও মদিনার আশপাশে বসবাসরত ইয়াহুদিরা– সকলেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিল। সুতরাং তারা যেভাবেই পারত, মুসলিমদের ক্ষতি করার চেষ্টা করত। এদিকে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত অপবিত্রতার কারণে মাথায় পানি দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল। ফলে একদিন সে ২০০ জন অশ্বারোহী নিয়ে মদিনায় গুপ্ত হামলা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এবং মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বনু নাযীর গোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর তারা সকাল বেলা আবু সুফিয়ানের নির্দেশে সেখানকার একটি এলাকায় আক্রমণ করে খেজুর গাছ কর্তন করে তা জ্বালিয়ে দেয়। পাশাপাশি তারা একজন আনসারী সাহাবী ও তার মিত্রকেও হত্যা করে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদ শুনতে পেয়ে তাদের পেছনে দ্রুত ধাওয়া করেন। কিন্তু এর আগেই তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ ঘটনাটি ঘটেছিল বদর যুদ্ধের মাত্র ২ মাস পর অর্থাৎ ২য় হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসে।

৫. যী আমর অভিযান :

বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নেতৃত্বে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান। এটা সংঘটিত হয়েছিল হিজরী ৩য় বর্ষের মুহাররম মাসে। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ পেলেন যে, বনু সা'লাবা ও বনু মুহারিব গোত্রের এক বিরাট বাহিনী মদিনার উপর আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হচ্ছে। এ সংবাদ শোনার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ৪০০ জন সৈন্য নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সাহাবীগণ বনু সা'লাবা গোত্রের 'জার' নামক এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ধরে নিয়ে আসেন। অতঃপর তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হলে সে তা গ্রহণ করে নেয়। তারপর মুসলিমরা তার তথ্যের ভিত্তিতে শত্রুদের অবস্থানস্থল পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু এর আগেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে নিজেদের শক্তি সামর্থ প্রকাশ করার জন্য পূর্ণ সফর মাসটি অতিবাহিত করে মদিনায় ফেরত আসেন।

৬. কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা :

কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল একজন ইয়াহুদি নেতা। সে ছিল ইয়াহুদিদের মধ্যে খুবই প্রভাবশালী ও ধনী। তার সৌন্দর্যের খুবই সুনাম ছিল। তাছাড়া সে কবিতাও রচনা করত। সে শুরু থেকেই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আসছিল। তারপর যখন সে মুসলিমদের বদর বিজয়ের সংবাদ শুনতে পেল

তখন সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে গেল। ফলে বারবার কুরাইশদের নিকট গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত করতে লাগল। উপরন্তু সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের নিয়ে খুব বাজে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর একেবারেই অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন। ফলে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কা'ব ইবনে আশরাফের (নিধনের) জন্য কে আছ? কেননা সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সাহাবী বললেন, তাহলে আমাকে প্রয়োজন মতো যা ইচ্ছা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, ঠিক আছে- অনুমতি দেয়া হলো। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে এলেন। তারপর তিনি বললেন, এ ব্যক্তি {মুহাম্মাদ ﷺ} তো সাদাকা উসূল করতে চায় এবং সে আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সে (কা'ব) যখন এ কথাগুলো শুনতে পেল, তখন বলল, আরো অপেক্ষা করো। আল্লাহর কসম, সে তোমাদেরকে কষ্ট দেবেই। তখন সাহাবী বললেন, আমরা সবেমাত্র তাঁর অনুসারী হয়েছি। তাই ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা না দেখে এ মুহূর্তেই তাকে ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক মনে করছি না। এখন আমি চাই তুমি আমাকে কিছু ধার দাও। কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, তুমি আমার কাছে কিছু বন্ধক রাখবে? মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বললেন, তুমি কী চাও? সে বলল, তোমাদের মহিলাদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, তুমি হলে আরবের সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ; তোমার কাছে বন্ধক রাখব আমাদের মহিলাদের? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। জবাবে তিনি বললেন, আমাদের কারো সন্তানকে এ বলে গালি দেয়া হবে যে, তাকে মাত্র দু'ওসাক (৫ মণ আড়াই সের পরিমাণ) খেজুরের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। আমরা বরং তোমার কাছে যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখব। সে বলল, ঠিক আছে। তখন তিনি তার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, হারিস, আবু আবস ইবনে জাব্‌র ও আব্বাদ ইবনে বিশরসহ তার কাছে আসবেন।

তারপর তাঁরা রাতের বেলা তার কাছে আসলেন এবং তাকে ডাকলেন। তখন সে তাদের কাছে আসল। এ সময় তার স্ত্রী তাকে বলল, আপনি এ সময় কোথায় যাচ্ছেন? আমি এমন একটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি যে, কোন স্থান হতে যেন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝড়ছে। সে বলল, এ হচ্ছে মুহাম্মাদ এবং তার দুধভাই আবু নায়িলা। সম্ভ্রান্ত লোককে যদি রাতের বেলা বর্শাবিদ্ধ হওয়ার দিকে ডাকা হয়, তবুও তার ডাকে সাড়া দেয়া উচিত।

এদিকে আবু নায়েলা (রাঃ) তার সঙ্গীদেরকে বলে রেখেছিলেন যে, সে যখন আসবে, তখন আমি তার মাথা লক্ষ্য করে আমার হাত বাড়াব। যখন আমি তা ভালোভাবে ধরে নেব, তখন তোমরা তোমাদের কাজ সেরে নেবে। তারপর যখন সে গায়ে চাদর জড়িয়ে নিচে নেমে এল, তখন নায়েলা (রাঃ) বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে খুবই সুঘ্রাণ পাচ্ছি। সে বলল, হ্যাঁ– আমার স্ত্রী অমুক হচ্ছে আরবের সর্বাধিক ঘ্রাণবিশিষ্ট সুগন্ধী ব্যবহারকারিণী মহিলা। তখন তিনি বললেন, আমাকে তা থেকে একটু সুবাস নিতে অনুমতি দেবেন? তখন সে বলল- হ্যাঁ। তখন তিনি তার মাথা শুঁকলেন। কিছুক্ষণ পর আবার শুঁকলেন। এরপর পুনরায় বললেন, আমাকে কি আবারও একটু ঘ্রাণ নিতে দেবে? তখন সে বলল, অবশ্যই। অতঃপর যখন তিনি মাথা শুঁকার ভান করে তার মাথা ধরলেন তখন সাথিদেরকে বললেন, তোমরা সেরে ফেলো। তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেললেন।[৭০]

৭. বাহরানের অভিযান :

এটি সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর রবিউস সানি মাসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩০০ সদস্যের একটি সেনাবাহিনী নিয়ে বাহরান নামক একটি অঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করেন। তারপর তিনি সেখানে দুই মাস যাবত অবস্থান করে কোন যুদ্ধ ছাড়াই মদিনায় ফিরে আসেন।

৮. যায়েদ ইবনে হারিসার অভিযান :

এ অভিযানটি সংঘটিত হয়েছিল ৩য় হিজরীর জুমাদিউস সানি মাসে। মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্বাহ ছিল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। ফলে এতদিন তারা গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় এবং শীতকালে আবিসিনিয়ায় ব্যবসা পরিচালনা করত। এদিকে আবিসিনিয়ার পথটি আশঙ্কামুক্ত থাকলেও বদর যুদ্ধের পর থেকে সিরিয়াগামী পথটি বন্ধ হয়ে যায়। কেননা মক্কার সাথে সিরিয়ার যোগাযোগের একমাত্র পথটির মাঝখানেই ছিল মদিনার অবস্থান, যা মুসলিমরা মক্কাবাসীদের জন্য অবরোধ করে দেয়। এতে মক্কাবাসীরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। অতঃপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া একটি বিকল্প পথে মদিনাকে পাশ কাটিয়ে সিরিয়ার পথে গমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ বিষয়টি জেনে ফেলেন এবং সাথে সাথেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি যায়েদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে ১০০ জন অশ্বারোহীর একটি বাহিনীকে তাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ফলে যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) তার বাহিনী নিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলেন এবং তাদের মালপত্র গনীমত হিসেবে নিয়ে নেন।

---

[৭০] সহীহ মুসলিম, হা/৪৭৬৫।

উহুদ যুদ্ধ

প্রেক্ষাপট :

উহুদ মদিনা হতে চার মাইল উত্তরে বিস্তৃত একটি পাহাড়ি এলাকা। মক্কার কুরাইশরা বদর যুদ্ধের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। প্রতিটি মুহূর্তে তারা ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিল। এমনকি তারা এ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেই ছাড়বে। উপরন্তু মদিনা ও মদিনার আশেপাশে বসবাসরত ইয়াহুদিদের কুমন্ত্রণা তো রয়েছেই। তারা অনবরত কুরাইশদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিল। তাছাড়া উহুদ যুদ্ধের বেশ কিছু দিন পূর্বে মুসলিমদের দ্বারা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা আক্রান্ত হওয়াটা তাদেরকে আরো বিষাদময় করে তুলেছিল। যার পরিণতিতে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে আরো একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ আবশ্যক হয়ে উঠে।

কুরাইশদের যাত্রা :

অবশেষে কুরাইশরা মুসলিমদের উপর চরম রাগ ও উত্তেজনা নিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এরপর মক্কা থেকে উহুদের দিকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রাকালে তারা নানা ধরনের ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নাচ-গান করে আনন্দ-ফূর্তি করছিল।

মদিনায় সংবাদ :

এদিকে আব্বাস (রাঃ) কুরাইশদের সকল তৎপরতা লক্ষ্য করছিলেন। কুরাইশদের এ ধরনের যাত্রার কারণে তিনি বিচলিত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত সংবাদ সম্বলিত একটি পত্র দিয়ে মদিনায় প্রেরণ করেন। অতঃপর পত্র বাহক মক্কা হতে মদিনা পর্যন্ত প্রায় ৫০০ কিঃমিঃ পথ মাত্র তিন দিনে অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হন।

মুসলিম বাহিনীর যাত্রা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পত্রটি পাওয়ার সাথে সাথেই আনসার ও মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে পরামর্শ সভায় বসেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। ফলে মুসলিম বাহিনী সাথে সাথেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নেতৃস্থানীয় সাহাবীদেরকে নিয়ে আবারো পরামর্শ সভায় বসেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তারা কুরাইশ বাহিনীকে মদিনার বাইরে গিয়েই প্রতিরোধ করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করেন। খুতবা দানের সময় তিনি সাহাবীদেরকে অনেক

গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। তারপর সকলেই একত্রে কুরাইশদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য যাত্রা শুরু করেন।

উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা :

এ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০ জন। তাদের মধ্যে ২০ জন ছিলেন অশ্বারোহী, ১০০ জন ছিলেন বর্মধারী, ৫০ জন ছিলেন তীরন্দাজ এবং বাকিরা ছিলেন সাধারণ সৈন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে উহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে যখন 'শাওত' নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তাঁরা কুরাইশ বাহিনীর দেখা পেলেন। এতে কুরাইশদের সৈন্যের আধিক্য দেখে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার অনুসারীরা খুবই ভীত হয়ে গেল। এমনকি তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অবশেষে সে তার ৩০০ জন অনুসারীকে নিয়ে পিছু হটে গেল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ৭০০ জন সৈন্য নিয়েই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন।

অপর দিকে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলিমদের থেকে তিন ডাবল অর্থাৎ ৩০০০। তাদের মধ্যে ৭০০ জন ছিল বর্মধারী, ৩০০ জন ছিল উষ্ট্রারোহী, ২০০ জন ছিল অশ্বারোহী এবং বাকি সবাই সাধারণ সৈন্য। সৈনিকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য অনেক কুরাইশ নারী ও কবিও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেনা বিন্যাস :

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিকদের কাছ থেকে এমন হঠকারিতার শিকার হয়েও অবশেষে উহুদের ময়দানে গিয়ে নিজেদের শিবির স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনে নুমান আনসারী (রাঃ) এর নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজকে মুসলিমদের শিবির থেকে পূর্ব-দক্ষিণে ১৫০ মিটার দূরত্বে 'জাবালে রুমাত' নামক একটি ছোট পাহাড়ের কাছে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেন। কেননা ঐ পাহাড়ের মধ্যে একটি গিরিপথ ছিল। যদি শত্রুরা ঐদিক থেকে কোন আক্রমণ করার সুযোগ পায়, তাহলে তারা মুসলিম বাহিনীকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে। সুতরাং এ দিক থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজন ছিল। সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দলটিকে বলে দিলেন যে, তোমরা আমাদের পেছনের দিকটি রক্ষা করবে। যদি তোমরা দেখতে পাও যে, আমরা গনীমতের মাল একত্রিত করছি, তারপরও তোমরা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে না। আর যদি এও দেখ যে, আমরা মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছি, তবুও তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না।[৭১]

---

[৭১] সহীহ বুখারী, হা/৩০৩৯।

এরপর তিনি দক্ষিণ বাহুর উপর মুনযির ইবনে আমর (রাঃ)-কে এবং বাম বাহুর উপর যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)-কে তার সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সেনাবাহিনী বিন্যাস করেন। আর এজন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাটি বেছে নেন এবং কুরাইশ বাহিনীকে নিচু জায়গাতে অবস্থান করতে বাধ্য করেন। যাতে তারা মুসলিমদের উপর তেমন একটা সুবিধা করতে না পারে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নয়জন দেহরক্ষী নিয়ে পেছনে অবস্থান নেন এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি অবলোকন করতে থাকেন। তাদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন আনসার এবং ২ জন ছিলেন মুহাজির।[৭২]

কুরাইশদের সেনাবাহিনী :

এদিকে কুরাইশরাও তাদের সেনাবাহিনী বিন্যাস করছিল। তাদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। সে নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেছিল সেনাবাহিনীর ঠিক মধ্যস্থলে। তার দক্ষিণ বাহুর উপর ছিল খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এবং বাম বাহুর উপর ছিল ইকরামা ইবনে আবু জাহেল। পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি ছিল সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। আর তীরন্দাজদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে রাবীয়া। এটা ছিল একটি অতি সাধারণ সেনা বিন্যাস, যা মুসলিমদের মতো ততটা কৌশলপূর্ণ নয়।

চূড়ান্ত যুদ্ধ :

দিনটি ছিল হিজরী ৩য় বর্ষের শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার। উভয় দল কাতারবন্দী হয়ে একে অপরের মুখোমুখি হলেন। এমন সময় মুশরিকদের মধ্যে সবচেয়ে বীরপুরুষ তালহা ইবনে আবু তালহা আবদারী নামক এক ব্যক্তি উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে হুংকার দিয়ে তার মোকাবেলা করার জন্য একজনকে আহ্বান জানাল। তখন তার অত্যধিক বীরত্বের কারণে সাধারণ সাহাবীগণ তার সাথে মোকাবেলা করার সাহস করলেন না। কিন্তু হঠাৎ যুবায়ের (রাঃ) তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে সামান্য সময়ের অবকাশ না দিয়েই লাফ দিয়ে তার উষ্ট্রের উপর চড়ে বসলেন এবং তাকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে নিলেন। অতঃপর তাকে ভূমিতে ফেলে দিয়ে তরবারি দিয়ে দু'টুকরো করে ফেললেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই আনন্দিত হলেন এবং সকলেই তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলেন। এর পরপরই শুরু হয় একযোগে আক্রমণ। মুসলিমগণ খুবই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। বিশেষ করে মুশরিকদের মধ্যে যে ব্যক্তিই পতাকা উত্তোলন

---

[৭২] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৮৯।

করার চেষ্টা করছিল, মুসলিমরা তাকেই হত্যা করে ফেলছিলেন। এমনকি এক সময় তাদের পতাকা উত্তোলন করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকল না। এভাবে যুদ্ধের শুরু থেকেই মুশরিকরা মুসলিমদের আক্রমণের শিকার হচ্ছিল এবং ক্রমেই পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তরবারি প্রদান :

যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে আহ্বান করে বললেন, কে আছ আমার এই তরবারি গ্রহণ করবে? তখন সাহাবীগণ তা গ্রহণ করার জন্য একত্রিত হলেন। এ সময় আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা (রাঃ) বলে উঠলেন, আমি একে তার হকসহ গ্রহণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তরবারিটি প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি উক্ত তরবারি দ্বারা মুশরিকদের মাথা বিদীর্ণ করতে লাগলেন।[৭৩]

হামযা (রাঃ) এর শাহাদাত :

হামযা (রাঃ) ছিলেন মুশরিকদের জন্য ভীতির অন্যতম কারণ। এ যুদ্ধে তিনিও বেশ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন এবং বড় বড় মুশরিককে হত্যা করে যাচ্ছিলেন। এক সময় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তবে তার শাহাদাতটি অন্যান্য মুসলিমের শাহাদাতের মতো ছিল না; বরং তাকে কাপুরুষের মতো মারা হয়েছিল। তাকে হত্যা করেছিল ওয়াহশী নামে এক হাবশী ক্রীতদাস। কিন্তু পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ঘটনাটি ছিল এই যে, ওয়াহশী ছিল জুবাইর ইবনে মুতইমের ক্রীতদাস। বদর যুদ্ধে হামযা (রাঃ) যখন জুবাইর ইবনে মুতইমের চাচা উমাইয়া ইবনে আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেন তখন সে ওয়াহশীকে বলে, যদি তুমি আমার চাচার বিনিময়ে মুহাম্মাদ এর চাচা হামযাকে হত্যা করতে পার, তাহলে তুমি মুক্ত।

অতঃপর মক্কাবাসীরা যখন উহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়, তখন ওয়াহশীও তাদের সাথে যাত্রা শুরু করে। তারপর যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন ওয়াহশী হামযা (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে এবং এ উদ্দেশ্যে সে একটি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। অতঃপর হামযা (রাঃ) যখন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ওয়াহশীর নিকটবর্তী হন, তখন ওয়াহশী তাকে পেছন দিক থেকে বর্শা দ্বারা এত জোরে আঘাত করে যে, বর্শাটি তার মূত্রথলি ভেদ করে দু'নিতম্বের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর এতেই হামযা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন।[৭৪]

---

[৭৩] সহীহ মুসলিম, হা/২৪৭০।
[৭৪] সহীহ বুখারী, হা/৪০৭২।

মুশরিকদের পরাজয় :

এভাবে কিছুক্ষণ ভয়ানক যুদ্ধ চলতে থাকে এবং মুসলিম বাহিনী ধীরে ধীরে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে আসে। মুশরিকরা তাদের মনোবল হারাতে থাকে, এমনকি এক সময় তারা পলায়ন করতে শুরু করে। ফলে মুসলিমরা তাদের ফেলে যাওয়া ধনসম্পদ তথা গনীমত সংগ্রহ করতে থাকে।

তীরন্দাজ বাহিনীর ভুল :

এতক্ষণ পর্যন্ত পাহাড়ের উপর দায়িত্বরত তীরন্দাজগণ ভালোভাবেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। এমনকি তারা তিন বার খালিদ বিন ওয়ালীদের আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। কিন্তু যখনই তারা অন্যান্য মুসলিমদেরকে গনীমত সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি করতে দেখলেন তখন তারাও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশকে ভুলে গিয়ে গনীমত সংগ্রহ করার জন্য চলে গেলেন। আর এ কারণেই পরবর্তীতে তাদেরকে বিরাট খেসারত দিতে হয়েছিল।

খালিদ বিন ওয়ালীদের পাল্টা আক্রমণ :

যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ এবং মুশরিকরা যখন পরাজয় বরণ করার অপেক্ষায়, ঠিক এমন সময় খালিদ বিন ওয়ালীদ গিরিপথে অবস্থানরত মুসলিম তীরন্দাজদের এ ভুলের সুযোগ গ্রহণ করেন। আর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) তখনও মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন। তিনি এ সুযোগে ঐ গিরিপথ দিয়ে অতর্কিতভাবে হামলা চালিয়ে মুসলিমদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। এতে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এদিকে আমরাহ বিনতে আলকামা নামে এক কুরাইশ মহিলা এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তাদের পতাকাটি আবার তুলে ধরে। এতে মুশরিকরা সে পতাকাতলে একত্রিত হয়ে আবার শক্তি সঞ্চয় করে মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালায়। ফলে মুসলিমরা সামনে এবং পেছনে দুই দিক থেকেই আক্রমণের শিকার হয়ে মহাবিপদের মধ্যে পড়ে যান।

মুসলিম বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা :

মুশরিকদের এ ধরনের পাল্টা আক্রমণের কারণে মুসলিমরা হতভম্ব হয়ে পড়েন। পরক্ষণেই তারা দিশেহারা হয়ে এদিক সেদিক ছুটতে থাকেন। অনেকে আবার মুশরিকদের কাতারে ঢুকে পড়েন। এতে মুসলিম অথবা মুশরিক নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই মুশরিকরা আক্রমণ করে অনেক মুসলিমকে শহীদ করে ফেলে। এ সময় বিশৃঙ্খলা এতই বেশি হয়ে গিয়েছিল যে, এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কেবল তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) ছাড়া আর কেউই অবশিষ্ট ছিলেন না। ফলে এই সুযোগে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তারা তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এটা লক্ষ্য করে কয়েকজন সাহাবী এগিয়ে আসেন এবং

একে একে শহীদ হতে থাকেন। এ সময় উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ডান দিকের রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। অবশেষে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) এর বীরত্বপূর্ণ অবদানের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সে পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পান।

সাহাবীগণের একত্রিত হওয়া :

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রধান প্রধান সাহাবীগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তাঁরা প্রথম কাতারে লড়াই করার কারণে পেছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংবাদ জানা সম্ভব হচ্ছিল না। তারপর যখনই তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এমন সংকটময় অবস্থার কথা অবগত হলেন, তখনই তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একত্রিত হতে শুরু করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর গুজব :

এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গর্তে পড়ে যান। এতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে অনেক সাহাবী মনোবল হারিয়ে ফেলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ﴾

মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয় তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়ে গেছে। অনন্তর যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার প্রদান করবেন। (সূরা আলে ইমরান- ১৪৪)

অবশেষে যখন এহেন চরম পরিস্থিতির অবসান ঘটে তখন মুশরিকরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখছিলেন যে, তারা আবার মদিনায় আক্রমণ করে কি না। অতঃপর যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, তারা আর মদিনার দিকে আসছে না, তখন তিনি সাহাবীগণকে নিয়ে মদিনায় ফেরত আসলেন।

ফলাফল :

এ যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্তভাবে জয় লাভ করতে পারেনি। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। সে সময় তাদের মধ্য হতে ৭০ জন মতান্তরে ৭৪ জন শহীদ হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে কুরাইশদের মধ্য হতে ২২ জন মতান্তরে ২৭ জন লোক নিহত হয়েছিল।

উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী অভিযান

উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের এমন অপ্রত্যাশিত দুরবস্থা তাদের শক্তি-সামর্থ ও প্রভাব বিস্তারের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বদর যুদ্ধের পর এতদিন পর্যন্ত যারা মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করতে কোন সাহস পাচ্ছিল না, এ যুদ্ধের পর তাদের অন্তরে সাহস সৃষ্টি হয়। ফলে তারা মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত। নিম্নে এমনই কিছু প্রতিক্রিয়া এবং এর বিরুদ্ধে মুসলিমদের অভিযানসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. আবু সালামার অভিযান :

উহুদ যুদ্ধের পর অনেক শত্রুই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সর্বপ্রথম তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে বনু আসাদ বিন খোযায়মা গোত্রের লোকেরা। তাদের মধ্যে তালহা ও সালামা নামক দুই ব্যক্তি তাদের দলবল নিয়ে বনু আসাদ বিন খোযায়মা গোত্রের লোকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত করতে থাকে। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পৌছলে তিনি সাথে সাথেই আবু সালামা (রাঃ) এর নেতৃত্বে ১৫০ জন সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে মুসলিমরা তাদেরকে দ্রুত অতর্কিত আক্রমণ করলে তারা পালিয়ে যায়। তারপর তাদের ফেলে যাওয়া গনীমত নিয়ে মুসলিমগণ মদিনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরী ৪র্থ বর্ষের মুহাররম মাসে। এর কিছু দিন পরেই আবু সালামা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

২. রাজীর ঘটনা :

এ ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরী ৪র্থ বর্ষের সফর মাসে। ঘটনাটি ছিল মুসলিমদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক। কেননা এ সময় কিছু মুসলিমকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হয়েছিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিম ইবনে সাবিত আনসারী (রাঃ) এর নেতৃত্বে দশজন ব্যক্তির একটি গোয়েন্দাদলকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন। তারা রওয়ানা হয়ে মক্কা এবং উসফানের মাঝামাঝি 'হাদাত' নামক স্থানে পৌছলে বনু লিহইয়ান নামক হুযাইল সম্প্রদায়ের একটি শাখা তা জানতে পারে এবং প্রায় দু'শত সুদক্ষ তীরন্দাজের একটি দল তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে পাঠায়। তারা পদচিহ্ন ধরে চলতে থাকে। মদিনা থেকে পথের সম্বল হিসেবে সাহাবীগণ যে খেজুর নিয়ে এসেছিলেন তার উচ্ছিষ্ট দেখতে পেয়ে তারা বলে উঠল, এতো ইয়াসরিবেরই খেজুর দেখছি! অতঃপর তারা উক্ত পদচিহ্ন ধরেই অগ্রসর হতে থাকে।

অতঃপর আসিম এবং তাঁর সাথিগণ তাদেরকে দেখে একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন। এমতাবস্থায় বনু লিহইয়ান সম্প্রদায়ের লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে। অতঃপর তারা আসিম এবং তাঁর সাথিদেরকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, তোমরা অবতরণ করে আত্মসমর্পণ করো। আমরা অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের একজনকেও আমরা হত্যা করব না। (তা শুনে) গোয়েন্দাদলের নেতা আসিম ইবনে সাবিত (রাঃ) বললেন, আল্লাহর ক্বসম! কাফিরের প্রদত্ত নিরাপত্তায় কখনো আমি (পাহাড় থেকে) নামব না। এ সময় তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে এ সংবাদটি তোমার নবী ﷺ-কে জানিয়ে দাও।

অতঃপর কাফিররা তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকারী সাতজনসহ আসিম ইবনে সাবিত (রাঃ)-কেও হত্যা করে ফেলল। অবশিষ্ট তিনজন কাফিরদের প্রদত্ত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে পাহাড় থেকে নেমে আসলেন। এ তিনজন হলেন, খুবাইব আনসারী, ইবনে দাসিনা এবং অপর একজন লোক (সাহাবী)।

তারপর কাফিররা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে ধনুকের রশি খুলে তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। এটা দেখে তৃতীয় জন বললেন, এটা তো গোড়াতেই বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। তাদের নীতিই অনুসরণযোগ্য ছিল যারা শহীদ হয়ে গেছে। কাফিররা তাঁকে সাথে নেয়ার জন্য টানাটানি করতে লাগল। কিন্তু তাতে তিনি রাজি না হওয়ায় তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল এবং খুবাইব ও ইবনে দাসিনা (রাঃ)-কে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দিল। এ ঘটনা বদর যুদ্ধের পরে হয়েছিল।

খুবাইব (রাঃ) যেহেতু বদর যুদ্ধে হারিস ইবনে আমিরকে হত্যা করেছিলেন এজন্য হারিস ইবনে আমির ইবনে নাওফাল ইবনে আবদে মানাফের সম্প্রদায় (প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য) খুবাইব (রাঃ)-কে ক্রয় করে নিল। সুতরাং খুবাইব (রাঃ) তাদের সম্প্রদায়ে বন্দী হিসেবে থেকে গেলেন।

বর্ণনাকারী যুহরী বলেন, আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে আয়ায জানিয়েছেন যে, হারিসের মেয়ে তাকে জানিয়েছেন, সম্প্রদায়ের সকলেই তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি (খুবাইব) লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করার জন্য তার (হারিসের মেয়ের) কাছে একখানা ক্ষুর চাইলে সে তা দিল। হারিসের মেয়ে বলেন, আমার অজ্ঞতার কারণে আমার একটি ছেলে তার নিকট চলে গেলে তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন। আমি দেখলাম তিনি ক্ষুরখানা হাতে রেখে ছেলেটাকে তার উরুর উপর বসিয়ে রেখেছেন। আমি অত্যন্ত ভয় পেলাম, খুবাইব আমার চেহারা দেখেই তা বুঝতে সক্ষম হলেন। তাই তিনি বললেন, তুমি কি ভয় করছ যে, আমি তাকে হত্যা করব? আমি কখনই তা করব না।

হারিসের কন্যা বলেন, আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের চেয়ে ভালো বন্দী আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহর কসম! একদিন আমি তাকে লোহার শিকলে বন্দী থাকাবস্থায় আঙ্গুরের ছড়া হাতে নিয়ে খেতে দেখেছি। অথচ মক্কায় সে সময় কোন ফল ছিল না। সুতরাং ওগুলো ছিল আল্লাহর কাছ থেকে খুবাইবের জন্য প্রেরিত রিযিক।

এরপর যখন সবাই তাকে হত্যা করার জন্য হেরেমের বাইরে নিয়ে চলল, তখন খুবাইব তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাক'আত নামায পড়তে দাও। তারা সুযোগ দিলে তিনি দু'রাক'আত নামায আদায় করে বললেন, যদি তোমরা এ ধারণা করবে বলে আমি মনে না করতাম যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত ও অধৈর্য হয়ে পড়েছি, তাহলে আমি নামায আরও দীর্ঘ করতাম। (তারপর তিনি আবেগ উদ্বেলিত হয়ে বললেন) হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে এক এক করে গুণে গুণে হত্যা করো! তারপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় মুসলিম হিসেবে শাহাদাত বরণ করতে তৈরি হচ্ছি। তাই মরণের পর আমি যে পাশেই লুটিয়ে পড়ি না কেন, তাতে আমার কোন আক্ষেপ নেই। আর এ সবকিছু একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বরণ করে নিচ্ছি। তাই তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে দেহের খণ্ডিত প্রতি অংশেই বরকত প্রদান করবেন। এরপর হারিসের ছেলে তাঁকে শহীদ করল। আর এভাবে প্রত্যেক মুসলিম বন্দীর জন্য খুবাইব (রাঃ) দু'রাক'আত নামায আদায়ের সুন্নত (নিয়ম) প্রবর্তন করে গেছেন।

এদিকে আল্লাহ তা'আলা আসিম ইবনে সাবিত (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার সময়ের প্রার্থনা কবুল করে নিলেন এবং তাঁর সংবাদ নবী ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন। যেদিন তাঁদেরকে শহীদ করা হয় সেদিনই তিনি সাহাবীদের তা জানালেন। আসিমের শাহাদাতের খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে তাদের কিছু লোক তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর দেহের কিছু অংশ কেটে আনার উদ্দেশ্যে লোক পাঠাল। কেননা তিনি বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আসিমের মৃতদেহের চারদিকে মৌমাছির ঝাঁক মেঘমালার মতো ঘিরে রেখে কুরাইশদের পাঠানো ব্যক্তিদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করল। সুতরাং তারা তাঁর শরীরের কোন অংশই কেটে নিতে পারল না।[৭৫]

৩. বিরে মাউনার ঘটনা :

রাজীর ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পর একই মাসে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। এটি ছিল পূর্বের ঘটনা থেকে আরো মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, একদা নজদ অঞ্চল থেকে আবু বারায়া আমের বিন

---

[৭৫] সহীহ বুখারী, হা/৩০৪৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৯১৫।

মালেক নামক এক ব্যক্তি মদিনায় আগমন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আশ্বাস দিয়ে এ কথা বলল যে, যদি আপনি নজদবাসীদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে প্রেরণ করেন, তাহলে তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করে নিতে পারে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে মুনযির বিন আমের (রাঃ)-কে নেতা বানিয়ে ৭০ জন সাহাবীকে তাঁর সাথে প্রেরণ করেন। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিজ্ঞ ক্বারী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী।

অতঃপর যখন তাঁরা বিরে মাউনার নিকট গিয়ে পৌছেন, তখন সেখানে তাঁরা শিবির স্থাপন করেন। এখান থেকে তাঁরা দাওয়াত দিতে গেলে শত্রুবাহিনীর আক্রমণের শিকার হন। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁদেরকেও শত্রুদের সাথে লড়তে হয়। এতে একজন ব্যতীত সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিমদের মধ্য থেকে কেবল কা'ব বিন যায়েদ (রাঃ)-ই ফিরে আসতে পেরেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনাটি জানতে পেরে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। ফলে তিনি এক মাস পর্যন্ত রাইল, যাকওয়ান, লেহইয়ান এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে বদদু'আ করেন।[৭৬]

৪. বনু নাযীরের যুদ্ধ :

বনু নাযীর হচ্ছে মদিনায় বসবাসরত একটি ইয়াহুদি সম্প্রদায়। এরা মদিনা সনদের মাধ্যমে বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে শত্রুতা এদের মনে পুরোপুরিভাবেই বিদ্যমান ছিল। তারা মুসলিমদের একের পর এক বিজয় প্রত্যক্ষ করে খুবই হিংসুক হয়ে উঠে। উপরন্তু তাদের জাতি ভাই বনু কাইনুকাকে বহিষ্কার এবং ক'াব বিন আশরাফকে হত্যার ফলে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এরপর যখন উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের সামান্য দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তখন তাদের অন্তরের সেসব প্রতিহিংসা আবারো জেগে উঠতে থাকে এবং মুসলিমদের সাথে নানা ধরনের অশোভনীয় আচরণ শুরু করে দেয়। এরই মধ্যে ভুলবশত একজন মুসলিম কর্তৃক তাদের গোত্রের দু'জন লোক নিহত হয়। ফলে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমর (রাঃ) সহ আরো কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে এদের রক্তপণ প্রদানের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য তাদের মহল্লায় গমন করেন। আলোচনা শেষে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেখানে বসতে বলে প্রয়োজন পূরণ করার বাহানায় সেখান থেকে চলে যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানকার একটি বাড়ির সাথে গা লাগিয়ে বসে পড়েন এবং তাদের ওয়াদা পূরণের অপেক্ষা করেন।

---

[৭৬] সহীহ বুখারী, হা/৪৫৬০; সহীহ মুসলিম, হা/৬৯৫; আবু দাউদ, হা/১৪৪২; নাসাঈ, হা/১০৭৩।

এদিকে তারা সেখান থেকে চলে এসে এক ভয়ানক চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কয়েকজন সাহাবীকে একা পেয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে তাদের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ সেখান থেকে উঠে খুব দ্রুত মদিনায় ফিরে আসেন। এদিকে অবশিষ্ট সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফিরে আসতে না দেখে তারাও মদিনায় ফেরত এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মিলিত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সবকিছু বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

এ ঘটনার পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ)-কে দিয়ে বনু নাযীরকে এ সংবাদ পাঠান যে, তারা যেন আগামী ১০ দিনের মধ্যে মদিনা থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যায়। মুসলিমদের সাথে তারা আর মদিনায় বসবাস করতে পারবে না। এরপর যদি মদিনায় কোন ইয়াহুদিকে পাওয়া যায়, তাহলে তার গ্রীবা কেটে দেয়া হবে। এ নির্দেশের পর থেকে বনু নাযীরের জন্য মদিনা ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় অবশিষ্ট থাকল না। ফলে তারা সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েও নিচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়।

এদিকে নির্ধারিত দিন শেষ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদিনার প্রশাসনের দায়িত্ব দিয়ে সাহাবীদেরকে নিয়ে বনু নাযীরের মহল্লায় উপস্থিত হন। এ সময় তারা সকলে তাদের দুর্গে অবস্থান নেয়। ফলে মুসলিম বাহিনী সেই দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। তারপর তারা দুর্গের ভেতর থেকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর প্রতিশ্রুতি পূরণের আশায় বসে থাকে। কিন্তু সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ফলে তারা একেবারেই একা হয়ে যায়।

অবশেষে তারা মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা অবরোধের ৬ষ্ঠ মতান্তরে ১৫ তম দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এ আবেদন করে যে, তারা মদিনা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুত রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং এ নির্দেশ দেন যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্যান্য যেসব দ্রব্য তারা উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তা নিয়ে যাবে। পরিবার-পরিজনও তাদের সাথে নিয়ে যেতে পারবে।

এ স্বীকৃতির পর বনু নাযীর গোত্রের লোকেরা অস্ত্র সমর্পণ করে। শর্ত অনুযায়ী উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার মতো সম্পদ সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হয়ে যায়। এ সময় তাদের অধিকাংশই খায়বারের দিকে রওয়ানা হয়, আবার অনেকেই সিরিয়ার দিকে চলে যায়।

অতঃপর তারা চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের অস্ত্রশস্ত্র, জমিজমা ও বাড়িঘর নিজ অধিকারভুক্ত করে নেন। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল ৫০টি লৌহবর্ম, ৫০টি শিরস্ত্রান এবং ৩৪০টি তরবারি।

এ ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরী ৪র্থ বর্ষের রবিউল আওয়াল মাস মোতাবেক ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে।

৫. দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ :

উহুদ যুদ্ধের দিন কোন চূড়ান্ত ফলাফল না নিয়ে যখন আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন সে পুনরায় বদরের প্রান্তরে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছিল, আগামী বছর বদরে আবার যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা থাকল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন সাহাবীকে বললেন, তুমি তাকে বলে দাও যে, ঠিক আছে। এখন আমাদের ও তোমাদের মাঝে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল।

অতঃপর উহুদ যুদ্ধের এ প্রতিজ্ঞাকে সামনে রেখেই উভয় পক্ষ প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এ লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরী ৪র্থ বর্ষের শা'বান মাস মোতাবেক ৬২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মদিনার দায়িত্ব আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এর উপর ন্যস্ত করে ১৫০০ সাহাবী নিয়ে আবারো বদর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সে সময় তাঁদের মধ্যে ৫০ জন অশ্বারোহীও ছিলেন।

অপরপক্ষে আবু সুফিয়ান ৫০ জন অশ্বারোহীসহ ২০০০ মুশরিক সৈন্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। অতঃপর তারা 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছে 'মাজিন্নাহ' নামক প্রসিদ্ধ ঝর্ণার নিকট শিবির স্থাপন করে। সেখানে পৌঁছার পর থেকে আবু সুফিয়ানসহ বাহিনীর অধিকাংশ লোক তাদের মনোবল হারিয়ে ফেলতে থাকে। অবশেষে তারা নিরুৎসাহিত হয়ে আর অগ্রসর না হয়ে মক্কায় ফিরে আসে।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর প্রান্তরে পৌঁছে শত্রুবাহিনীর জন্য আট দিন অপেক্ষা করে মদিনায় ফিরে আসেন।

আহযাবের যুদ্ধ

'আহযাব' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'হিযবুন'। যার অর্থ হচ্ছে বাহিনী বা দল। যেহেতু এ যুদ্ধে বিভিন্ন গোত্রের শত্রু বাহিনী একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাই এটা আহযাবের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধের অপর নাম হলো খন্দক বা পরিখা খননের যুদ্ধ।

আহযাবের যুদ্ধ হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশসহ সকল শত্রু বাহিনীর সমন্বিত অভিযান। এ যুদ্ধে মুসলিমদের সকল শত্রু একত্রিত হয়েছিল এবং তারা এর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল।

এদিকে যেসব ইয়াহুদিরা মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে খায়বার ও অন্যান্য এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল, তারা ক্রমাগতভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশ, বনু গাতফানসহ অন্যান্য জাতিকে উৎসাহ ও আশ্বস্ত করতে লাগল।

সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ও মদিনার অভিমুখে যাত্রা :

এ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সর্বপ্রথম ঐক্যমত পোষণ করেছিল কুরাইশ ও বনু গাতফান গোত্র। পরবর্তীতে ইয়াহুদিদের প্রচেষ্টায় আরো বড় বড় গোত্র এতে এসে যোগ দেয়। অতঃপর নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী দক্ষিণ দিক থেকে কুরাইশ, কেনানা এবং তেহামায় বসবাসরত দ্বিতীয় হালিফ (চুক্তিবদ্ধ) গোত্রসমূহ মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এদের সংখ্যা ছিল ৪০০০ এবং এর সার্বিক দায়িত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। এ বাহিনী মাররুয যাহরান গিয়ে পৌঁছলে বনু সোলাইম এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। ঐ সময় পূর্বদিক থেকে গাতফানী গোত্রসমূহ ফাযারা, মুররাহ এবং আশজা রওয়ানা হয়। ফাযারার নেতৃত্বে ছিল উয়াইনা বিন হিসন, বনু মুররাহ এর নেতৃত্বে ছিল হারিস বিন আউফ এবং আশজা গোত্রের নেতৃত্বে ছিল মিসআর বিন রাখিলা। তাদের নেতৃত্বে বনু আসাদ এবং অন্যান্য গোত্রের অনেক লোকজনও এসেছিল। এসব গোত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় এবং নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মদিনার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। যার কারণে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মদিনার আশেপাশে ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটে।

মুসলিমদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা :

এদিকে মুসলিমরাও ছিলেন অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চারদিকের অবস্থা খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। কাজেই কাফিরদের এই বিশাল সম্মিলিত বাহিনী যখন মদিনার অভিমুখে রওয়ানা দেয়ার জন্য সচেষ্ট হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথেই গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে যান। ফলে তিনি সাথে সাথেই নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সাথে একটি বৈঠকে একত্রিত হন এবং আগত যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ করেন। এমন সময় সালমান ফারসী (রাঃ) একটি অভিনব প্রস্তাব পেশ করেন, যা ইতিপূর্বে আরবের কোন যুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়নি। সুতরাং সকলেই এ ধরনের কৌশল সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। প্রস্তাবটি এভাবে উপাস্থাপন করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! পারস্যে যখন আমাদেরকে অবরোধ করা হতো, তখন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থান খনন করে নিতাম। সালমান ফারসী (রাঃ) এর এ প্রস্তাবটি উপস্থাপনের সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তা গ্রহণ করে নেন। অতঃপর এ সভায় তিনি প্রতি ১০ জনের উপর ৪০ হাত পরিখা খনন করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথেই

মুসলিমগণ অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে পরিখা খননের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি নবী ﷺ নিজেও এ কাজে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। মদিনার উত্তর দিক ছাড়া বাকি তিন দিকই ছিল পাহাড়-পর্বত ও খেজুর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং একমাত্র উত্তর দিক থেকেই শত্রুদের আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। তাই মুসলিমগণ সে দিক দিয়ে পরিখা খনন করে মদিনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং সাল'আ পর্বতকে পেছনে রেখে শিবির স্থাপন করলেন। আর তাঁদের সামনেই ছিল পরিখা তথা খন্দক, যা শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

সম্মিলিত বাহিনীর গতি রোধ :

মুসলিমগণ একটানা কয়েক দিন কঠোর পরিশ্রম করে কাফির সৈন্যদল মদিনায় প্রবেশ করার পূর্বেই পরিখা খননের কাজ শেষ করেন। ফলে যখন সম্মিলিত বাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে একত্রিত হয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হলো, তখন তারা এসব পরিখার সম্মুখীন হয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। কেননা এটি ভেদ করা তাদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। এতে মুশরিকদের ক্রোধ কেবল বৃদ্ধিই পেতে থাকে এবং এটা পার হওয়ার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। আর মুসলিম বাহিনীও সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন, যাতে শত্রুবাহিনী কোনভাবেই এর নিকটবর্তী না হতে পারে। এজন্য তাঁরা মাঝে মাঝে তীর নিক্ষেপ করছিলেন।

অবশেষে সম্মিলিত বাহিনী মদিনাবাসীকে কেবল অবরোধ করে রাখতেই বাধ্য হয়। কিন্তু পরক্ষণেই এ ধরনের অনির্দিষ্টকালের অবরোধের কারণে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ফলে অনেকের কাছে যুদ্ধের স্পৃহা হ্রাস পেতে থাকে।

আল্লাহর সাহায্য :

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুসলিমদের উপর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। প্রথমে তিনি মুশরিকদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে দেন এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেন। তারপর তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ুর তুফান প্রেরণ করেন। যার কারণে তাদের তাবু উপড়ে যায়, তাদের পাত্রসমূহ উল্টে যায় এবং তাদের শিবির তছনছ হয়ে যায়। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের একটি দল প্রেরণ করে তাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে দেন। ফলে তারা প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়।

ফলাফল :

এ যুদ্ধে মুসলিমরা কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই জয় লাভ করেন। এরপর থেকে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায় এবং আরবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আধিপত্য প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, এখন থেকে আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আমরাই ওদের দিকে সৈন্য পরিচালনা করব।[৭৭] আর বাস্তবেও তাই হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধটি হিজরী ৫ম বর্ষের শাওয়াল মাস থেকে যিলকদ মাস পর্যন্ত প্রায় এক মাস স্থায়ী ছিল।

বনু কুরাইযার যুদ্ধ

বনু কুরাইযা ছিল মদিনায় বসবাসরত তিনটি ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বশেষ সম্প্রদায়। মদিনায় বসবাস করার কারণে খন্দকের যুদ্ধেও তাদেরকে কিছু দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা সেসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে শত্রুবাহিনীদেরকেই সহযোগিতা করে এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন।

আক্রমণের নির্দেশ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দক যুদ্ধ থেকে সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করে উম্মে সালামা (রাঃ) এর গৃহে গোসল করছিলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন, আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন? উঠুন এবং সাহাবীদেরকে নিয়ে বনু কুরাইযার অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকুন। আমি সবার আগে গিয়ে তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে দেব।

বনু কুরাইযা আক্রমণ :

জিবরাঈল (আঃ) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এসব কথা বলছিলেন, তখন ছিল যোহরের সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব কথা শোনার পর একদল সাহাবীকে বনু কুরাইযায় গিয়ে আসরের নামায পড়ার নির্দেশ দেন এবং আসরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে মাকতুম (রাঃ)-কে মদিনার দায়িত্ব দিয়ে বনু কুরাইযার দিকে রওয়ানা হয়ে যান। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যাত্রার সংবাদ পেয়ে অন্যান্য মুসলিমগণ যোগ দিতে থাকেন। অতঃপর তাঁরা যখন বনু কুরাইযার মহল্লায় প্রবেশ করলেন তখন বনু কুরাইযার লোকেরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাদের দুর্গে প্রবেশ করে।

[৭৭] সহীহ বুখারী, হা/৪১১০; মিশকাত, হা/৫৮৭৯।

বনু কুরাইযার আত্মসমর্পণ :

বনু কুরাইযার লোকেরা যখন দেখল যে, তারা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে এবং প্রায় ২৫ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, তখন আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পেল না। এদিকে যখন আলী (রাঃ) তাদের দুর্গের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করেন, তখন তারা দিশেহারা হয়ে নিজেদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার প্রতিজ্ঞা করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পুরুষদেরকে বন্দী করে ফেলেন এবং মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে পৃথকভাবে রাখেন।

সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) এর ফায়সালা :

বনু কুরাইযার এহেন পরিণতির কথা চিন্তা করে আনসারদের মধ্য থেকে আউস গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের সাথে ইনসাফ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-কে তাদের বিচারক মানার জন্য প্রস্তাব দেন। তখন তারা সবাই এতে রাজি হয়ে গেল। এতে তারা মনে করেছিল যে, হয়তোবা তাদের উপর শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে।

সে সময় সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) খন্দক যুদ্ধে সামান্য আহত হওয়ার কারণে মদিনায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর তাকে ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে এ নির্দেশ দেন যে, পুরুষদের হত্যা করা হোক, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হোক এবং তাদের সম্পদসমূহ বণ্টন করে দেয়া হোক।

এ রায় শোনার পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের ব্যাপারে ঠিক সেই বিচারই করেছ, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর থেকে করে দিয়েছেন। অতঃপর বনু কুরাইযার উপর এ রায়টি বাস্তবায়ন করা হয়।

বনু মুস্তালিক অভিযান

এ অভিযানটি পরিচালিত হয় হিজরী ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ বর্ষের শা'বান মাসে। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন যে, বনু মুস্তালিকের সরদার হারিস বিন আবু জাররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকজনকে একত্রিত করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে একটি বাহিনী নিয়ে সেখানে গমন করেন। এ অভিযানে মুনাফিকদের একটি দলও অংশগ্রহণ করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহিনী নিয়ে তাদের উপর অতর্কিত হামলা করেন। ফলে তারা পালিয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করেন এবং তাদের ধনসম্পদসমূহ গনীমত হিসেবে নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেন।

ইফকের ঘটনা

এ ঘটনাটি ঘটেছিল বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর ঘটনা, যার মূল হোতা ছিল মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। ঘটনাটি হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি সফরে বের হতেন, তখন লটারীর সাহায্যে মীমাংসা করতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সঙ্গী হবেন। এ যুদ্ধে লটারী করার সময় আমার নাম উঠে। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বের হলাম, এটা ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তীকালের ঘটনা।

নিয়ম ছিল এমন যে, চলার সময় আমি আমার নিজের 'হাওদাজে' (পালকীর মতো) বসে যেতাম। যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকট পৌছলাম এবং কিছু সময় সেখানে অবস্থান করলাম। অতঃপর রাতেই সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন। যখন বাহিনীকে বাড়ি ফেরার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমি ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে সৈন্যদের (ছাউনি) ছেড়ে বাইরে গেলাম। আমি প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে আমার 'হাওদাজে' ফিরে এলাম। কিন্তু আমি দেখলাম আমার 'জাজ আজফা' এর তৈরি গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছে। আমি তা সন্ধান করতে যাওয়ায় পেছনে পরে গেলাম। নিয়ম ছিল এমন যে, চলে যাওয়ার সময় আমি আমার নিজের হাওদাজে বসে যেতাম এবং লোকেরা তা উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। তারা এসে আমার 'হাওদাজ' উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিল, তারা ধারণা করল যে, আমি তাতে বসা আছি। এ সময় খাদ্যের অভাবের জন্য আমরা মহিলারা ছিলাম বড়ই হালকা এবং কম ওজন বিশিষ্ট। তখন এমনিতেই আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা এবং হালকা। সুতরাং লোকেরা 'হাওদাজ' উঠাবার সময় আমি আছি কি না তা বুঝতেও পারেনি। তারা অজ্ঞাতস্থানে উট হাঁকিয়ে চলে গেল। পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম, সেখানে কাউকে পেলাম না। আমি চিন্তা করলাম, যখন কিছু দূর গিয়ে আমাকে পাবে না, তখন তারা আমাকে সন্ধান করতে ফিরে আসবে। অতঃপর আমি নিজ জায়গায় বসে পড়লাম, আমাকে নিদ্রায় পেয়ে বসল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

এদিকে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল আস-সুলাইমী আয-যাকওয়ানী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল। সে রাতের শেষভাগে রওয়ানা দিয়ে সকালবেলা আমার স্থানে এসে পৌছল এবং একজন ঘুমন্ত লোককে দেখতে পেল। সে আমার নিকট আসলো এবং আমাকে দেখে চিনতে পারল, কারণ

পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে সে আমাকে দেখেছিল। তার "ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জি'উন" উচ্চারণ শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, যা সে আমাকে চিনতে পেরে (বিস্ময়ের) সাথে বলেছিল। তখন আমি আমার চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেললাম। সে "ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রাজি'উন" ছাড়া একটি শব্দও উচ্চারণ করল না; এমনকি তার উষ্ট্রী এনে আমার নিকট হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল ও সম্মুখের দু'পা নুইয়ে দিল এবং আমি তাতে আরোহণ করলাম। তখন সাফওয়ান আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলো এবং সে উটের লাগাম ধরে হেঁটে চলল। উট আমাকে বহন করে নিয়ে চলছিল, যতক্ষণ না আমরা সৈন্যদের নিকট গিয়ে পৌছলাম, যে সময় তারা দুপুরের প্রচণ্ড গরমের কারণে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

আর যারা এ ধরনের অপবাদমূলক ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে প্রস্তুত তারা তাতেই লিপ্ত হলো। এ ব্যাপারে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলই ছিল অগ্রসর। সে ছিল, এ ঘটনার মূল হোতা। এরপর আমরা মদিনায় পৌছলাম এবং আমি দীর্ঘ এক মাসের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলাম। এ সময় ইফকে অংশগ্রহণকারীরা মিথ্যা অপবাদের সংবাদ জনগণের কাছে রটিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি এ সবের কিছুই জানতে পারিনি। একটা জিনিস অবশ্য আমার মনে লাগছিল, তা হচ্ছে এই যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরকম স্নেহ-ভালোবাসা দেখাতেন, এবারে তিনি আমার প্রতি তেমন মমতা দেখাচ্ছেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসতেন, সালাম করতেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করতেন, "সে এখন কেমন আছে?" এরপরে চলে যেতেন। এতে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছু ঘটেছে হয়তো। কিন্তু আমি সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত এ সমস্ত মিথ্যা অপবাদ রটানোর ব্যাপারে কিছুই জানতে পারিনি।

একদা উম্মে মিসতাহ এর সাথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য "আল-মানাসি" নামক স্থানে গেলাম। সে সময় পর্যন্ত আমাদের সব ঘরে টয়লেট তৈরি হয়নি। সুতরাং আমি উম্মে মিসতাহ এর সঙ্গে বাইরে গেলাম। সে ছিল আবি রুহম বিন আবদে মানাফের কন্যা। আর তার মা ছিল সাখর বিন আমিরের কন্যা এবং এ ব্যক্তি ছিল আবু বকর (রাঃ) এর খালু। আর তার পুত্র ছিল মিসতাহ ইবনে উসামা। যখন আমরা আমাদের কাজ শেষ করলাম, উম্মে মিসতাহ এবং আমি আমাদের ঘরের নিকট ফিরে এলাম। পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ আঘাত পেলো এবং সহসা তার মুখ হতে বের হলো, মিসতাহ ধ্বংস হোক! তখন আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা উচ্চারণ করলে! তুমি এমন একটি লোককে গালি দিচ্ছ, যে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে! সে বলল,

হায় কী অচেতন! তুমি কোথায়? তুমি শোননি সে কী বলেছে? আমি বললাম, সে কী বলেছে? তখন সে (উম্মে মিসতাহ) ইফকের ঘটনা রটনাকারীরা যা বলে বেড়াচ্ছে তা খুলে বলল- যা আমার অসুস্থতাকে আরো বৃদ্ধি করল। যখন আমি ঘরে ফিরে এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং সালাম করার পর প্রশ্ন করলেন, সে কেমন আছে? আমি বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যেতে অনুমতি দেবেন? তখন আমি তাদের কাছ থেকে এ সংবাদ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতামাতার কাছে চলে গেলাম। অতঃপর বাড়িতে গিয়ে মাকে প্রশ্ন করলাম, আম্মা! লোকেরা এগুলো কী বলাবলি করছে? আমার আম্মা বললেন, কন্যা! এটাকে হালকাভাবে গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম! এমন কোন সুন্দরী নারী নেই, যাকে তার স্বামী ভালবাসে না এবং যার অন্য স্ত্রীরা তার খুঁত বের করার চেষ্টা করে না; (এর বিপরীত) ঘটনা খুব কমই (ঘটে)। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! সত্যই কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে? আমি সেই রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। না কখনও আমি কান্না থামাতে পেরেছি, না ঘুমাতে পেরেছি। এমনকি ভোরের সূর্য উদয় হয়েছে এবং তখনও আমি কাঁদছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে ডাকলেন। উসামা ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর স্ত্রীর পবিত্রতা হওয়া সম্পর্কে যা জানেন তাই বললেন এবং তার উপর তাঁর যে ভালোবাসা রয়েছে, তাও উল্লেখ করলেন। উসামা ইবনে যায়েদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার স্ত্রী এবং তার মধ্যে আমি ভাল ব্যতীত কখনও মন্দ কোন কিছু দেখতে পাইনি। কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার প্রতি কোন পথ সংকীর্ণ করেননি এবং আমাদের সমাজে তিনি ব্যতীত অসংখ্য মহিলা রয়েছে। আর আসল অবস্থা জানতে চাইলে (তার) দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে। আয়েশা (রাঃ) আরো বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে বারীরা! তুমি কি কখনও এমন কিছু দেখেছ, যা তোমার মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে? বারীরা বলল, আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ (নবী হিসেবে) পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে মন্দ কিছু দেখিনি যে, তার ব্যাপারে আপনাকে আপত্তি করা যেতে পারে। তবে দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, সে একটি অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র; সে কখনও কখনও পরিবারের আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়ত আর ছাগল এসে তা ভক্ষণ করত।

অতঃপর নবী ﷺ উঠলেন এবং লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, কে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে বসে থাকাবস্থায় আরো বললেন, হে মুসলিমগণ! তোমাদের মধ্যে কে এমন আছ? যে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে; তার আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারবে? আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে ভাল ব্যতীত কিছুই দেখতে পাইনি এবং লোকেরা এমন একটি লোককে (সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তালকে) দোষী করেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত কিছুই জানি না এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে আসেনি। এ কথা শুনে সা'দ ইবনে মুয়ায আল-আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! অপবাদ দানকারী যদি আওস সম্প্রদায়ের লোক হয় তবে তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে এ কষ্ট থেকে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব। আর সে যদি আমাদের ভাই খাযরাজ কবীলার লোক হয়, তবে আপনি যা বলবেন তাই করব। এ কথা শুনে সা'দ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন, যিনি ছিলেন খাযরাজ সম্প্রদায়ের প্রধান। তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এ সময় তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-কে বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করবে না এবং তুমি কখনও তাকে হত্যা করতে পারবে না। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে সা'দ ইবনে মুয়ায এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনে হুযাইর দাঁড়াল এবং সা'দ ইবনে উবাদাকে বলল, তুমি একজন মিথ্যাবাদী! চিরন্তন আল্লাহর শপথ! আমরা নিশ্চয় তাকে হত্যা করব। তুমি মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষে কথা বলছ। সুতরাং আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, এমনকি তারা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো। অথচ আল্লাহর নবী ﷺ তখনও মিম্বরের উপর দাঁড়ানো ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করলে তারা শান্ত হলো ও চুপ করল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, সেদিন আমি দিনভর কাঁদতেই থাকলাম, না আমার চোখের কান্না থামল আর না আমি ঘুমাতে পারলাম। সকালে আমার পিতামাতা আমার কাছে ছিলেন এবং আমি দু'রাত ও দু'দিন একাধারে কোন ঘুম-নিদ্রা ছাড়াই কেঁদেছিলাম। ফলে তারা ভাবলেন যে, অধিক কান্নার ফলে আমার কলিজা ফেটে যাবে। যখন তারা আমার সঙ্গে ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, তখন জনৈক আনসারী মহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম এবং সে বসেই আমার সাথে কান্না জুড়ে দিল। যখন আমি এ অবস্থায় ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং সালাম করে আসন গ্রহণ করলেন।

এ সমস্ত অপবাদ যখন রটাচ্ছিল তখন হতে তিনি কখনও আমার নিকট বসেননি। এ দীর্ঘ এক মাস তিনি অপেক্ষা করেছেন অথচ আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে বসার পর তাশাহহুদ (কালিমায়ে শাহাদাত) পাঠ করলেন তারপর বললেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার নিকট পৌঁছেছে, তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোন পাপে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে মাফ চাও, তওবা করো। কেননা বান্দা যখন নিজের গুনাহ স্বীকার করে তওবা করে, তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যেন একফোঁটা পানিও অনুভব করছিলাম না।

আমি আমার আব্বা [আবু বকর (রাঃ)]-কে বললাম, আপনি আমার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথার উত্তর দিন, যা কিছু তিনি বলেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বুঝি না, রাসূল ﷺ-কে কী উত্তর দেব। তখন আমি বয়সে বালিকা মাত্র এবং আমার কুরআনের জ্ঞানও ছিল অল্প, তবুও আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি জানি আপনারা যখনই এ ঘটনা শুনেছেন, তখনই তা আপনাদের অন্তরে গেঁথে গিয়েছে এবং বিশ্বাস করে বসেছেন। সুতরাং এখন আমি যদি বলি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি শুধু শুধুই এমন একটা কথা মেনে নেই, যা আমি আদৌ করিনি এবং আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে, আমি দোষের কোন কাজ করিনি, তবে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। এ অবস্থায় ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা [ইয়াকূব (আঃ)] এর উদাহরণ ব্যতীত আর কোন উপায় আমি দেখি না। আমার জন্য একমাত্র পূর্ণ ধৈর্যধারণ করাই উপযুক্ত। আপনারা আমার ব্যাপারে যা কিছু বলছেন, সে ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই কামনা করা উচিত।

এ কথা বলে আমি অপরদিকে পাশ ফিরে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম এবং সে সময় আমি জানতাম যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তখন এ ধারণা আমার অন্তরে কখনও আসেনি যে, আল্লাহ আমার স্বপক্ষে ওহী অবতীর্ণ করবেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত হতে থাকবে। বরং আমি ধারণা করেছিলাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবেন। আল্লাহর শপথ! নবী ﷺ তাঁর স্থান ত্যাগ করেননি এবং আর কেউ তখনও ঘর ছেড়ে বের হননি; এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ওহী নাযিল হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী নাযিলকালীন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন, যা সর্বদা ওহী নাযিলের সময় হতো।

এমনকি যদিও এ সময়টা ছিল কঠিন শীতকাল, তবুও তাঁর দেহ থেকে মুক্তার মতো ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়ছিল। আর এটা ছিল আল্লাহর বাণীর কঠিন বোঝা, যা তাঁর উপর নাযিল হচ্ছিল তার ফল।

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওহীকালীন অবস্থা শেষ হলো, তখন তাঁকে উৎফুল্লচিত্ত দেখা গেল। হাসি সহকারে সর্বপ্রথম যে কথাটি তিনি বললেন, তা ছিল এই যে, হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা তোমার নির্দোষিতার ঘোষণা দিয়েছেন। তখন আমার মা আমাকে বললেন, ওঠো এবং দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করো। আমি বললাম, না- আমি দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করব না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করলেন তা হলো,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِيْنٌ - لَوْلَا جَآءُوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ - وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - إِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ - وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ - يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ - وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَأَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

যেসকল লোক এ মিথ্যা অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদের মধ্যেই কিছু লোক। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য মন্দ মনে করো না, বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণময় হবে। যে লোক এ ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটাই পাপ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে, তার জন্যও অতি বড় আযাব রয়েছে। তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, সে সময়ই মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না কেন? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এ হচ্ছে সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা দোষারোপ? সে লোকেরা চারজন সাক্ষী হাজির করল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর দয়া

যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, তার প্রতিশোধ হিসেবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে পাকড়াও করত। যখন তোমাদের এক মুখ থেকে অন্য মুখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেসব কথাই বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না, তখন তোমরা ওটাকে একটি সাধারণ ব্যাপার মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল অনেক বড় কথা। এটা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না, এমন কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। আল্লাহ মহান ও পাক-পবিত্র। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দেন, ভবিষ্যতে যেন তোমরা এরূপ কাজ আর কখনো না করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়াত দিচ্ছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকৌশলী। যেসব লোক চায় যে, মুমিন লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, তারা ইহকাল ও পরকালে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ-ই জানেন, তোমরা জান না। আল্লাহর দয়া যদি তোমাদের প্রতি না থাকতো, তাহলে (যে বিষয়টি তোমাদের মাঝে ছড়ানো হয়েছিল, তা খুবই নিকৃষ্ট দেখাত) আসল কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বড়ই দয়াবান ও করুণাময়। (সূরা নূর- ১১-২০)

যখন আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এ সকল আয়াত অবতীর্ণ করলেন তখন আবু বকর সিদ্দীক- যিনি মিসতাহ ইবনে উসামাকে আত্মীয়তার খাতিরে এবং তার দারিদ্রতার কারণে আর্থিক সাহায্য করতেন, তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! মিসতাহ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, তার কারণে তাকে ভবিষ্যতে কিছুই দেব না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন,

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থবান, তারা যেন শপথ করে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথে মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা নূর- ২২)

আবু বকর (রাঃ) তৎক্ষণাত বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই চাই যে, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন।

এ অনুযায়ী তিনি আবার মিসতাহকে দান করা শুরু করলেন, যা আগে তিনি করছিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো তার এ সাহায্য বন্ধ করব না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনতে জাহশকেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে যায়নাব! তুমি কী জেনেছ এবং কী দেখেছ? সে জবাব দিল, হে

আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চোখ-কানকে (মিথ্যা বলা থেকে) বাঁচিয়ে রাখতে চাই; আমি তাঁর সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু জানি না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণের মধ্যে যায়নাব আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরহেজগারীর কারণে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর বোন হামনা, তাঁর পক্ষ থেকে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সেও ধ্বংস হয়ে যায়, যেরূপ অন্যান্য অপবাদ রটনাকারীরা ধ্বংস হয়েছিল।[৭৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে জুয়াইরিয়া (রাঃ) এর বিবাহ

বনু মুস্তালিক অভিযানে মহিলা বন্দীদের মধ্যে জুয়াইরিয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিকের নেতা হারিসের কন্যা। বণ্টনের সময় তিনি সাবেত বিন কায়েস (রাঃ) এর অংশে পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হয়ে যাওয়ার শর্তারোপ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে তাকে বিয়ে করেন। এর ফলে মুসলিমগণ বনু মুস্তালিক গোত্রের ১০০ পরিবারের লোকজনকে মুক্ত করে দেন। তারপর তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে প্রচার হয়ে যায় যে, এরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শশুর বংশের লোক।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

হিজরী ৬ষ্ঠ বর্ষের যিলকদ মাস। মদিনার সর্বত্রই তখন শান্তি বিরাজ করছিল। আশেপাশে প্রায় সকলেই আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। ফলে অন্যান্য ছোট ছোট শত্রুদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস ছিল না। তখন মুসলিমগণ যে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখত। তখনও কুরাইশরা মক্কায় আধিপত্য বিরাজ করে যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন। তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করছেন এবং উমরা পালন করছেন। কিছু লোক মাথা মুণ্ডন করছেন এবং কিছু লোক চুল কর্তন করাকেই যথেষ্ট মনে করছেন।

পরের দিন সকালেই স্বপ্নটি রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে অবহিত করলেন। তখন তারা খুবই আনন্দিত হলেন। কেননা তারা এটা জানতেন যে, নবীদের স্বপ্নই এক প্রকার ওহী। সুতরাং এ স্বপ্ন থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, অচিরেই মুসলিমগণ আল্লাহর রহমতে মক্কায় প্রবেশ করবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক তখনই উমরা পালন করার জন্য মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন।

---

[৭৮] সহীহ বুখারী, হা/৪৭৫০।

মক্কা অভিমুখে মুসলিমদের যাত্রা ও কুরাইশদের প্রতিরোধ :

ঐ ঘোষণা দেয়া মাত্রই মদিনা ও পার্শ্ববতী এলাকার লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মক্কায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও পোশাকাদি পরিষ্কার করে প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। অবশেষে তিনি নিজের কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে মক্কার অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) এবং ১৪০০ সাহাবী। এ সময় তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য কেবল কোষবদ্ধ তলোয়ার সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই দিনটি ছিল হিজরী ৬ষ্ঠ বর্ষের যিলকদ মাসের ১ তারিখ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল হুলায়ফা নামক স্থানে গিয়ে কুরবানীর পশুকে হার পরিয়ে দিলেন। তারপর উটের উঁচু জায়গা কেটে চিহ্নিত করে দিলেন এবং সেখানে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধান করলেন। তারপর তিনি কুরাইশদের নিকট এক গোয়েন্দাকে প্রেরণ করে জানতে পারলেন যে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা কাবা ঘরের দিকে এগিয়ে যাবেন। পথিমধ্যে কেউ যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবেন।

ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে কাবা ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, খালিদ বিন ওয়ালীদ ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে কুরাউল গামীম নামক স্থানে প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রা অব্যাহত রাখলেন এবং খালিদ বিন ওয়ালীদের বাহিনীর এত কাছাকাছি চলে আসলেন যে, উভয় দল একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল। এক পর্যায়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ দেখতে পেল যে, মুসলিমরা নামাযের মধ্যে রুকূ-সিজদা করছে। সেটা ছিল যোহরের নামায। সুতরাং খালিদ বিন ওয়ালীদ ফন্দি আটল যে, আসরের নামাযের সময় যখন মুসলিমগণ নামাযরত অবস্থায় থাকবে তখন আক্রমণ চালাবে। কিন্তু তার সে আশা আর পূরণ হলো না; কেননা এরই মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সালাতুল খাওফের বিধান অবতীর্ণ করলেন। ফলে মুসলিমরা আসর নামায থেকেই তা বাস্তবায়ন করা শুরু করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কৌশল অবলম্বন করে পথ পরিবর্তন করে খালিদ বিন ওয়ালীদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা হুদায়বিয়া নামক স্থানের শেষ প্রান্তে শিবির স্থাপন করেন। এদিকে খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসলিমদের উপর আক্রমণ করতে এসে জানতে পারেন যে, মুসলিমদের একটি দল সালাত আদায় করছে; আর আরেকটি দল হুদায়বিয়ার অপর প্রান্তে কা'ব ইবনে লুওয়াই (রাঃ)

এর নেতৃত্বে প্রতিরোধ করার জন্য অপেক্ষা করছে। ফলে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।[৭৯]

কুরাইশদের দূত প্রেরণ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে থাকা অবস্থাতেই কুরাইশরা বারবার দূত পাঠিয়ে মুসলিমদের সংবাদ নিচ্ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বারবার একই প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, যাতে করে কোনভাবেই সংঘর্ষ না হয় এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রস্তাবটি ছিল এই যে, আমরা এখানে কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। অতীতের যুদ্ধসমূহ কুরাইশদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত ও তছনছ করে ফেলেছে। এতে তাদের ক্ষতিও হয়েছে অনেক। তাই যদি তারা চায়, তাহলে আমি তাদের সাথে একটি সময় নির্ধারণ করব, সে সময় তারা আমার ও বিপক্ষীয় লোকজনের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। এতে বড় আকারের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে। অন্যথায় যদি তারা যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে তাদের ঔদ্ধত্যজনিত কৃতকার্যের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর যুদ্ধই যদি তাদের একমাত্র কাম্য হয়ে থাকে, তবে সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীরে আত্মা থাকে কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত ফায়সালা করে না দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রস্তাব শুনে কুরাইশদের অনেক নেতা-ই নমনীয় হয়ে যায় এবং কুরাইশদেরকে সন্ধিচুক্তি করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু এরপরও কিছু যুবক ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করে গণ্ডগোল লাগিয়ে যুদ্ধের জন্য উসকে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু তারা মুসলিম শিবিরের প্রহরীদের পরিচালক মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ) এর হাতে বন্দী হয়ে গেল।

উসমান (রাঃ)-কে দূত হিসেবে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ :

কুরাইশদের দূত প্রেরণের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিন্তা করলেন যে, মুসলিমদের পক্ষ থেকে মক্কায় একটি দূত প্রেরণ করা প্রয়োজন, যাতে সে মক্কাবাসীকে মুসলিমদের উদ্দেশ্যের কথা ভালোভাবে বুঝাতে পারে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রাঃ) এর পরামর্শে উসমান (রাঃ)-কে দূত হিসেবে নির্বাচন করেন। কেননা উসমান (রাঃ) এর হিজরতের পরও তখন পর্যন্ত মক্কায় তার অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তিনি যদি তাদের সাথে কথা বলেন, তাহলে হয়তো তারা সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারবে।

---

[৭৯] আবু দাউদ, হা/১২৩৬।

অতঃপর উসমান (রাঃ) মক্কায় প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনা অনুযায়ী তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। এতে তারাও অনেকটা বিশ্বাস করতে শুরু করছিল। কিন্তু এরপরও তারা মুসলিমদের মনোভাব লক্ষ্য করা এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করার জন্য উসমান (রাঃ)-কে আটকে রাখল।

উসমান (রাঃ)-কে হত্যার গুজব এবং বাই'আতে রিযওয়ান :

এদিকে মুসলিমদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, উসমান (রাঃ)-কে হত্যা করা হয়েছে। অপরদিকে উসমান (রাঃ) এর ফেরত আসতে দেরি দেখে মুসলিমগণ এ গুজবের প্রতি বিশ্বাস করতে থাকেন। ফলে অনেকেই এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মনে মনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে গেলেন এবং যুদ্ধের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। মোটকথা মুসলিম শিবিরে এক ধরনের অস্থির পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সকল সাহাবীকে ডেকে যুদ্ধের জন্য বাই'আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর সকলের বাই'আত শেষ হলে তিনি নিজের ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে বললেন, এটা হচ্ছে উসমানের হাত। ফলে সকলেই উসমান (রাঃ) ফিরে না আসলে যুদ্ধ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে গেল।[৮০]

অবেশেষে উসমান (রাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর মুসলিমরা অনেকটাই শান্ত হয়ে গেলেন। এ অঙ্গীকারটি একটি গাছের নিচে সংঘটিত হয়েছিল। মুসলিমদের এ ধরনের মন-মানসিকতায় আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যার কারণে এ অঙ্গীকারের নাম রাখা হয়েছিল বাই'আতে রিযওয়ান তথা সন্তুষ্টির অঙ্গীকার। এ বাই'আত গ্রহণের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا﴾

(হে রাসূল!) আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বাই'আত প্রদান করেছিল। তাদের অন্তরের অবস্থা তিনি জানেন। তাই তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং পুরস্কার হিসেবে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (সূরা ফাতহ- ১৮)

সন্ধিচুক্তি প্রণয়ন :

অবশেষে কুরাইশরা যখন পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করল, তখন তারা আর দেরি না করে সোহাইল বিন আমরকে সন্ধিচুক্তি করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে প্রেরণ করল। ফলে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

---

[৮০] সহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৬; সহীহ বুখারী, হা/৪১৫৪; মিশকাত, হা/৬২১৯।

সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি প্রণয়ন করল। সন্ধির ধারাসমূহ এই ছিল যে,

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই সাহাবীদেরকে নিয়ে মদিনায় ফেরত যাবেন। অতঃপর তারা আগামী বছর মক্কায় আগমন করবেন এবং সেখানে তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করবেন। এ সময় তারা সঙ্গে করে সফরের প্রয়োজনীয় অস্ত্র নিয়ে আসতে পারবেন। তবে তরবারি সবসময় কোষবদ্ধ রাখবেন। এতে তাদের আগমনে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।[৮১]
২. এ চুক্তিপত্র দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।[৮২]
৩. আরবের যে কোন গোত্র ইচ্ছা করলে এ চুক্তিপত্রের যে কোন পক্ষের সাথে মিত্রতা পোষণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোন গোত্রের উপর অন্যায়-অত্যাচার করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।[৮৩]
৪. কুরাইশদের কোন লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ পালিয়ে মুসলিমদের দলে যোগদান করলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মুসলিমদের কোন লোক যদি আশ্রয় লাভ করার উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে মক্কায় গমন করে তাহলে তারা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।[৮৪]
৫. সন্ধি চলাকালীন সময়ে মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদিনার পথ ধরে সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।

এ সন্ধিপত্রটি রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ)-কে লিখতে বলেছিলেন। তিনি এ মর্মে লিখতে বলেছিলেন যে, লিখো– বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তখন সোহাইল বলল, রহমান বলতে কী বুঝায়, আমরা তা জানি না। সুতরাং আপনি লিখুন যে, বিসমিকা আল্লাহুম্মা অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নামে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ)-কে সেরূপ লিখতে আদেশ করলে তিনি তাই করলেন। তারপর এ কথা লিখতে আদেশ করলেন যে, এগুলো হচ্ছে সেসব কথা, যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাসূল সন্ধি করলেন। তখন সোহাইল বলল, আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে আপনাকে আল্লাহর ঘর থেকে বিরত রাখার কোন কারণই আমাদের ছিল না এবং আপনার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধও করতাম না। সুতরাং আপনি লিখুন যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ এর পক্ষ থেকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ)-কে

[৮১] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৪৮৭২।
[৮২] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৯৩০; আবু দাউদ, হা/২৭৬৬; মিশকাত, হা/৪০৪৬।
[৮৩] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৯৩০।
[৮৪] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩১-৩২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৯৩০।

আল্লাহর রাসূল কথাটি মুছে দিতে বললেন। কিন্তু আলী (রাঃ) কিছুতেই এ ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছিলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ) এর মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে নিজের হাতেই সেটা মুছে দেন। তারপর সম্পূর্ণ চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হয়।

আবু জান্দাল (রাঃ) এর প্রত্যাবর্তন :

তখনও সন্ধিপত্রের কাজ শেষ হয়নি এবং কোন পক্ষই তাতে স্বাক্ষরও করেনি, এমন সময় সোহাইলের পুত্র আবু জান্দাল (রাঃ) শিকল পরিহিত অবস্থায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত হন। উল্লেখ্য যে, আবু জান্দাল (রাঃ) ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; ফলে তার পিতা সোহাইল তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু যখনই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের আগমনের বার্তা শুনলেন তখনই তিনি যে কোন উপায়ে হোক শিকল ভেঙ্গে তাদের কাছে ছুটে আসেন এবং মুসলিমদের দলে শামিল হয়ে যান। তখন সোহাইল বলল, এ আবু জান্দালই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আপনার সঙ্গে মত বিনিময় করেছি যে, আপনি তাকে ফেরত দেবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সোহাইলকে অনেক কিছু বলে আবু জান্দালকে ফেরত দিতে বললেন, কিন্তু সে কিছুতেই তা মেনে নিল না। অতঃপর সোহাইল আবু জান্দাল (রাঃ)-কে চপেটাঘাত করে এবং তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু জান্দালকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে আবু জান্দাল! ধৈর্যধারণ করো এবং এটাকে সওয়াব লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করো। আল্লাহ তা'আলা তোমার এবং তোমার মতো দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য প্রশস্ত আশ্রয়স্থল তৈরি করে রেখেছেন। আমরা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি করেছি এবং আমরা পরস্পরের নিকট অঙ্গীকারাব্দ্ধ হয়েছি। এ কারণে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না।[৮৫] তাই আবু জান্দাল (রাঃ) পিতার সাথে মক্কাতেই থেকে গেলেন।

সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া :

সাহাবীগণ উক্ত সন্ধিচুক্তির কিছু কিছু দফা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। কেননা সেগুলো ছিল একেবারেই মুসলিম স্বার্থ বিরোধী। ফলে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। উপরন্তু আবু জান্দাল (রাঃ)-কে মুশরিকদের হাতে ফেরত প্রদান করাটা তাদেরকে আরো ব্যথিত করে তুলেছিল। এ পর্যায়ে উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং তারা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিরা কি জান্নাতী নয় এবং

[৮৫] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৯৩০।

তাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর (রাঃ) বললেন, তাহলে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দেব এবং ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা এখনো আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনরূপ ফায়সালা করেননি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা কখনো আমাকে ধ্বংস করবেন না।
উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনেও আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। তাই তিনি এসব প্রশ্ন আবু বকর (রাঃ) এর কাছে গিয়ে বললেন। কিন্তু তিনিও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মতো উত্তর প্রদান করলেন।[৮৬]
এভাবেই সাহাবীগণ এ চুক্তির প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে তারা এ সন্ধির মর্ম ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।

কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিজ নিজ পশু সেখানেই কুরবানী দিতে বললেন; কিন্তু সাহাবীগণ এতই ব্যথিত হয়েছিলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা পর্যন্ত কর্ণপাত করতে পারছিলেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বার পর্যন্ত নির্দেশ করেন, কিন্তু এতেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা (রাঃ) এর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তখন তিনি পরামর্শ দেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি চান যে, সকলে নিজ নিজ পশু কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করুক, তাহলে আর কাউকে কিছু না বলে নিজ পশু যবেহ করুন এবং হাজ্জাম (নাপিত)-কে ডেকে মাথা মুণ্ডন করে নিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা-ই করলেন। ফলে সাহাবীগণও এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ করতে লাগলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

হিজরতকারী মহিলাদের ফেরত প্রদানে অস্বীকৃতি :

এ সফর শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে মদিনায় চলে আসেন। এর কিছু দিন পর একদল মহিলা মুহাজির মদিনায় চলে আসেন। তখন তাদের অভিভাবকরা উক্ত সন্ধিপত্র অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তাদেরকে ফেরত দেয়ার দাবি জানালে তিনি তাদেরকে ফেরত দিতে অস্বীকার করেন এবং এ যুক্তি প্রদান করেন যে, মহিলারা এ সন্ধিচুক্তির আওতার বাইরে। সুতরাং তাদেরকে ফেরত দিতে আমরা বাধ্য নই। ফলে তারা খালি হাতেই মক্কায় ফেরত যায়। এ সময় আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমতাহিনা এর ১০ নং আয়াত নাযিল করে ঘোষণা করেন যে, মুসলিম

---

[৮৬] সহীহ বুখারী, হা/৩১৮২; সহীহ মুসলিম, হা/১৭৮৫।

মহিলাদের জন্য কাফিররা হালাল নয়। এসব আয়াত নাযিল হওয়ার পরপরই উমর (রাঃ) তার দুই জন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন, যারা তখনও মক্কায় অবস্থান করছিল।[৮৭]

স্পষ্ট বিজয় :

এ সন্ধিপত্রের শর্তসমূহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল মুসলিমদের জন্য সোনার হরিণ। কেননা এ সন্ধিপত্রের মধ্যে লুকায়িত ছিল মুসলিমদের সুস্পষ্ট বিজয়। এ সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে কুরাইশদের চরম মূর্খতার প্রকাশ ঘটেছিল, যা একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করা যায়।

উক্ত সন্ধিচুক্তির প্রথম ও দ্বিতীয় দফার শর্তসমূহের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমগণ দীর্ঘ দিনের যুদ্ধবিগ্রহের বিষাত্মক অবস্থা থেকে কিছু প্রশান্তি লাভ করার সুযোগ পান। তাছাড়া এ কারণে মক্কার আশেপাশে নির্বিঘ্নে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করার সুযোগও লাভ হয়। কেননা এতদিন কুরাইশদের তৎপরতার কারণে সে অঞ্চলগুলোতে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। সুতরাং এখন যদি মুসলিমরা দাওয়াত প্রদান করে তাহলে এতে কুরাইশরা কোনরূপ মাথা ঘামাতে পারবে না।

উক্ত সন্ধিচুক্তির তৃতীয় দফার শর্তসমূহের কারণে মুসলিমদের বিস্তার লাভ করার সুযোগ হয়। এতদিন যারা কুরাইশদের প্রভাবের কারণে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলেন অথবা যারা ইসলামকে গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন না, তারা খুব সহজেই ইসলামকে ভালোভাবে অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করেন। সুতরাং যারা ইসলামকে অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই ইসলামের দাওয়াত প্রদান করতে থাকেন। ফলে ইসলাম আরো দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অবশেষে দেখা যায় যে, সন্ধিচুক্তির পর মক্কা বিজয় পর্যন্ত এতো বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যে, তাদের সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল।

উক্ত সন্ধিচুক্তির চতুর্থ দফাটি বাহ্যিকভাবে একেবারেই মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী মনে হচ্ছিল। কিন্তু এর মধ্যে নিহিত ছিল আরো বড় তাৎপর্য। কেননা এটা নিশ্চিত ছিল যে, কোন মুসলিম কখনো মক্কায় যাবে না; বরং মক্কার কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে মদিনায় চলে আসার চেষ্টা করবে। আর যদি কেউ মক্কায় যায়, তাহলে সে মূলত মুশরিক অথবা মুনাফিক ছাড়া আর কেউ নয়, যাকে ইসলামের কোনই প্রয়োজন নেই। সুতরাং সে যদি চলে যায়, তাহলে এতে কারো কিছু যায়-আসে না; বরং এতে ইসলামের আরো উপকার সাধন হবে।

---

[৮৭] সহীহ বুখারী, হা/২৭৩৩।

অতএব সর্বদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষেই এতে মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত ছিল। যার কারণে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা দেন যে,

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

(হে রাসূল!) নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। (সূরা ফাতহ- ১)
মূলত এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই সাহাবীগণ অন্তরে সান্ত্বনা অনুভব করেছিলেন।

মক্কা থেকে পলাতক সাহাবীদের কর্মকাণ্ড :

উক্ত সন্ধিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোন সাহাবীই মক্কা থেকে পালিয়ে এসে মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করত না। এমনকি যদি কোন সাহাবী মুশরিকদের নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতেন, তবুও তিনি তাকে মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দিতেন। এমনই এক সাহাবী ছিলেন আবুল বাসীর (রাঃ)। তিনি ছিলেন মক্কাবাসীদের মিত্র সাকীফ গোত্রের লোক। তিনি যখন মুশরিকদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মদিনায় পলায়ন করে চলে আসেন, তখন কুরাইশদের পক্ষ হতে দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে সন্ধির শর্তানুযায়ী তাকে ফেরত দিতে বলে। ফলে তিনি তাকে তাদের হাতে সোপর্দ করেন। অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে যুল হুলাইফা নামক স্থানে অবতরণ করে, তখন তিনি কৌশলে তাদের কাছ থেকে তরবারি নিয়ে একজনকে হত্যা করে ফেলেন এবং অপর ব্যক্তি পালিয়ে মদিনায় চলে আসে। অতঃপর সে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে দেয়। এমন সময় আবুল বাসির সেখানে উপস্থিত হন। বাসীর (রাঃ) যখন বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও তাকে মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দেবেন, তখন তিনি সেখান থেকে পলায়ন করে সমুদ্রের উপকূলে অবস্থান নেন। এদিকে আবু জান্দাল (রাঃ)-ও মক্কা থেকে পলায়ন করে আবুল বাসীর (রাঃ) এর সাথে যোগ দেন।

এরপর থেকে যিনিই মক্কা থেকে পলায়ন করতেন, তিনিই তাদের সাথে যোগ দিতেন। এতে ধীরে ধীরে সেখানে বেশ কয়েকজন একত্রিত হয়ে গেলেন। সেখান দিয়ে কুরাইশদের যে কোন বাণিজ্য কাফেলা গেলেই তারা তাদেরকে মারধর করে মালপত্রগুলো নিয়ে নিতেন। এভাবে যখন কুরাইশরা বারবার এ ধরনের আক্রমণের শিকার হতে থাকল, তখন তারা অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে "মক্কা থেকে মদিনায় পলাতক ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হবে" মর্মে শর্তটি উঠিয়ে নেয় এবং তাদেরকে মদিনায় ফেরত নেয়ার অনুরোধ জানায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ডেকে এনে মদিনায় আশ্রয় প্রদান করেন।

কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণ :

এ সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর থেকেই অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। বিশেষ করে হিজরী ৭ম বর্ষের প্রথম দিকে মক্কার বিশেষ ব্যক্তিত্ব আমর বিন আস, খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং উসমান বিন তালহা (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যখন এরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মক্কা তার কলিজার টুকরোদেরকে আমাদের নিকট সমর্পণ করে দিয়েছে।

পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত

এতদিন যাবত তিনি কেবল মক্কা, মদিনা ও এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে বসবাসরত আরবদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছিলেন। এবার তিনি ইসলামের দাওয়াতকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে তখনকার যুগের বড় বড় বাদশাদের কাছে পত্র প্রেরণ করার মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করার জন্য মনস্থির করলেন। এ সময় তাঁকে জানানো হলো যে, রাজা-বাদশাগণ সিল মোহর ছাড়া কোন পত্র গ্রহণ করেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করিয়ে নেন, যার উপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দগুলো মুদ্রিত ছিল।[৮৮] এটি ছিল তিনটি লাইন বিশিষ্ট। প্রথম লাইনে ছিল 'মুহাম্মাদুন', দ্বিতীয় লাইনে ছিল 'রাসূলুন' এবং তৃতীয় লাইনে ছিল 'আল্লাহ'। প্রথম লাইনটি ছিল সবচেয়ে নিচে, দ্বিতীয় লাইনটি ছিল মধ্যখানে এবং তৃতীয় লাইনটি ছিল সবচেয়ে উপরে।[৮৯] রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পত্রগুলো হিজরী ৭ম বর্ষের মুহাররম মাস থেকেই প্রেরণ করতে শুরু করেন, যা ছিল খায়বার যুদ্ধের বেশ কয়েক দিন পূর্বে। নিম্নে সেসব পত্র প্রেরণের ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

১. হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট পত্র প্রেরণ :

যখন জাফর (রাঃ) হাবশায় হিজরত করেছিলেন, তখন বাদশা নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি ৯ম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।[৯০] কিন্তু যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এর মাধ্যমে তার নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না।[৯১]

---

[৮৮] সহীহ বুখারী, হা/৫৮৭২-৭৩।
[৮৯] সহীহ বুখারী, হা/৩১০৬, ৫৮৭৮; মিশকাত, হা/৪৩৮৬।
[৯০] ইবনে মাজাহ, হা/১৫৩৪; সহীহ বুখারী, হা/১২৪৫; সহীহ মুসলিম, হা/৯৫১।
[৯১] যাদুল মা'আদ ১/১১৭, ৩/৬০৩।

২. মিশরের সম্রাট মোকাওকিসের নিকট পত্র প্রেরণ :

সে সময় মিশর ও ইসকান্দার একই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তাদের সম্রাট ছিল মোকাওকিস, যার মূল নাম ছিল জোরাইজ বিন মাতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতেব বিন আবু বালতা (রাঃ) এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর উক্ত পত্রটি তার হস্তগত হলে, তিনি এ পত্রটির যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি এর প্রত্যুত্তরে এ মর্মে একটি পত্র লিখেন যে, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ এর প্রতি মহান মোকাওকিস কিবতের পক্ষ হতে। আপনি আমার সালাম গ্রহণ করুন। অতঃপর আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রে উল্লেখিত আপনার বক্তব্য উপলব্ধি করেছি। এখন যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে, সে বিষয়ে আমার ধারণা রয়েছে। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি শাম রাজ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার প্রেরিত সংবাদ বাহকের নিদর্শনস্বরূপ আপনার খেদমতে দুটো দাসী প্রেরণ করলাম, যারা কিবতীদের মাঝে বড় মর্যাদার অধিকারিণী। অধিকন্তু সামান্য উপঢৌকন হিসেবে আপনার পরিধানের জন্য কিছু পরিচ্ছদ ও বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি খচ্চর পাঠালাম। অতঃপর আপনার খেদমতে পুনরায় সালাম পেশ করলাম।

সম্রাট মোকাওকিস এ বলেই পত্র শেষ করলেন; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তার প্রেরিত দাসী দুটির মধ্যে একটির নাম ছিল মারিয়া এবং অপরটির নাম ছিল শিরীন। আর খচ্চরটির নাম ছিল দুলদুল, যা মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। অতঃপর উক্ত দাসী দুটির মধ্যে মারিয়ার গর্ভে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পুত্র ইবরাহীম এর জন্ম হয়েছিল। আর শিরীন নামক দাসীকে তিনি আনাস বিন সাবেত আনসারী (রাঃ)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন।[৯২]

৩. পারস্য সম্রাট খসরুর নিকট পত্র প্রেরণ :

সে সময় পারস্যের সম্রাটের নাম ছিল কিসরা, যে খসরু নামেই পরিচিত ছিল। সে ছিল খুবই অহংকারী, উদ্ধতপূর্ণ স্বভাবের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা সাহমী (রাঃ) এর মাধ্যমে তাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এই পত্র নিয়ে প্রথমে বাহরাইনের প্রধানের নিকট গমন করেন। তারপর সে তাঁকে জনৈক লোকের মাধ্যমে কিসরার নিকট প্রেরণ করে। অতঃপর যখন তার নিকট পত্রটির প্রথম অংশ "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি" পাঠ করা হচ্ছিল তখন সে এ মর্মে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে যে,

---

[৯২] যাদুল মা'আদ ৩/৬০৪; হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৬৭৫১, সনদ সহীহ।

আমার প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত একজন নিকৃষ্ট দাস তার নিজ নাম আমার নামের পূর্বে লিখেছে! তারপর সে পত্রটি ছিঁড়ে ফেলে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সংবাদটি অবগত হয়ে তার জন্য বদদু'আ করেছিলেন।[৯৩] ফলে সে কয়েকদিন পরেই পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজপুত্র শিরওয়ার হাতে নিহত হয়।

৪. রোমের সম্রাট হিরাকলের নিকট পত্র প্রেরণ :

সে সময় রোম সম্রাট ছিল হিরাকল। তার আসল নাম ছিল কায়সার। রাসূলুল্লাহ ﷺ দিহইয়াতুল কালবী (রাঃ) এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যখন পত্র নিয়ে সেখানে পৌছলেন, তখন আবু সুফিয়ানসহ কুরাইশদের একটি বণিক দলও সেখানে সফরে গিয়েছিল। ফলে দিহইয়াতুল কালবী (রাঃ) যখন সম্রাট হিরাকলকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে ভালোভাবে জানার জন্য আবু সুফিয়ানের সে দলটিকে ডেকে পাঠায়– যেহেতু তারা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিবেশী। তারপর সে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে অনেক ধরনের প্রশ্ন করে। ফলে সে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাকভাবে প্রদান করে। এ সময় হিরাকল উভয় পক্ষের কথা অনুধাবন করার জন্য একজন দুভাষীকে সাথে রেখেছিল।

অবশেষে এক পর্যায়ে হিরাকল বলল, তাঁর সম্পর্কে তুমি যা কিছু বলেছ তা যদি সঠিক ও সত্য হয়, তাহলে এ ব্যক্তি খুব শীঘ্রই আমার দুই পদতলের জায়গার অধিকার লাভ করবেন। আমার জানা ছিল, এ নবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আসবেন। যদি নিশ্চিত হতাম যে, আমি তাঁর নিকট পৌঁছতে সক্ষম হব, তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কষ্ট স্বীকার করতাম। আর যদি তার নিকটবর্তী হতাম, তাহলে তাঁর পদদ্বয় ধৌত করে দিতাম।

এরপর হিরাকল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রেরিত পত্রটি চেয়ে নিয়ে পাঠ করল। তখন তার রাজ দরবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অবশেষে হিরাকল দিহইয়াতুল কালবী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ ও মূল্যবান পোশাক উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেছিল।[৯৪] এরপরও সে মন্ত্রীসভার প্রভাবে আর ইসলাম গ্রহণ করেনি।

৫. বাহরাইনের গভর্নর মুনযির বিন সাভীরের নিকট পত্র প্রেরণ :

সে সময় বাহরাইনের গভর্নর ছিল মুনযির বিন সাভীর। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ) এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সে পত্রটি ভালোভাবে পাঠ করার পর

---

[৯৩] সহীহ বুখারী, হা/৪৪২৪; যাদুল মা'আদ ৩/৬০১।
[৯৪] সহীহ বুখারী, হা/৭, ৪৫৫৩; সহীহ মুসলিম, হা/১৭৭৩; মিশকাত, হা/৫৮৬১।

এর প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করে যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পত্রটি আমি বাহরাইনবাসীকে পাঠ করে শুনিয়েছিলাম। ফলে কিছু লোক ইসলামের ভালোবাসা এবং পবিত্রতার মনোভাব ব্যক্ত করে তার সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু কিছু লোক বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া এ জমিনে ইয়াহুদি এবং অগ্নী উপাসকও রয়েছে। অতএব এ ব্যাপারে আপনার নিজস্ব কর্ম প্রক্রিয়া অবলম্বন করুন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরবর্তী নির্দেশনা দিয়ে আরো একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

৬. আম্মানের সম্রাটের নিকট পত্র প্রেরণ :

সে সময় আম্মানের সম্রাটের নাম ছিল জাইফার। সে ছিল খুবই ক্ষমতালোভী; কিন্তু তার ভাই আবদ ছিল যথেষ্ট নমনীয় ও বুদ্ধিমান। তাদের পিতার নাম ছিল জালান্দি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান পূর্বক আমর ইবনে আস (রাঃ) এর মাধ্যমে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে সর্বপ্রথম আবদের সাথে দেখা করে তার সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত প্রদান করেন। সে সময় তিনি তাকে অন্যান্য বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণ এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি অবহিত করেন। ফলে এতে তিনি নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। তারপর আমর ইবনে আস (রাঃ) সম্রাট জাইফারের নিকট গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পত্রটি হস্তান্তর করেন। ফলে তিনি সেটি গ্রহণ করে ভালোভাবে পাঠ করেন। অতঃপর তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্য বেশ কয়েকদিন সময় নেন। অবশেষে যেদিন আমর ইবনে আস (রাঃ) ফেরত আসবেন, সেদিন তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেন এবং তারা এ কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

খায়বার অভিযান

খায়বার মদিনা হতে আশি অথবা ষাট মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এখানে প্রচুর পরিমাণ কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়। বনু কুরাইযা ও বনু নাযির গোত্রের ইয়াহুদিরা যখন মদিনা থেকে বিতাড়িত হয়, তখন তারা এ অঞ্চলে এসে শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসে। এখান থেকে তারা মদিনার মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র পরিচালনা করতে থাকে। মূলত খন্দক ছিল এদের ষড়যন্ত্রের ফল। এদের প্রচেষ্টাতেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরবের এতগুলো জাতি একত্রিত হতে পেরেছিল।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু কুরাইশদের সাথে একটি সমঝোতায় যাওয়ার পর এবার খায়বারের দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খায়বার অভিমুখে যাত্রা ও সৈন্য সংখ্যা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার বিজয় করার উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হয়েছিলেন হিজরী ৭ম বর্ষের মুহাররম মাসে। এ সময় মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এ যুদ্ধে কেবল তারাই অংশগ্রহণ করতে পারবে, যারা প্রকৃতপক্ষেই অংশগ্রহণ করতে চায়। ফলে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য সেসব সাহাবীই নির্বাচিত হলেন, যারা হুদায়বিয়া সন্ধির সময় বাই'আতে রিযওয়ানে অংশ নিয়েছিলেন। আর উক্ত বাই'আতে ১৪০০ জন সাহাবীই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারে প্রবেশ করার জন্য এমন একটি পথ নির্বাচন করেন, যা ছিল খায়বার ও বনু গাতফান গোত্রের মধ্যখানে। এর কারণ হলো, মুসলিম বাহিনী যদি এ পার্শ্ব দিয়ে খায়বারে প্রবেশ করে, তাহলে শত্রুরা পালানোর জন্য আর কোন পথ পাবে না এবং তারা বনু গাতফান গোত্র থেকে কোনরূপ সাহায্যও পাবে না। আর সেই দিকটি ছিল মদিনা থেকে খায়বারে প্রবেশের ঠিক উল্টো দিক তথা সিরিয়ার দিক। কেননা খায়বার ছিল মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই গোপনীয়তার সাথে যাত্রা করেছিলেন।

আলী (রাঃ) এর হাতে পতাকা প্রদান :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রাত্রিতে খায়বারের সীমানায় প্রবেশ করলেন, সেই রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন যে, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা প্রদান করব, যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। ফলে সাহাবীগণ সেই রাত্রিটি এমন অবস্থায় কাটালেন যে, প্রত্যেকেই আশা করছিলেন যেন তার হাতেই পতাকাটা প্রদান করা হবে। অবশেষে পরের দিন সকালে দেখা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা প্রদান করার জন্য আলী (রাঃ)-কে আহ্বান করছেন। সে সময় আলী (রাঃ) এর চোখে পীড়া হয়েছিল; ফলে তিনি সাহাবীদের পেছনে ছিলেন। অতঃপর যখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে আসা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে মুখের লালা লাগিয়ে সুস্থতার জন্য দু'আ করলেন। ফলে তিনি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন, যেন তাঁর চোখে কোন পীড়াই হয়নি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে পতাকা প্রদান করেন।[৯৫]

খায়বারে অনুপ্রবেশ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিয়ম ছিল এই যে, যদি তিনি কোন জনবসতিতে আক্রমণ করতে চাইতেন, তখন তিনি ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

---

[৯৫] সহীহ বুখারী, হা/৩৭০১, ৪২১০।

যদি দেখতেন যে, সেখানে ফজরের আযান দেয়া হচ্ছে, তাহলে তিনি ফিরে যেতেন। আর যদি দেখতেন যে, সেখানে ফজরের আযান দেয়া হচ্ছে না, তাহলে তিনি আক্রমণ পরিচালনা করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার আক্রমণের সময়ও তাই করলেন। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ) এর হাতে পতাকা দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি এমন সময় খায়বারে প্রবেশ করলেন, যখন তারা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে কৃষি কাজ করার জন্য মাঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং এ বলে ছোটাছুটি শুরু করে দেয় যে, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হলো; আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হলো– যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের নিকট অবতরণ করি, তখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। ফলে তাদের সকাল মন্দ হয়ে যায়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী একটি জায়গায় শিবির স্থাপন করলেন। অপরদিকে খায়বারবাসীরাও তাদের দুর্গসমূহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ খায়বারবাসীর উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। এতে মুসলিমদের মধ্য হতে শহীদ হয়েছিল ১৬ জন মতান্তরে ১৫, ১৮ অথবা ২৩ জন। অপরপক্ষে ইয়াহুদিদের মধ্য হতে নিহত হয়েছিল ৯৩ জন।

খায়বারের দুর্গসমূহ :

সে সময় খায়বারের জনবসতি দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটি অঞ্চলে ছিল পাঁচটি দুর্গ। সেগুলো হলো–

১. নায়েম দুর্গ
২. সা'আব বিন মুয়ায দুর্গ
৩. জুবাইর দুর্গ
৪. উবাই দুর্গ এবং
৫. নেযার দুর্গ

এগুলোর প্রথম তিনটি দুর্গের নিকটবর্তী অঞ্চলকে 'নাতাত' বলা হতো এবং অবশিষ্ট দুটি দুর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে 'শিক' বলা হতো।

আর অপর অঞ্চলে ছিল তিনটি দুর্গ। সেগুলো হলো–

১. কসুম দুর্গ
২. ওয়াতীহ দুর্গ এবং
৩. সালালিম দুর্গ।

এ অঞ্চলকে কাতিবা বলা হতো। এছাড়াও উভয় অঞ্চলে আরো কিছু ছোট ছোট দুর্গ ও ঘাঁটি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মূল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন কেবল প্রথম অঞ্চলের দুর্গগুলোতেই। তারপর তারা মুসলিমদের শক্তি-সামর্থের দিকে লক্ষ্য করে কোন ধরনের যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে।

খায়বারবাসীদের সাথে সন্ধি :

খায়বারবাসীদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি করেন যে,

১. দুর্গের মধ্যে যেসকল সৈন্য অবস্থান করছে, তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দিতে হবে।
২. তাদের পরিবার-পরিজনকে তাদের সঙ্গে থাকতে দিতে হবে।
৩. পরিবার-পরিজনসহ তাদের খায়বার ছেড়ে বাহিরে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে।
৪. তাদের ধন-সম্পদ, যথা– বাগ-বাগিচা, সোনা-দানা, অশ্ব, যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য লৌহবর্ম ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট সমর্পণ করতে হবে।
৫. কেবল লজ্জা নিবারণ ও জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় সাথে নিয়ে যেতে পারবে।

গনীমতের মালের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত :

এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ প্রচুর পরিমাণ গনীমত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেহেতু মদিনা থেকে খায়বারে এসে চাষাবাদ করাটা মুসলিমদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল, ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই জমিগুলো থেকে অর্ধাংশ গ্রহণ করার শর্তে বর্গাচাষ করার জন্য পুনরায় সেই ইয়াহুদিদের কাছেই সমর্পণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদকে প্রথমে ৩৬ ভাগে, তারপর প্রতিটি ভাগকে আরো ১০০ ভাগে– সর্বমোট ৩৬০০ ভাগে বিভক্ত করেন। তারপর এর অর্ধেক অংশ তথা ১৮০০ ভাগ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অংশ তথা ১৮০০ ভাগ মুসলিমদের বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজন ও বিপদাপদ মোকাবেলার জন্য রেখে দেন।

সাফিয়া (রাঃ) এর সাথে বিবাহ

সাফিয়া (রাঃ) ছিলেন ইয়াহুদি নেতা আবুল হুকাইক এর ছেলে কেনান এর স্ত্রী। খায়বারের সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে কেনান মুসলিমদের হাতে নিহত হয় এবং সাফিয়া (রাঃ) বন্দী হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এসব বন্দীদেরকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সাহাবীগণকে ইখতিয়ার প্রদান করেন, তখন দিহইয়াতুল কালবী (রাঃ) সাফিয়া (রাঃ)-কে পছন্দ করেন। কিন্তু অপর এক ব্যক্তির পরামর্শে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের জন্যই রেখে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়া (রাঃ) এর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে তিনি সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে নেন। এ বিয়েতে সাফিয়া (রাঃ)-কে মুক্ত করাটাই ছিল

মোহরানার অন্তর্ভুক্ত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় ফেরার পথে 'সাদ্দে সাহবা' নামক স্থানে পৌঁছলে সাফিয়া (রাঃ) এর সাথে বাসর রাত্রি যাপন করেন এবং সকালে ওলিমার কাজ সম্পন্ন করেন।[৯৬]

যাতুর রিকা অভিযান

এ অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল হিজরী ৭ম বর্ষের রবিউল আওয়াল মাসে। এটি পরিচালিত হয়েছিল আরবের একদল বেদুঈনদের বিরুদ্ধে, যারা নজদের বালুকাময় প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে বসবাস করত এবং প্রায়ই ডাকাতি ও লুটতরাজ করে বেড়াত। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্যই এ অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু এ অভিযানে কোন সংঘর্ষ হয়নি। তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। যেমন–

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্যে একজন মুশরিকের অস্ত্র উত্তোলন :

এ সফরের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ খুবই ক্লান্ত হয়ে একটি বাগানে উপনীত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অবস্থান নেন। তাঁরা নিজ নিজ গাছের উপর তরবারি ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এমন সময় একজন মুশরিক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তরবারিটি হাতে নিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও জাগ্রত হয়ে গেলেন। তখন সে বলল, আপনি আমাকে ভয় করছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। সে বলল, আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ। তখন ঐ লোকটির হাত থেকে আচমকা তরবারিটি পড়ে গেল। অতঃপর সেই তরবারিটি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাতে উঠিয়ে নিলেন এবং তাকে বললেন, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তখন লোকটি বলল, আপনি উত্তম পাকড়াওকারী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল? তখন লোকটি বলল, আমি অঙ্গীকার করছি যে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব না এবং যারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সঙ্গেও আমি থাকব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের উত্তর শুনে তাকে ছেড়ে দিলেন।[৯৭]

সালাতরত অবস্থায় তীর বিদ্ধ হওয়া :

উক্ত যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জায়গায় এসে তাবু স্থাপন করেন এবং সেখানে রাত কাটাতে ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর সময় আব্বাদ ইবনে বিশর ও আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-কে

---

[৯৬] সহীহ বুখারী, হা/৪২১১।
[৯৭] সহীহ বুখারী, হা/৪১৩৫।

পাহারায় নিয়োজিত করেন। তারপর তারা উভয়ে পাহারা দেয়ার সময়সূচী ভাগ করে নিলেন। আর এতে আব্বাদ (রাঃ) রাত্রির প্রথম অংশে পাহারা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর সবাই ঘুমিয়ে গেলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন।

এদিকে মুসলিমগণ ইতিপূর্বে একজন মুশরিক মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল। তখন তার স্বামী প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা সাহাবীগণের মধ্য থেকে কোন একজনের রক্ত প্রবাহিত করবে। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে সে মুসলিম বাহিনীর পেছনে বের হয়েছিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারপর যখন সে আব্বাদ (রাঃ)-কে নামাযে দাঁড়াতে দেখল, তখন তার দিকে উদ্দেশ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করল। ফলে সেটা এসে তার পায়ে বিদ্ধ হলো। কিন্তু এতে তিনি নামায ছেড়ে দেননি। অতঃপর তিনি নামায শেষে তার অপর সঙ্গীকে জাগ্রত করে বিষয়টি অবগত করেন। তখন তিনি বললেন, আপনি আমাকে ডাকেননি কেন? তিনি বললেন, আমি একটি সূরা পাঠ করছিলাম, যা শেষ না করা পর্যন্ত বিরত হওয়াটা পছন্দ করছিলাম না। তারপর উক্ত ঘাতক পরিস্থিতি অনুমান করতে পেরে ভয়ে পালিয়ে যায়।[৯৮]

উমরাতুল কাযা

উমরাতুল কাযা অর্থ হচ্ছে কাযা উমরা। যেহেতু মুসলিমগণ হিজরী ৬ষ্ঠ বর্ষে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত উমরা পরবর্তী বছর তথা হিজরী ৭ম বর্ষে পালন করেছিলেন, তাই এ উমরাকে উমরাতুল কাযা বলা হয়।

মূলত এ উমরাটি ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির ফসল। কেননা তাতে একটি শর্ত এই ছিল যে, মুসলিমগণ পরবর্তী বছর উমরা করার জন্য মক্কায় আগমন করবে এবং তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে। আর এ সময় সাথে করে কোষবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসতে পারবে না। এ শর্তানুযায়ী যখন পরবর্তী বছর যিলকদ মাসের চাঁদ দেখা গেল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের প্রত্যেককেই কাযা হিসেবে নিজ নিজ উমরা পালন করার নির্দেশ দিলেন। ফলে হুদায়বিয়া সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী জীবিত সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এছাড়া আরো কিছু সংখ্যক লোক তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তাদের সাথে উট ছিল ৬০টি এবং এগুলোর দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন নাজিয়া বিন জুনদুব আসলামী (রাঃ)।

---

[৯৮] আবূ দাউদ, হা/১৯৮।

মুসলিমদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা :

যদিও হুদায়বিয়া সন্ধির শর্তানুযায়ী এ সময়গুলোতে মুসলিমদের নিরাপত্তা বিধান রাখা হয়েছিল, এরপরও অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য মুসলিমগণ মদিনা থেকে বের হওয়ার সময় সকল ধরনের যুদ্ধাস্ত্র সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন। তারপর ইয়াজেজ নামক উপত্যকায় এসে সেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ আওস বিন খাওলী আনসারী (রাঃ) এর নেতৃত্বে ২০০ জন সাহাবীর তত্ত্বাবধানে রেখে দেন। যাতে করে মক্কাবাসীরা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া যায়।

মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবীগণকে নিয়ে যুল হুলাইফা পর্যন্ত আসলেন তখন সাহাবীগণকে ইহরাম পরিধান করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ ইহরাম পরিধান করে সেখান থেকেই তালবিয়া পাঠ করতে শুরু করলেন এবং এ অবস্থাতেই মক্কায় প্রবেশ করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন। মুসলিমগণ আত্মরক্ষার জন্য নিয়ে আসা অস্ত্র কোষবদ্ধ অবস্থায় নিজেদের কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

উমরার কার্য সম্পাদন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবীগণকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের কীর্তিকলাপ অবলোকন করার জন্য কাবা ঘরের উত্তর দিকে অবস্থিত 'কায়াইকায়ান' নামক পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান নিয়েছিল। এ সময় তারা একে অপরের সাথে বলাবলি করছিল যে, তোমাদের নিকট একটি দল এসেছে, ইয়াসরিবের অর্থাৎ মদিনার জ্বর যাদেরকে একদম নষ্ট করে দিয়েছে। এসব সমালোচনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে কাবা ঘর তাওয়াফ করার সময় প্রথম তিনটি চক্কর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে করার নির্দেশ দিলেন। ফলে সাহাবীগণ তাই করলেন। তখন মুশরিকরা বলতে লাগল– এসকল লোক সম্পর্কে আমরা ধারণা করেছিলাম যে, মদিনার জ্বর এদেরকে নষ্ট করে ফেলেছে। তাতো সঠিক নয়; বরং এরা সাধারণ লোকজন হতেও অধিক শক্তিশালী। তারপর মুসলিমগণ অবশিষ্ট চক্করগুলো স্বাভাবিকভাবে পালন করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে সাফা-মারওয়া সায়ী করেন এবং মারওয়ার নিকটেই পশুগুলোকে কুরবানী করেন। এরপর তিনি মাথা মুণ্ডন করেন। আর কিছু লোককে ইয়াজেজ নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন, যাতে করে সেখানে অস্ত্রশস্ত্রগুলোর পাহারায় নিয়োজিত লোকেরাও উমরা করতে পারে।

মদিনায় প্রত্যাবর্তন :

এভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী যখন তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন মক্কাবাসীরা আলী (রাঃ) এর নিকট এসে বলল, তোমাদের সঙ্গীকে বলো, তিনি যেন এখান থেকে চলে যান। কারণ সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে বেরিয়ে এসে 'সারফ' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। এ সময় হামযা (রাঃ) এর কন্যা "চাচা" বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে এসে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জাফর (রাঃ) এর তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিলেন। কেননা জাফর (রাঃ) এর স্ত্রী ছিলেন মেয়েটির খালা।

মায়মুনা বিনতে হারিস (রাঃ) এর সাথে বিবাহ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরা পালনকালেই মায়মুনা বিনতে হারিস (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। এজন্য তিনি জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ)-কে মক্কায় প্রবেশের পূর্বে মায়মুনা (রাঃ) এর নিকট প্রেরণ করেন। তারপর তিনি এ ব্যাপারে সমস্ত দায়দায়িত্ব আব্বাস (রাঃ) এর নিকট সমর্পণ করেন। কারণ মায়মুনা (রাঃ) এর বোন ছিলেন তারই স্ত্রী। অতঃপর আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মায়মুনা (রাঃ) এর বিবাহ সম্পন্ন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে ফেরার সময় আবু রাফে' (রাঃ)-কে পেছনে রেখে যান; যাতে করে তিনি মায়মুনা (রাঃ)-কে বাহনের মধ্যে চড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌছে দিতে পারেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'সারফ' নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তিনি মায়মুনা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পৌঁছে দেন।

মুতা যুদ্ধ

মুতা হচ্ছে উরদুন অঞ্চলে বালকা নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। সেখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস দুই মনজিল ভ্রমণপথের দূরত্বে অবস্থিত। মুতার যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় এটিই ছিল সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরী ৮ম বর্ষের জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে।

প্রেক্ষাপট :

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিস ইবনে উমায়ের আযদী (রাঃ) এর মাধ্যমে বসরার শাসকের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে ততকালীন রোম সম্রাটের 'বালকা' নামক স্থানের গভর্নর শোরাহবিল বিন আমর গাসসানী তাকে বন্দী করে এবং শহীদ করে। অথচ যেকোন রাষ্ট্রীয় দূতকে হত্যা করাটা হচ্ছে মারাত্মক অপরাধ। ফলে তাদের সাথে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ করাটা আবশ্যক হয়ে উঠে।

মুসলিমদের সেনাবাহিনী :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ খবর শোনার পরপরই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তারপর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ৩০০০ সৈন্য প্রস্তুত করে নেন এবং এদের সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)-কে। আর এটাই ছিল সবচেয়ে বড় মুসলিম বাহিনী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অসিয়ত :

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার পর কয়েকটি অসিয়ত করেন। সেগুলো হলো :

১. (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) যদি যায়েদ ইবনে হারিসাকে শহীদ করা হয়, তাহলে সেনাপতি হবে, জাফর। তারপর সেও যদি শহীদ হয়, তাহলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।

২. যেখানে হারিস ইবনে উমায়েরকে শহীদ করা হয়েছে, সেখানে উপস্থিত হয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সেটাই হবে উত্তম। অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে।

৩. আল্লাহর সঙ্গে কুফরীকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। সাবধান! অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না, আমানতের খিয়ানত করো না। শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ এবং গীর্জায় অবস্থানরত পুরোহিতদের হত্যা করো না। খেজুর কিংবা অন্য কোন বৃক্ষ কর্তন করো না এবং বাড়িঘর দালানকোঠা বিনষ্ট করো না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সৈন্যদলের জন্য সাদা পতাকা বেঁধে তা যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) এর হাতে তুলে দেন।

রোমানদের সৈন্য সংখ্যা :

মুসলিমগণ যখন উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মায়ান নামক স্থানে পৌঁছেন তখন সংবাদ পান যে, রোমান সম্রাট হিরাকল বালকা নামক অঞ্চলের মাআব নামক স্থানে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে। এছাড়া লাখম, জোযমা, বিলকিন ও বোহরা এবং বালা নামক গোত্রগুলো থেকে অতিরিক্ত এক লক্ষাধিক সৈন্য তাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

মুসলিমদের পরামর্শ সভা :

মদিনা থেকে বের হওয়ার পর মুসলিমগণ এটা কখনো চিন্তাও করেনি যে, তাদেরকে এত বড় বাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন; এমনকি অনেকেই পরামর্শ দিলেন যে, শত্রুবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হোক এবং পরবর্তী নির্দেশনা অনুসরণ করা হোক। কিন্তু আবদুল্লাহ

ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) যুদ্ধ করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং সকলকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। অবশেষে তার এ সিদ্ধান্তকে সকলেই মেনে নেন।

রোমানদের উপর মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ :

মুসলিম বাহিনী মায়ান নামক স্থানে দুই দিন অতিবাহিত করার পর শত্রুদের উপর আক্রমণ করেন এবং বালকা নামক জায়গার 'মাশারেফ' নামক বসতিতে রোমান সৈন্যদের সম্মুখীন হন। এরপর শত্রু সৈন্য আরো নিকটবর্তী হলে মুসলিমগণ মুতা নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর সৈন্যদের শৃংখলা বিন্যাস করা হয়। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

মুসলিম সেনাপতিদের শাহাদাত বরণ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অসিয়ত অনুযায়ী মুসলিম বাহিনীর পক্ষে সর্বপ্রথম পতাকা ধারণ করেন যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)। তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনা ও সাহসিকতার সাথে শত্রুদের উপর আঘাত হানতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি একটি বর্শাবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়ে যান।

তারপর জাফর (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে নেন এবং তিনিও পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করেন। এক পর্যায়ে প্রথমে তার ডান হাতটি কাটা যায়, কিছুক্ষণ পর তার বাম হাতটিও কাটা যায়। এরপর তিনি উভয় হাতের বাকি অংশ দ্বারা মুসলিম বাহিনীর পতাকা ধরে রাখার চেষ্টা করেন। অবশেষে শত্রু বাহিনীর এক সৈন্য তাকে এমনভাবে আঘাত হানে যে, তার সমস্ত শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে 'তাইয়ার যুল জানাহাইন' তথা দুই বাহুবিশিষ্ট উড়ন্ত পাখি উপাধিতে ভূষিত করেন। কেননা তিনি এর বিনিময়ে জান্নাতে দুটি পাখা প্রাপ্ত হবেন, যা দিয়ে তিনি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারবেন।

তারপর মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে নেন তৃতীয় ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অসিয়তের শেষ সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। তিনিও পতাকা নিয়ে নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন এবং প্রাণপণ যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর দায়িত্ব গ্রহণ :

এভাবে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত তিনজন সেনাপতিই শাহাদাত বরণ করেন, ঠিক সে সময় বনু আজলান গোত্রের সাবেত বিন আরকাম (রাঃ) নামক এক সাহাবী লাফ দিয়ে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরে বললেন, হে মুসলিম ভাইগণ! আমাদের মধ্য হতে কোন একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করুন।

সাহাবীগণ বললেন, আপনিই এই দায়িত্ব পালন করুন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, এই দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর সাহাবীগণ খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে সেনাপতি নির্বাচন করেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে যুদ্ধের যাবতীয় সংবাদ অবগত হচ্ছিলেন এবং সেগুলো মদিনায় অবস্থিত সাহাবীগণকেও অবহিত করছিলেন।

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর কৌশল :

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ছিলেন খুবই বিচক্ষণ মেধার অধিকারী। তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথেই যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে ফেলেন। তিনি প্রথমে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অটল থাকেন; কিন্তু পরের দিন পেছনের বাহিনীকে আগে এবং আগের বাহিনীকে পেছনে নিয়ে আসেন। তারপর ডানের বাহিনীকে বামে এবং বামের বাহিনীকে ডানে নিয়ে আসেন। এতে রোমানরা ভয় পেল যে, মুসলিমগণ হয়তো পেছন দিক থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীকে পেছনের দিকে নিতে থাকেন। তখন রোমানরা মনে করল যে, এটা হয়তো মুসলিমদের নতুন কোন কৌশল। ফলে তারা আর মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ না করে ফিরে যায়। এদিকে খালিদ (রাঃ)-ও মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদিনায় চলে আসেন।

ফলাফল :

যেহেতু এ যুদ্ধে উভয়ই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিল। সুতরাং এতে কোন পক্ষেরই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন হয়নি। তবে সার্বিক দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মুসলিমদের বিজয়ের পাল্লাটাই ভারি দেখা যায়। কেননা মুসলিমরা কৌশল অবলম্বন করার ফলে রোমানবাহিনী ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিল। আবার তারা দুই লক্ষ সেনা বিশিষ্ট বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার সেনা বিশিষ্ট এত ছোট বাহিনী নিয়েই পাহাড়ের মতো অটল থেকে মোকাবেলা করতে পেরেছিল, যা ছিল কল্পনাতীত এবং অসম্ভব বীরত্বের পরিচয়। তাছাড়া এ যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্য হতে শহীদ হয়েছিলেন মাত্র ১২ জন; অপরপক্ষে রোমানদের মধ্য হতে নিহত হয়েছিল অসংখ্য।

মক্কা বিজয়

ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়টি হচ্ছে মক্কা বিজয়। এটি ছিল মূলত হুদায়বিয়া সন্ধির ফসল। সম্ভবত আল্লাহ এ বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রটিকে স্পষ্ট বিজয় হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন।

প্রেক্ষাপট :

হুদায়বিয়া সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, আরবের যে কোন গোত্র ইচ্ছা করলে এ চুক্তিপত্রের যে কোন পক্ষের সাথে মিত্রতা পোষণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোন গোত্রের উপর অন্যায়-অত্যাচার করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। পরবর্তীতে চুক্তির এ ধারা অনুযায়ী মুসলিমদের সাথে যোগ দিয়েছিল বনু খোযায়া গোত্র এবং কুরাইশদের সাথে যোগ দিয়েছিল বনু বকর গোত্র। এ দুটি গোত্র জাহেলী যুগ থেকে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। একদা এর জের ধরে বনু বকর গোত্রের কিছু লোক বনু খোযায়া গোত্রের উপর আক্রমণ করে অনেককেই হত্যা করে ফেলে। আর এতে কুরাইশরা গোপনে অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করে। অতঃপর এ সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌঁছে তখন তিনি মক্কায় আক্রমণ করাকে আবশ্যক মনে করলেন। কেননা এটি ছিল কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের স্পষ্ট নিদর্শন।

আবু সুফিয়ানের মদিনায় আগমন :

এ ঘটনার পরপরই কুরাইশরা অনুধাবন করল যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা সত্যি সত্যিই বড় ধরনের অন্যায় করে ফেলেছে। সুতরাং এর ফলাফল খুব তিক্ত ও ভয়াবহ হতে পারে। ফলে তারা একটি পরামর্শ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আবু সুফিয়ানকে মদিনায় প্রেরণ করল।

আবু সুফিয়ান মদিনায় এসে প্রথমে তার কন্যা তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হাবীবা (রাঃ) এর ঘরে গেল। সে যখন বিছানায় বসতে চাইল, তখন হাবীবা (রাঃ) তার থেকে বিছানা গুটিয়ে নিলেন। এটা দেখে আবু সুফিয়ান বলল, হে আমার কন্যা! তুমি কি মনে করছ যে, এই বিছানা আমার জন্য উপযুক্ত নয়, নাকি আমি এই বিছানার উপযুক্ত নই? হাবীবা (রাঃ) বললেন, এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিছানা। আর আপনি হচ্ছেন অপবিত্র মুশরিক। এতে আবু সুফিয়ান মুসলিমদের মনোভাব অনেকটাই আঁচ করতে পারল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। তারপর সে বিষয়টি নিয়ে একে একে আবু বকর, উমর, আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণকে অনুরোধ জানাল, কিন্তু প্রত্যেকেই তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর সে আলী (রাঃ) এর পরামর্শ অনুযায়ী মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল যে, হে জনগণ! আমি সকলের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করার ঘোষণা করছি। কিন্তু এতে কেউ কোন সাড়া দিলেন না। তারপর সে হতাশ হয়ে মক্কায় ফিরে আসে এবং কুরাইশদেরকে সবকিছু অবহিত করে।

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি :

এদিকে মক্কাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ আসার তিন দিন পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে অবগত হতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি তখন আয়েশা (রাঃ)-কে সফরের প্রস্তুতি নিতে বললেন। কিন্তু তখনও তিনি কাউকে এর মূল উদ্দেশ্যের কথা জানাননি। তারপর যখন মক্কাবাসীদের চুক্তিভঙ্গের সংবাদ এসে পৌঁছল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে মক্কা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন এবং বিষয়টি যথাসম্ভব গোপন রাখার নির্দেশ দিলেন। যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে আকস্মিক আক্রমণ করে মক্কাবাসীদেরকে হতভম্ব করে দিতে পারেন।

হাতেব বিন আবু বালতা'আ (রাঃ) এর গোপন চিঠি :

মুসলিমগণ যখন খুব গোপনে মক্কা আক্রমণ করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন হাতেব বিন আবু বালতা'আ (রাঃ) নামে এক বদরী সাহাবী এক মহিলার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রেরণ করেন। যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মক্কা আক্রমণের বিষয়টি লিপিবদ্ধ ছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলিমরা মক্কাবাসীর উপর আক্রমণ করার পর যদি মক্কাবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে সেখানে অবস্থিত মুহাজিরদের পরিবার বর্গের উপর হামলা চালায়, তাহলে এ সংবাদ জানানোর অসিলায় তারা যেন দয়া পরবশ হয়ে হাতেব বিন আবু বালতা'আ (রাঃ) এর পরিবারের কোন ক্ষতি না করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি অবিলম্বেই ওহীর মাধ্যমে জেনে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি আলী, মিকদাদ, যুবায়ের এবং আবু মুরশেদ গানাভী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীকে চিঠিটি উদ্ধারের জন্য এই বলে প্রেরণ করেন যে, তোমরা 'খাখ' নামক উদ্যানে গিয়ে একটি হাওদানশীল মহিলাকে দেখতে পাবে, এ মহিলার নিকট কুরাইশদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি পত্র আছে, সে পত্রটি তার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। তখন তারা ঘোড়ার উপর আরোহণ করে খুব দ্রুতগতিতে মহিলাটিকে পাকড়াও করে পত্রটি ফেরত দিতে বলেন। কিন্তু সে পত্রের বিষয়টি অস্বীকার করল। অবশেষে সাহাবীগণের হুমকীর মুখে সে পত্রটি ফেরত দিয়ে দিল।

অতঃপর পত্রটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে আসা হলে, তিনি পত্রের বিষয়বস্তু ও প্রেরক-প্রাপক সম্পর্কে অবহিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতেব বিন আবু বালতা'আ (রাঃ)-কে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করেন এবং এর উদ্দেশ্য খুলে বলেন। এসব কথা শুনে উমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গলা কর্তন করে দেই। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং সে মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তুমি কি

জান না যে, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে? আর হতে পারে আল্লাহ তা'আলা উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেননা তিনি বলে দিয়েছেন, তোমরা যা চাও তা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এ কথা শুনে উমর (রাঃ) এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে উঠল। ফলে তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর এ বিষয়টির সমাপ্তি এখানেই ঘটে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমতাহিনার প্রথম আয়াতটি নাযিল করেন।[৯৯]

মক্কার পথে যাত্রা :

দিনটি ছিল ১০ই রমাযান হিজরীর ৮ম বর্ষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল প্রস্তুতি শেষে সাহাবীদেরকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সাথে ছিলেন ১০ হাজার সাহাবীদেরকে নিয়ে গঠিত একটি বিশাল সেনাবাহিনী। এ সময় মদিনার প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আবু রাহাম গিফারী (রাঃ) এর উপর।

পথিমধ্যে চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) এর সাথে দেখা হয়, যিনি ইসলাম গ্রহণ করে স্বপরিবারে হিজরত করে মদিনায় যাচ্ছিলেন। তারপর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিস এবং ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন উমায়েরের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমদের দলে শরীক হয়ে যায়।

এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সকলেই রোযাদার ছিলেন। তারপর যখন তাঁরা কাদীদ নামক ঝর্ণার কাছে পৌছলেন, তখন রোযা ভঙ্গ করলেন।[১০০] তারপর তাঁরা মাররাউয যাহরান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে রাত্রি যাপন করেন।

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ :

মুসলিমগণ মাররাউয যাহরানে শিবির স্থাপন করার পর আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে বের হলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মক্কার কোন উপযুক্ত লোক পেলে তার মাধ্যমে মক্কাবাসীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান করা। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি আবু সুফিয়ান ও বোদাইল বিন ওয়ারাকার কথোপকথন শুনতে পান। ফলে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান। এতে আবু সুফিয়ান সাড়া দেয় এবং বোদাইল বিন ওয়ারাকা মক্কায় ফিরে যায়।

তারপর আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বাহনের পেছনে চড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে আসেন। এ সময় উমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) এর পেছনে

---

[৯৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৯৮৩।
[১০০] সহীহ মুসলিম, হা/১১১৩-১৪।

আবু সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে দ্রুত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে চলে যান এবং তাকে হত্যা করার অনুমতি চান। তখন আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু এরপরও উমর (রাঃ) বারবার হত্যা করার জন্য অনুমতি চাইতে লাগলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রাঃ)-কে থামিয়ে দিলেন এবং আব্বাস (রাঃ) এর আশ্রয় দান করাটা অনুমোদন করলেন।

পরের দিন সকালে আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে নিয়ে যান। তখন তিনি আবু সুফিয়ানকে সামান্য ভর্ৎসনাপূর্বক ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। অবশেষে সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

তারপর আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান সম্মান প্রিয় লোক; সুতরাং তাকে সম্মান প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে এবং যে নিজ ঘরের দরজা ভেতর হতে বন্ধ করে নেবে সে নিরাপদ থাকবে এবং যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ থাকবে।[১০১]

মাররাউয যাহরান হতে মক্কার পথে :

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল সকাল মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হন। এদিকে আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ান (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তিনি মক্কায় এসে কুরাইশদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন এবং সতর্ক করে দেন। কিন্তু এতে তারা তাকে ভর্ৎসনা করে। তারপর তিনি তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নিরাপত্তার বিষয়টিও অবহিত করেন। ফলে সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পলায়ন করতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেনাবিন্যাস :

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'যী-তোওয়া' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন সেনাবিন্যাসের কাজটি সেরে নিলেন। তিনি ডান পাশে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে নিযুক্ত করলেন এবং তাকে এ নির্দেশ দিলেন যে, নিচু অঞ্চল দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে। এ সময় কুরাইশরা যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের সকলকে হত্যা করবে। তারপর সাফা পাহাড়ের উপর আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

এরপর তিনি বাম পাশে যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ)-কে নিযুক্ত করেন এবং তাকে মক্কার উপরিভাগ তথা কুদা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেন। অতঃপর হাজুন নামক স্থানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পতাকা উত্তোলন করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন।

---

[১০১] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৮০; আবু দাউদ, হা/৩০২১; মিশকাত, হা/৬২১০; সিলসিলা সহীহাহ, হা/৩৩৪১।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে থাকা আবু উবাইদা (রাঃ)-কে বাতনে ওয়াদির পথ দিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্বেই মক্কায় অবতরণ করতে সক্ষম হন।

মক্কায় প্রবেশ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনার পরপরই সকলেই নির্ধারিত পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ সময় মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের পক্ষ থেকে কোন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন না। তবে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) সামান্য বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু বাধাদানকারীরা খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর সাথে টিকতে না পেরে পলায়ন করে। তারপর তিনি মক্কার গলি পথগুলো অতিক্রম করে সাফা পাহাড়ের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মিলিত হন। এদিকে যুবায়ের (রাঃ) হাজুন নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে পৌঁছলে সকলে মিলে কাবা ঘরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন।

কাবা ঘরে প্রবেশ ও মূর্তি অপসারণ :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চারদিক থেকে সাহাবীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তারপর প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন এবং কাবা ঘর তাওয়াফ করেন।[১০২] এ সময় কাবা ঘরের আশপাশে ও ছাদের উপরে সর্বমোট ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাতে থাকা একটি ধনুক দিয়ে মূর্তিগুলোর উপর আঘাত করতে করতে সেগুলো ভূপাতিত করে দেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা ঘরের দ্বার রক্ষক উসমান বিন তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে কাবা ঘরে প্রবেশ করেন। সাথে ছিলেন উসামা ও বেলাল (রাঃ)। তারা কাবা ঘরের ভেতরে ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর প্রতিকৃতিসহ দেয়ালে অঙ্কনকৃত আরো অনেক ছবিও দেখতে পান। ফলে তাঁরা সেগুলোকেও ভেঙ্গে চুরমার করে দেন।

কাবা ঘরে নামায আদায় :

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি কাবা ঘরের দেয়াল থেকে তিন হাত দূরত্বে এমন অবস্থায় দাঁড়ান যে, বাম পাশে দুটি স্তম্ভ, ডান পাশে একটি স্তম্ভ এবং পেছনে ছিল তিনটি স্তম্ভ। সে সময় কাবা ঘরটি এই ছয়টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে ছিল।[১০৩] তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দুই রাক'আত নামায

---

[১০২] আবু দাউদ, হা/১৮৭৮।

[১০৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৯; সহীহ বুখারী, হা/৫০৫।

আদায় করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে কাবা ঘরের দরজা খুলে দেন এবং জনগণের সামনে ভাষণ প্রদান করেন।[১০৪]

সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা :

ভাষণ দানকালের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমাদের কী ধারণা যে, তোমাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে? তখন তারা বলল, আমরা আপনার প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করে থাকি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা জেনে রাখো যে, আমি তোমাদের সাথে ঠিক সেরূপ কথাই বলছি, যেমনটি ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আজ তোমাদের জন্য কোনই নিন্দা নেই। (আমিও তোমাদেরকে সেরূপই বলছি) যাও– আজ তোমাদের সকলকে মুক্তি দেয়া হলো।

কতিপয় কাফিরকে হত্যার নির্দেশ :

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন বড় বড় কাফিরের রক্ত অনর্থক ঘোষণা করেন এবং বলেন, যদি তাদেরকে কাবা ঘরের পর্দার নিচেও পাওয়া যায়, তবুও তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের নাম হচ্ছে,

১. আবুল উযযা বিন খাত্তাল।
২. আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ।
৩. ইকরামা বিন আবু জাহেল।
৪. হারিস বিন নুফাইল বিন ওয়াহাব।
৫. মাকীস বিন সাবাব।
৬. হাব্বার বিন আসওয়াদ।
৭. ও ৮. ইবনে খাত্তালের দুই দাসী।
৯. সারাহ নামক এক দাসী।

অবশেষে এদের মধ্যে সর্বমোট চারজন তথা আবুল উযযা বিন খাত্তাল, মাকীস বিন সাবাব, ইবনে খাত্তালের দুই দাসীর মধ্যে একজন দাসী এবং সারাহ নামক এক দাসীকে হত্যা করা হয় এবং বাকি পাঁচজনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে একনিষ্ঠ মুসলিম হয়ে যায়।[১০৫]

কাবা ঘরের চাবি :

কাবা ঘরের চাবির দায়িত্ব পাওয়াটা ছিল অনেক সম্মানের ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা ঘরের দরজা খোলার পর যার হাতে চাবি দিয়েছিলেন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে চাবির দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন জানালেন এবং

---

[১০৪] সহীহ মুসলিম, হা/১৩২৯।
[১০৫] নাসাঈ, হা/৪০৬৭; মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/২০০৩; মিশকাত, হা/৩১৮০।

এদিকে আব্বাস (রাঃ)-ও এ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ দায়িত্বের জন্য তাকেই পছন্দ করলেন, যে ইতিপূর্বে দায়িত্ব পালন করে আসছিল এবং তার কাছ থেকে দায়িত্ব কেড়ে নেয়াকে যুলুম মনে করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান বিন তালহা (রাঃ)-কে ডেকে তাকেই এ দায়িত্ব প্রদান করলেন

শুকরিয়ার নামায আদায় :

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রাঃ) এর ঘরে গমন করে গোসল করেন এবং বিজয়ের শুকরিয়াস্বরূপ সেখানেই দুই রাক'আত নামায আদায় করেন।

কাবা ঘরের ছাদে বেলাল (রাঃ) এর আযান :

মক্কায় প্রবেশ করে এসব কাজ করতে থাকাবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলাল (রাঃ)-কে কাবা ঘরের ছাদে উঠে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ফলে তিনি তাই করলেন।

মক্কাকে হারাম ঘোষণা :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় দিন সকলের সামনে আরো একটি ভাষণ দান করলেন। তাতে ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সে দিনই মক্কাকে হারাম (নিষিদ্ধ শহর) করে দিয়েছেন। এ কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম বা পবিত্র থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য এটা বৈধ হবে না যে, সে এখানে রক্তপাত ঘটাবে অথবা এখানকার কোন বৃক্ষ কর্তন করবে। কেউ যদি এ কারণে জায়েয মনে করে যে, আল্লাহর রাসূল এখানে যুদ্ধ করেছেন তবে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা বৈধ করেছিলেন। অতঃপর আজ তার পবিত্রতা অনুরূপভাবে ফিরে এসেছে যেমনটি গতকাল ছিল। এখন এটা অপরিহার্য প্রয়োজন যে, যারা উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিতদের নিকট এই বাণী পৌঁছে দেবে।

অন্য বর্ণনায় আছে, এ সময় তিনি এ কথাও বলেন যে, এখানে কোন গাছ কাটা বৈধ নয়, শিকার তাড়ানো ঠিক নয় এবং পড়ে থাকা কোন জিনিস উঠানোও ঠিক নয়। তবে সেই ব্যক্তি নিতে পারবে, যে সেটা নিয়ে প্রচার করবে। তাছাড়া কোন প্রকার ঘাসও উপড়ানো যাবে না। এ সময় আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির ঘাসের অনুমতি দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বেশ– ইযখির ঘাসের ব্যাপারে অনুমতি রইল।[১০৬]

---

[১০৬] সহীহ বুখারী, হা/২৪৩৪; সহীহ মুসলিম, হা/১৩৫৫।

মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে কতিপয় ঘটনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ১৯ দিন অবস্থান করেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছিলেন। যেমন–

উযযা নামক দেবমূর্তি বিনষ্ট করা :

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের মৌলিক কার্যাবলি ভালোভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে সকল প্রকার শিরককে উচ্ছেদ করার কাজে হাত দেন। এজন্য প্রথমে নির্দেশ দেন উযযা নামক দেবমূর্তি বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য, যা ছিল নাখলা নামক স্থানের একটি মন্দিরে অবস্থিত। এ উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত মাসের ২৫ তারিখে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। ফলে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) সেটা বিনষ্ট করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফিরে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কিছু দেখেছিলে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তুমি তা ভাঙনি। সুতরাং তুমি আবার যাও এবং তা ভেঙ্গে দাও। তখন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) আবার গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট একজন মহিলা তাঁর দিকে তেড়ে আসছে। তখন তিনি তাকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বললেন, হ্যাঁ– এটাই ছিল উযযা।[১০৭]

সোয়া নামক দেবমূর্তি বিনষ্ট করা :

এটি ছিল মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে রেহাত নামক স্থানে বনু হুযাইল গোত্রের মধ্যে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর বিন আস (রাঃ)-কে প্রেরণ করে সেটিকে বিনষ্ট করে দেন। আমর বিন আস (রাঃ) যখন সেই মূর্তিটি ভাঙতে যান, তখন মন্দিরের প্রহরী বলল, তোমরা কী চাও? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এটা ভাঙ্গার জন্য পাঠিয়েছেন। সে বলল, তোমরা এতে সক্ষম হবে না। তিনি বললেন, কেন? সে বলল, তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হবে। তিনি বললেন, তুমি এখনো বাতিলের উপর রয়েছ? সে কি শুনতে পায়, না দেখতে পায়? এ কথা বলেই আমর বিন আস (রাঃ) মূর্তিটিকে গুঁড়িয়ে দেন। তারপর প্রহরীকে বললেন, এবার তোমার মত কী? সে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আর এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল এ মাসেই।[১০৮]

---

[১০৭] যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৫; সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/১১৫৪৭।
[১০৮] তারীখে ত্বাবারী ৩/৬৬; যাদুল মা'আদ ৩/৩৬৫।

মানাত দেবমূর্তি বিনষ্ট করা :

এ মাসেই আরো একটি বড় দেবমূর্তি বিনষ্ট করা হয়। সেটি হলো মানাত দেবমূর্তি। এটি ছিল মোশাল্লাল নামক স্থানে। জাহেলী যুগে এটিই ছিল আওস, খাযরাজ, গাসসান এবং অন্যান্য গোত্রের উপাস্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ বিন যায়েদ আশহলী (রাঃ) এর নেতৃত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করে মূর্তিটি বিনষ্ট করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সময় মুসলিম বাহিনী মূর্তির দিক থেকে একজন উলঙ্গ, কালো ও বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন। তখন মন্দিরটির প্রহরী বলেছিল, মানাত! তুমি এই অবাধ্যদের ধ্বংস করো। তখন সা'দ (রাঃ) তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেলেন এবং মূর্তিটিকেও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেন।

হুনাইন এর যুদ্ধ

হুনাইন হচ্ছে যুল মাজায নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। সেটি ছিল মক্কা থেকে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। মক্কা বিজয়ের পর কাফিরদের সাথে মুসলিমদের সর্বপ্রথম যুদ্ধটি এখানেই সংঘটিত হয়েছিল।

প্রেক্ষাপট :

মক্কা বিজয়ের ফলে মক্কাবাসীসহ আশেপাশের অনেক গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি ও গোত্র বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল বনু হাওয়াযিন এবং বনু সাকীফ গোত্র। তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল মুযার, জোশাম, সা'দ বিন বকরের গোত্রসমূহ এবং বনু হেলাল গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক। আর তাদের নেতৃত্বে ছিল মালেক বিন আওফ নাসরী।

কাফিরদের যাত্রা :

অবশেষে কাফিররা সকল প্রস্তুতি শেষে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ৪ হাজার সেনা নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ সময় তারা তাদের ধনসম্পদ, গবাদি পশু, শিশু ও মহিলাদেরকেও সাথে নিয়ে এসেছিল। যাতে করে তাদের সৈনিকরা নিজেদের পরিবারের তাগিদে প্রবলভাবে যুদ্ধ করে এবং কোন ধরনের পিছুটান না থাকে। তারপর তারা প্রথমে আওতাস নামক উপত্যকায় অবতরণ করে, যা ছিল হুনাইন নামক উপত্যকার পার্শ্বেই অবস্থিত। পরে তারা সেখান থেকে যাত্রা করে হুনাইন নামক স্থানে পৌঁছে।

মুসলিমদের যাত্রা :

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খবর পেয়ে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন। আর সে সময় তিনি মক্কাতেই ছিলেন। অবশেষে তিনি

যখন মুসলিম বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন, তখন ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মক্কায় অবস্থানের ১৯তম দিন তথা হিজরী ৮ম বর্ষের শাওয়াল মাসের ৬ষ্ঠ দিন। আর এ অভিযানে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২ হাজার; অথচ তিনি মাত্র ১৯ দিন পূর্বে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছিলেন। এই যুদ্ধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ান বিন উমাইয়া (রাঃ) এর নিকট থেকে একশত লৌহ বর্ম নিয়েছিলেন এবং আত্তাব বিন আসীদ (রাঃ)-কে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

কিছু মুসলিমের আত্ম অহংকার প্রকাশ :

ইতিপূর্বে যে কোন যুদ্ধে শত্রু পক্ষের সেনাবাহিনীর তুলনায় মুসলিমদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু এ যুদ্ধটি ছিল ব্যতিক্রম। এ যুদ্ধে শত্রুদের সেনাবাহিনীর তুলনায় মুসলিমদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল বেশি। যার কারণে কিছু কিছু মুসলিম আত্মগর্ব করে বলাবলি করছিল যে, আমরা কখনো পরাজিত হব না। কিন্তু এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণভাবে মনঃক্ষুণ্ন ও ব্যথিত হয়েছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলাও এর উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হঠাৎ তীর নিক্ষেপ :

অতঃপর মুসলিম বাহিনী যখন হুনাইনে গিয়ে উপস্থিত হলো, তখন ছিল শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ। কাফির বাহিনী মুসলিম বাহিনীর পূর্বেই সেখানে পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলিমগণ সেটা জানতেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেনাবিন্যাস করে নিজেদের অবস্থান নিলেন, তখন শত্রু বাহিনী গুপ্তস্থান থেকে তাদের উপর আকস্মিকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এতে মুসলিমগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পালাতে শুরু করল। অবশেষে দেখা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ১২ জন মতান্তরে ৯ বা ১০ কিংবা ১০০ জন থেকে কিছু সংখ্যক কম লোক ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

মুসলিম বাহিনীর সমবেত হওয়া :

শত্রুবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে মুসলিমগণ যখন এলোমেলোভাবে ছোটাছুটি করছিল, তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ গুটি কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের মতো অটল রইলেন। এ সময় তিনি একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করলেন এবং সেটিকে শত্রুদের দিকে ছুটার জন্য বারবার উত্তেজিত করলেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান বিন হারিস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খচ্চরের লাগাম ধরে টানছিলেন এবং আব্বাস (রাঃ) খচ্চরের রেকাব ধরে তাঁকে থামিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীর এরূপ অবস্থা দেখে বারবার একত্রিত হওয়ার আহ্বান করছিলেন; কিন্তু অল্প কয়েকজন ব্যতীত কেউই কর্ণপাত করল না। তারপর তিনি লোকদেরকে আহ্বান করার জন্য আব্বাস (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি এ বলে

আহ্বান করলেন যে, হে বৃক্ষসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তথা বাই'আতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ! তখন এ ডাক শুনে তারা সকলে খুব দ্রুততার সাথে ফিরে আসে। তারপর তিনি আনসারদেরকে আহ্বান করতে থাকলেন, ফলে তারাও খুব দ্রুততার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মিলিত হয়ে গেল।

মাটি নিক্ষেপ :

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুষ্ঠি মাটি হাতে নিয়ে শত্রুদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন।[১০৯] এতে দেখা গেল যে, শত্রুপক্ষের এমন কোন লোক ছিল না, যার চক্ষুর মধ্যে উক্ত মাটির কোন কণা প্রবেশ করেনি। আর মুসলিমগণ এই সুযোগে শত্রুপক্ষের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসেন।

শত্রুপক্ষের পলায়ন :

মুসলিমদের এ আক্রমণের সাথে সাথেই শত্রুরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আর টিকতে না পেরে পালাতে থাকে। তাদের মধ্যে কিছু লোক চলে যায় নাখলার দিকে এবং কিছু চলে যায় আওতাসের দিকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় দলের পেছনে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে ধাওয়া করেন। এছাড়াও শত্রুপক্ষের সবচেয়ে বড় দলটি তায়েফের পথে পলায়ন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই সে দলটির পেছনে ধাওয়া করেন।

গনীমতের মাল :

যুদ্ধ শেষে মুসলিমগণ অনেক গনীমত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে যুদ্ধবন্দী ছিল ৬ হাজার, উট ছিল ২০ হাজার, বকরি ছিল ৪০ হাজারের বেশি এবং রৌপ্য ছিল ৪ হাজার উকিয়া (অর্থাৎ এক লক্ষ ষাট হাজার দিরহাম)। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল সম্পদ একত্রিত করার নির্দেশ দেন। তারপর সেগুলো জিইররানা নামক স্থানে জমা রেখে মাসউদ বিন আমর গিফারী (রাঃ)-কে এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তায়েফ বিজয় করে অবসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেগুলো বণ্টন করেননি।

আওতাস অভিযান :

আওতাস হচ্ছে হুনাইনের পার্শ্ববর্তী একটি জায়গার নাম। হুনাইন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে একদল মুশরিক এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু আমের আল-আশআরী (রাঃ) এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অতঃপর তারা সেখানে গিয়ে তাদেরকে হটিয়ে দেন। তবে দলনেতা আবু আমের (রাঃ) শহীদ হন।

মৃত্যুর সময় তিনি ভাতিজা আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে তার স্থলাভিষিক্ত করে যান এবং এ অসিয়ত করে যান যে, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

---

[১০৯] সহীহ মুসলিম, হা/১৭৭৭; মিশকাত, হা/৫৮৯১।

তার সালাম পৌঁছে দেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করেন। অতঃপর ফিরে এসে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ দিলে তিনি প্রথমে অযু করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।[১১০]

নাখলা অভিযান :

নাখলা হচ্ছে হুনাইনের পার্শ্ববর্তী অন্য একটি জায়গার নাম। হুনাইনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এখানেও একটি দল আশ্রয় নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে সংবাদ পেয়ে যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালান। এতে তাদের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও দূরদর্শী নেতা দুরায়েদ বিন ছিম্মাহ নিহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়।

যুল-কাফফাইন মূর্তি ধ্বংসকরণ :

যুল-কাফফাইন হলো আমর বিন হুমামাহ দাওসী গোত্রে অবস্থিত একটি মূর্তির নাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন বিজয় করে তায়েফের পথে যাত্রাকালে তোফায়েল বিন আমর দাওসী (রাঃ) এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি এ নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তার সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চান এবং তাদেরকে তায়েফে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি দ্রুত সেখানে গমন করেন এবং যুল-কাফফাইন মূর্তি ধ্বংস করে দেন। তারপর তিনি ৪০০ দ্রুতগামী লোককে নিয়ে তায়েফে চলে আসেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ব থেকেই অবস্থান নিয়েছিলেন।[১১১]

তায়েফ অভিযান :

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন থেকে ফেরার পর পরই তায়েফের দিকে মনোনিবেশ করেন। ফলে তিনি কয়েকদিন পরেই খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও তায়েফের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে তিনি লিয়াহ নামক স্থানে অবস্থিত মালেক বিন আওফের একটি দুর্গ ভেঙ্গে ফেলেন। তারপর তিনি তায়েফে গমন করে সেখানকার দুর্গ অবরোধ করেন। অতঃপর সেটি তিনি ৪০ দিন মতান্তরে ১০/১৫/১৮/২০ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। এ সময় দুর্গের ভেতর থেকে মাঝে মধ্যে তীর, পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ হচ্ছিল। যার কারণে বেশ কয়েকজন সাহাবীও শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কামান ব্যবহার করে দুর্গের দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি করতে

---

[১১০] সহীহ বুখারী, হা/৪৩২৩।
[১১১] যাদুল মা'আদ ৩/৪৩৩-৩৪; মাগাযী ১/৮৭০।

সক্ষম হন। কিন্তু এতেও সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব হয়ে উঠল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কৌশল হিসেবে তাদের আঙ্গুর গাছসমূহ কেটে দেয়ার নির্দেশ দেন। অধিক সংখ্যক গাছ কেটে দেয়ার পর সাকীফ গোত্র আল্লাহ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে গাছ কাটা বন্ধের জন্য আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মঞ্জুর করেন।

অবরোধ চলাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এক ঘোষক ঘোষণা দেন, যে গোলাম দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করবে সে মুক্ত বা স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। এর ফলে সর্বমোট ২৩ জন ব্যক্তি দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিমদের দলভুক্ত হয়ে যায়।[১১২]

উল্লেখ্য যে, দুর্গবাসীরা পুরো এক বছরের খাদ্য এবং পানীয় মজুদ করে নিয়েছিল। যার কারণে অবরোধ ক্রমেই দীর্ঘায়িত হচ্ছিল; কিন্তু এতে মুসলিমগণ কোন অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নওফাল বিন মোয়াবিয়া দোয়েলীর পরামর্শে অবরোধ ছেড়ে দিয়ে ফিরে যান। এ যুদ্ধে ১২ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছিলেন এবং ৩ জন কাফির নিহত হয়েছিল।

গনীমতের মাল বণ্টন :

জিইররানা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব গনীমতের সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন, তায়েফ থেকে ফেরার পথে সেখানে গমন করেন। কিন্তু সেগুলো বণ্টন করতে কিছু দিন দেরি করেন– এ আশায় যে, হাওয়াযিন গোত্রের কোন প্রতিনিধি দল এসে আবেদন করবে; ফলে তিনি তা তাদেরকে ফেরত দেবেন। কিন্তু ১০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর যখন তাদের পক্ষ থেকে কেউ আসলো না, তখন তিনি সেগুলো সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করতে আরম্ভ করেন। বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি মু'আল্লাফাতুল কুলূবকে বেশি প্রাধান্য দেন। যার ফলে মক্কার বড় বড় নেতাদেরকে অনেক সম্পদ দান করেন। যেমন– আবু সুফিয়ান এবং তার দুই ছেলে ইয়াযীদ ও মুয়াবিয়া (রাঃ)-কে সর্বমোট ১৮ কেজি রৌপ্য এবং তিনশত উট দান করেন, হাকীম ইবনে হেযামকে ২০০ উট, সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে ৩০০ উট দান করেন। এছাড়া ছোট-বড় আরো অনেক নেতাকে ৪০/৫০টি করে উট প্রদান করেন। তারপর অবশিষ্ট সম্পদগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। ফলে প্রত্যেক সাধারণ সৈনিকের অংশে ৪টি করে উট ও ৪০টি করে বকরি এবং প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈনিকের অংশে ১২টি করে উট এবং ১২০টি করে বকরি ভাগে পড়ে।

[১১২] মুসনাদে আহমাদ, হা/২২২৯।

হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধির আগমন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গনীমতের মাল বণ্টন করে সামান্য অবসর হলেন, তখন হাওয়াযিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আগমন করল। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে হুনাইন যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদ ফেরত দেয়ার আবেদন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বন্দী অথবা ধনসম্পত্তি– এ দুটির মধ্যে যে কোন একটি ফেরত নিতে বলেন। ফলে তারা বন্দীদেরকে ফেরত নেয়ার জন্য মনস্থির করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত গনীমতের মধ্যে কেবল বন্দীদেরকে ফেরত দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে বলেন– দেখো, এ সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি এ উদ্দেশ্যে গনীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু দিন বিলম্বও করেছিলাম। এখন আমি তাদেরকে অধিকার প্রদান করলাম। তবে তারা অন্য কিছুকেই সন্তানাদির সমতুল্য মনে করেনি। অতএব যার নিকট আটককৃত কোন কিছু রয়েছে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে যদি সে তা ফেরত দেয়, তাহলে এটাই হবে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। আর কেউ যদি নিজ অধিকার আটকে রাখতে চায়, তা হবে তাদেরই আটককৃত। অতএব তাদেরকে সেসব ফিরিয়ে দেবে। আগামীতে সর্বাগ্রে যে গনীমতের সম্পদ অর্জিত হবে, তার মধ্য থেকে ফেরতদানকারীকে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই একটির পরিবর্তে ছয়টি দেয়া হবে।[১১৩]

এতে সাহাবীগণ সকলেই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আটককৃত বন্দীদেরকে তাদের হাতে তুলে দেন এবং এ সময় প্রত্যেক বন্দীকে একটি করে কিবতী চাদর দান করলেন।

উমরা পালন ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন :

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকেই উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন এবং উমরা পালন করলেন। তারপর আত্তাব বিন আসীদ (রাঃ)-কে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

তাবুক যুদ্ধ

মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধের পর মুসলিমগণ আরব গোত্রে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, এরপর থেকে কোন তাগুতী শক্তিই তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাচ্ছিল না। তবে মুসলিমদের শত্রু রোমানরা প্রায়ই

[১১৩] সহীহ বুখারী, হা/২৩০৮; আবু দাউদ, হা/২৬৯৩।

মুসলিমদের উত্যক্ত করে যাচ্ছিল। সে সময় তারাই ছিল বিশ্বের মোড়ল। তারাই ছিল সম্পদ ও সৈন্যের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধশালী। ইতিপূর্বে মুতার যুদ্ধের মাধ্যমে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় তারা খুবই অস্থির ছিল। উপরন্তু চারদিকে মুসলিমদের জয়ধ্বনি তাদের শরীরে কাঁটার মতো বিদ্ধ করছিল। তাদের এসব আত্মগর্বমূলক মনোবাসনাই তাদেরকে একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে ধাবিত করে।

সময় ও পরিস্থিতি :

সময়টি ছিল ৯ম হিজরী। এসময় পরিস্থিতিও ছিল খুবই নাজুক। কেননা তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, চারদিকে ছিল প্রচণ্ড গরম। অনেক মানুষ খুবই অসচ্ছলতা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে গিয়েছিল। অপরদিকে সেখানকার বাগ-বাগিচার ফলমূলও পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিল। ফলে বাগ-বাগিচাগুলোতে অবস্থান করাটা মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এসব কারণে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাদের মানসিক কোন প্রস্তুতিও ছিল না। অপরদিকে এ যুদ্ধের যাত্রাপথও ছিল খুবই দূরের এবং কষ্টের।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে রোমান ও গাসসানীদের প্রস্তুতির সংবাদ :

পরিস্থিতির এমন নাজুক অবস্থায় মুসলিমদের কাছে প্রায়ই সংবাদ আসতে থাকে যে, রোমান ও গাসসানীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ফলে রোমান ও গাসসানীদের সীমান্তবর্তী অনেক মুসলিমই তাদের ভয়ে আতঙ্কে থাকতেন এবং তারা সার্বিক পরিস্থিতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানাতেন। এমন টানটান উত্তেজনায় একদিন 'শাম' দেশ থেকে আগত নাবেক বিন ইসমাঈল বংশের এক কাফেলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারেন যে, রোমের বাদশাহ হিরাকল মুসলিমদের বিরুদ্ধে ৪০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী একত্রিত করেছেন। আর তাদের সাথে লাখমা, জোযাম এবং আরো কিছু গোত্রও যোগদান করেছে। তাদের অগ্রবর্তী দলটি বালকা নামক স্থানে পৌঁছে গেছে।

ইলার ঘটনা :

তাবুক অভিযানে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আরো একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। আর সেটি ঘটেছিল এসব টানটান উত্তেজনার মধ্যেই। ঘটনাটি সম্পর্কে উমর (রাঃ) বলেন, আমি এবং মদিনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের আমার এক আনসারী প্রতিবেশী উমাইয়া ইবনে যায়েদ; আমরা পালাক্রমে নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। যখন আমি যেতাম, আমি সারাটা দিন ওহী অবতীর্ণসহ অন্যান্য যা কিছু ঘটত; সব সংবাদ তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ সংবাদ আমাকে দিত। আমরা (কুরাইশরা) নিজেদের স্ত্রীদের উপর প্রভাবশালী ছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে আসলাম, তখন দেখতে

পেলাম, তাদের স্ত্রীগণই তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। অতঃপর ধীরে ধীরে আমাদের স্ত্রীরাও আনসারদের স্ত্রীগণের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল।

একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি 'নারাজ' হলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে তাকে কিছু বললে সেও পাল্টা জবাব দিল। সে আমার মুখে মুখে তর্ক করবে এটা আমি অপছন্দ করলাম। তখন সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা জবাব দিচ্ছি, তা আপনি অপছন্দ করছেন কেন? আল্লাহর শপথ! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাদের কেউ কেউ আবার পূর্ণ একটা দিন এমনকি রাত পর্যন্ত তাঁর প্রতি অভিমান করে কাটিয়ে দেন।

এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং তাকে বললাম, তোমাদের মাঝে যে এরূপ করেছে তার সর্বনাশ হয়েছে! এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং হাফসার কাছে গিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে বললাম, হে হাফসা! তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সারাদিন এমনকি রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট করে রাখে? সে জবাব দিল, হ্যাঁ! আমি বললাম, সে তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তোমরা কি বেপরোয়া হয়ে গেছ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ তাঁর সে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন এবং পরিণামে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে? সুতরাং নবী ﷺ-এর নিকট কোন জিনিস অতিরিক্ত দাবি করো না, তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করো না এবং তাঁর সাথে (অভিমান করে) কথা বলা বন্ধ করো না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার নিকট চেয়ে নিও এবং স্বীয় প্রতিবেশিনীর অনুকরণে অহঙ্কার করো না। কেননা সে তোমার চেয়ে বেশী রূপবতী এবং রাসূলের নিকট প্রিয়। (এখানে প্রতিবেশিনী দ্বারা আয়েশা (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।)

উমর (রাঃ) আরো বললেন, এ সময় আমাদের মধ্যে গুঞ্জন হতে লাগল যে, (সিরিয়ার) গাসসান সম্প্রদায় আমাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। একদিন আমার আনসার সঙ্গী তার পালার দিন নবী ﷺ-এর খেদমতে হাজির থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে আঘাত করল এবং প্রশ্ন করল, আমি ঘরে আছি কি না? আমি ভীত হয়ে তার নিকট বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, তা কী? গাসসানীরা কি এসে গেছে? সে বলল, না– বরং তার চেয়েও সাংঘাতিক ও ভয়ংকর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফসা তো ধ্বংস হলো এবং ব্যর্থ হলো। এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের নামায নবী ﷺ-এর সাথে আদায় করলাম। নামায শেষে নবী ﷺ মাচানে আরোহণ করলেন এবং সেখানে একাকী বসে রইলেন। আমি হাফসার নিকট গেলাম, তখন সে কাঁদছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক করিনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি

তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি মাচানের উপরে একাকী আছেন। অতঃপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিম্বরের নিকট আসলাম যেখানে একদল লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছিল। আমি তাদের নিকট কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার অন্তর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অসহ্য হয়ে পড়ছিল। সুতরাং যে মাচানে নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন আমি সেখানে গিয়ে তাঁর গোলামকে বললাম, উমরের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর ফিরে এসে বলল, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলেছি এবং আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন।

অতঃপর আমি ফিরে আসলাম এবং মিম্বরের নিকট যেখানে একদল লোক বসা ছিল, সেখানে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে অসহ্য করে তুলেছে। তাই আবার এসে গোলামকে বললাম, উমরের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করো। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন। আমি আবার ফিরে এসে মিম্বরের নিকট উপবিষ্ট লোকদের সাথে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে অসহ্য করে তুলল। ফলে আমি আবারও এসে গোলামকে বললাম, উমরের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি।

অবশেষে যখন আমি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় সে আমাকে ডেকে বলল, নবী ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট প্রবেশ করলাম, তিনি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপরে শুয়ে আছেন এবং তাতে কোন চাদর বিছানো ছিল না। তাঁর শরীরে চাটাইয়ের দাগ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তিনি খেজুর গাছের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার!

এরপর আমি দাঁড়ানো অবস্থাতেই পরিবেশ হালকা করার লক্ষ্যে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার কথার দিকে একটু মনোযোগ দিতেন। আমরা কুরাইশরা নারীদের উপর দাপট খাটাতাম। কিন্তু আমরা মদিনায় আসার পর দেখলাম যে, এখানকার নারীরা পুরুষদের অধীন করে রেখেছে। (এ কথা শুনে) নবী ﷺ মুচকি হাসলেন। অতঃপর আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমার কথা একটু খেয়াল করে শুনতেন। তারপর বললাম, আমি হাফসার নিকট গেলাম এবং তাকে বললাম, তুমি তোমার সঙ্গীনীর (আয়েশার) অনুকরণে অভিমানী হয়ো না।

সে তোমার চেয়ে অধিক রূপবতী এবং নবী ﷺ এর নিকট অধিক প্রিয়। নবী ﷺ পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর ঘরে তিনটি চামড়া ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ আপনার উম্মতকে ধনসম্পদ দান করেন। কেননা পারস্য এবং রোমকদের (যথেষ্ট) পরিমাণের ধনসম্পদ দেয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদাত করে না। (এ কথা শুনে) নবী ﷺ সোজা হয়ে বসলেন, (এতক্ষণে) তিনি ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! এটা কি তোমার অভিমত? এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা তাদের ভাল কাজের বিনিময় এ দুনিয়ায় পাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।

এভাবে নবী ﷺ ২৯ দিন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীগণ থেকে পৃথক থাকেন। কেননা ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসা (রাঃ)-কে একটি কথা গোপন রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সে কথা আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বলে দেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন, তখন তাদের প্রতি রাগের কারণে নবী ﷺ বলেছিলেন, আমি এক মাসের জন্য তাদের (স্ত্রীগণের) নিকট যাব না। সুতরাং ২৯ দিন হলে নবী ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশার কাছে গেলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের নিকট আসবেন না, কিন্তু এখন ২৯ দিন হয়েছে মাত্র। আমি দিনগুলো এক এক করে হিসাব করে রেখেছি। নবী ﷺ বলেন, ২৯ দিনেও মাস হয়। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ মাসটি ছিল ঊনত্রিশ দিনের। আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা (নবীর সাথে থাকা বা না থাকার) ইখতিয়ার সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং তিনি স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে দিয়েই আরম্ভ করেন। আর আমি নবীকেই গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি সকল স্ত্রীকেই ইখতিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকেই তাই বলল, যা আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন।[১১৪]

মুনাফিকদের চক্রান্ত ও মসজিদে যেরার নির্মাণ :

এদিকে মুনাফিকরাও অনবরত তাদের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। যদিও তারা ভালো করেই জানত যে, তাদের সকল প্রকার চক্রান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ব্যর্থ। এরপরও তারা মুসলিমদের এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে

---

[১১৪] সহীহ বুখারী, হা/৫১৯১।

নিজেদের চক্রান্ত পরিচালনার জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে তারা পরিকল্পনা মোতাবেক নামায আদায়ের সহজতার অজুহাত দেখিয়ে তাদের এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করে। আর যেহেতু এ কঠিন পরিস্থিতিতে তাদেরকে নিয়ে পৃথকভাবে ভাবার সময় ছিল না, তাই তিনিও স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দেন। অতঃপর তারা মসজিদ নির্মাণ করে উদ্বোধনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দিলে তিনি যুদ্ধের অজুহাতে তাদেরকে এড়িয়ে যান।

যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের প্রস্তুতি :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব সংকটময় পরিস্থিতি খুব মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন এবং প্রয়োজন অনুসারে মুসলিমদেরকে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পরিস্থিতি যখন চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছিল এমনি মুহূর্তে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে রোমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দেন এবং মক্কার বিভিন্ন গোত্র ও অধিবাসীদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন।

এদিকে যেহেতু সে সময়টি ছিল খুবই সংকটময়, ফলে অনেকের কাছেই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আরোহী পর্যন্তও ছিল না। যার কারণে অনেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আরোহী অথবা অস্ত্রের জন্য আবেদন করতেন। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা সাদাকার ফযীলত বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করেন। ফলে সাহাবীগণ উৎসাহিত হয়ে সাদাকার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ সাদাকা করতে থাকেন। এমনকি মহিলারাও তাদের ব্যবহৃত অলংকার সাদাকা করতে থাকে। এ সময় কেবল উসমান (রাঃ) ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, ৯০০ উট এবং ১০০ ঘোড়া দান করেছিলেন।[১১৫] উমর (রাঃ) দান করেছিলেন তার সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক এবং আবু বকর (রাঃ) দান করেছিলেন তার সমস্ত সম্পদ, যদিও তা ছিল পরিমাণে অন্যদের থেকে অনেক কম।[১১৬]

এছাড়াও আব্বাস, তালহা, সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ) সহ প্রায় সাহাবীই এ সাদাকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি কোন কোন সাহাবী এক মুদ অথবা দুই মুদ পরিমাণও সম্পদ সাদাকা করেন। সে সময় কেবল মুনাফিকরাই কোন প্রকার দান-সাদাকায় অংশগ্রহণ করেনি; বরং উল্টো তারা দান-সাদাকার কারণে কতক সাহাবীকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল।

---

[১১৫] মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৬৪৯; তিরমিযী, হা/৩৭০১; মিশকাত, হা/৬০৬৪।
[১১৬] তিরমিযী, হা/৩৬৭৫; আবু দাউদ, হা/১৬৭৮; মিশকাত, হা/৬০২১।

তাবুকের পথে যাত্রা :

প্রস্তুতি শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)-কে মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করে তাবুকের পথে যাত্রা শুরু করেন। আর নিজ পরিবারের দেখাশোনা করার জন্য আলী (রাঃ)-কে মদিনায় রেখে যান। এ সময় মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে এত বেশি সংখ্যক সৈন্য একত্রিত হয়নি। ব্যাপক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও যাত্রাপথে মুসলিমগণকে চরম খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কোন কোন সময় তাঁদেরকে গাছের পাতা খেয়েও সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তাবুকের পথে যাত্রার সময় মুসলিমদেরকে সামুদ জাতির বসবাসের এলাকা দিয়ে গমন করতে হয়েছিল। তখন তাঁরা আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে সে এলাকা অতিক্রম করেছিলেন।[১১৭] যাত্রাপথে রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেছিলেন।[১১৮]

তাবুকের বুকে মুসলিম শিবির :

এভাবে মুসলিমগণ তাবুকে গিয়ে অবতরণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এতে মুসলিমগণ নিজেদের সংকটের কথা ভুলে গিয়ে যুদ্ধের জন্য আরো তৎপর হয়ে উঠেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে শত্রু বাহিনীর মনে চরম ভীতি সঞ্চার হয়। ফলে তারা যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি :

মুসলিম বাহিনীর আগমন এবং রোমান বাহিনীর পিছু হটার কারণে আশেপাশের গোত্রগুলো রোমান শক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সন্ধিচুক্তি করার জন্য এগিয়ে আসে। আয়লার গভর্নর ইয়াহনাহ বিন রুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উপস্থিত হয়ে কর দানের স্বীকৃতি জ্ঞাপন পূর্বক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে। জারবা ও আজরুহ এর অধিবাসীরা অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে লিখিত প্রমাণপত্র গ্রহণ করে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে ৪২০ জন সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দুমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদকে আটক করে আনেন এবং তার কাছ থেকে নগদ সম্পদ গ্রহণ পূর্বক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেন।

---

[১১৭] সহীহ বুখারী, হা/৪৪১৯; সহীহ মুসলিম, হা/২৯৮০; মিশকাত, হা/৫১২৫।

[১১৮] সহীহ মুসলিম, হা/৭০৫; আবু দাউদ, হা/১২০৮; তিরমিযী, হা/৫৫৩; মিশকাত, হা/১৩৪৪।

মদিনায় প্রত্যাবর্তন :

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত করার পর কোন ধরনের সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয় ছাড়াই মদিনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে মুনাফিকরা সুযোগ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিচয় ফাঁস করে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় পৌঁছলেন, তখন মহিলা ও কিশোররা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নানা ধরনের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানান।

উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের শেষ যুদ্ধ, যাতে তিনি স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মসজিদে যেরার ধ্বংসকরণ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবীদেরকে নিয়ে তাবুক যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন, তখন মুনাফিকরা তাদের এলাকায় নির্মিত মসজিদে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে নেমে পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে জোট গঠন করতে শুরু করে। তাদের এহেন কুকর্ম ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য তাবুক যুদ্ধ থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পথে 'যী আওয়ান' নামক স্থানে পৌঁছলেই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যাপারে নির্দেশনা সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ - لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

যারা (মুসলিমদের) ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে, অবশ্যই তারা শপথ করে বলবে যে, আমরা সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এটা (নির্মাণ) করেছি; (কিন্তু) আল্লাহ সাক্ষী যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো তাতে (সালাতে) দাঁড়িয়ো না; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে, সেটাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক রয়েছে, যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে; আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা তওবা- ১০৭, ১০৮)

ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে সাথেই কয়েকজন সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়ে মদিনায় প্রেরণ করে তাদের নির্মিত সেই মসজিদটি ধূলিসাৎ করে দেন।

পেছনে পড়ে যাওয়া লোকদের শাস্তি :

তাবুক যুদ্ধ ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে চরম পরীক্ষার একটি যুদ্ধ। যদিও এ যুদ্ধে কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় নাই, তবুও আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে সুস্পষ্টভাবে যাচাই করে নিয়েছিলেন। ফলে যাদের অন্তরে সামান্য কপটতা ছিল, তাদের বিষয়গুলো প্রকাশ পেয়ে গেল। কিন্তু তিনজন সাহাবী এমন ছিলেন যে, তাদের ঈমানের মধ্যে কোন ধরনের ত্রুটি ছিল না, এরপরও সামান্য কারণে তারা পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুলের ব্যাপারে কিছুটা বিলম্ব করেন। নিম্নে সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে তাবুক ও বদর ছাড়া আর কোনটাতেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যারা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের কারো উপর আল্লাহর আক্রোশ পতিত হয়নি। বদর যুদ্ধে মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশ কাফিলার পশ্চাদ্ধাবন করা (যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়)। তবে হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে তাদের শত্রুর মুখোমুখি করে দেন, যাতে করে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আর লাইলাতুল আকাবায় (আকাবার রাতে) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ইসলামের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়িম থাকার জন্য আমাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। যদিও বদর যুদ্ধ লোকদের কাছে বহুল আলোচিত, তবুও আকাবার রাত আমার কাছে অধিক প্রিয়।

আর তাবুক যুদ্ধে পিছিয়ে থাকার কারণস্বরূপ বলা যায়, এ যুদ্ধের সময় আমি (অন্য সময়ের চেয়ে) বেশি শক্তিশালী ও সচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমার কাছে কখনো এক সাথে দুটি সওয়ারী ছিল না। অথচ এ যুদ্ধের প্রাক্কালে আমি দুটি সওয়ারীর মালিক হয়ে গিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি কোন যুদ্ধের সংকল্প করতেন, কখনো পরিষ্কারভাবে সে যুদ্ধের স্থান, এলাকা ও কোন নিদর্শন জানাতেন না (বরং কিছু অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক শর্ত বলে দিতেন), কিন্তু এ যুদ্ধের সময় ভীষণ গরম ছিল এবং পথ ছিল সুদীর্ঘ। আর স্থানটি ছিল পানি, গাছ-পালা ও লতা-পাতা শূন্য। শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলিমদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, যাতে তারা ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বিপুল সংখ্যক

মুসলিম সেনা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে কোন কিতাব অথবা রেজিস্ট্রার খাতা ছিল না, যার মধ্যে সবার নাম লিপিবদ্ধ রাখা হত।

কা'ব (রাঃ) বলেন, এ যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করে এমন একটি লোকও ছিল না। তবে সাথে সাথে তারা এও মনে করত, কেউ যদি এ যুদ্ধে অনুপস্থিত থেকে যায়, তাহলে আল্লাহর ওহী না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারবেন না। এ যুদ্ধের প্রস্তুতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক সময় শুরু করেন, যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়ায় বসা আরামদায়ক মনে হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাথে থাকা মুসলিমগণ ব্যাপকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

অন্যদিকে আমি প্রতিদিন সকালে তাদের সাথে প্রস্তুতি নেয়ার কথা চিন্তা করতাম। সারাদিন চলে যেত, কিন্তু কিছুই করতাম না। আমি মনে মনে বলতাম, আমি তো যে কোন সময় প্রস্তুত হওয়ার ক্ষমতা রাখি। কাজেই এত তাড়াহুড়া কিসের? এভাবে দিন অতিবাহিত হয়ে চলল।

একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদেরকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। অথচ তখনো কোন প্রকার প্রস্তুতি আমি নেইনি। আমি মনে মনে বললাম, এই তো দু'এক দিনের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে পথিমধ্যে তাঁদেরকে ধরে ফেলব। তাই তাঁদের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর দিন সকালে আমি যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে চাইলাম, কিন্তু দিন চলে গেল, আমি প্রস্তুতি নিতে পারলাম না। দিনের পর দিন আমার এ অবস্থা চলতে থাকল। এখন তো সবাই অনেক দূরে চলে গেছে। আমি কতবার ইচ্ছা করলাম যে, বের হয়ে আমি তাঁদেরকে ধরে ফেলি। আহা! যদি এমনটি করতাম, তাহলে কতই না ভালো হত, কিন্তু তা আমার ভাগ্যে ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চলে যাওয়ার পর আমি যখন শহরের লোকদের মাঝে বের হতাম, তখন পথে-ঘাটে কেবল মুনাফিকদেরকে অথবা দুর্বল হওয়ার কারণে আল্লাহ যাদেরকে অক্ষম করে দিয়েছেন তাদেরকে দেখতে পেতাম। এদের ছাড়া আর কাউকে আমি পথে-ঘাটে দেখতাম না। তখন আমার মনে ভীষণ দুঃখ হত।

এ দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পথে কোথাও আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না। তবে তাবুকে পৌঁছে যখন সবাইকে নিয়ে বসলেন, তখন আমার কথা জিজ্ঞেস করে বললেন, কা'ব ইবনে মালিকের কী হলো? বনু সালামার জনৈক ব্যক্তি [আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ)] বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ ও অহংকার তাকে আটকে দিয়েছে। মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেন, তুমি তো ভালো কথা বললে না। আল্লাহর কসম! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রইলেন।

কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, যখন আমি জানতে পারলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধ হতে (বিজয়ীবেশে) ফিরে আসছেন। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, এমন কোন মিথ্যা বাহানা করা যায় কি না, যাতে আমি তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি পরিবারের বুদ্ধিমান লোকদের পরামর্শ চাইলাম, কিন্তু যখন শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার একেবারে নিকটে এসে গেছেন, তখন আমার মন থেকে মিথ্যা বাহানাবাজি করার চিন্তা একেবারে উড়ে গেল। আমি বিশ্বাস করলাম, মিথ্যা বাহানাবাজি আমাকে তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই আমি সত্য কথা বলতে মনস্থ করলাম।

অতঃপর একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় পৌঁছে গেলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, প্রথমে মসজিদে নববীতে যেতেন। সেখানে দু'রাক'আত নামায পড়তেন, তারপর লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বসে থাকতেন।

নিজের নিয়মানুসারে যখন তিনি মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায শেষে বসে গেলেন, তখন তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা আসতে লাগল, নিজেদের ওজর পেশ করতে লাগল এবং কসম করতে লাগল। এদের সংখ্যা ছিল ৮০ এর চেয়েও কিছু বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ওজর কবুল করে তাদের কাছ থেকে পুনরায় বাই'আতও নিলেন। তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন এবং তাদের মনের গোপন বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলেন।

কা'ব বলেন, এ সময় আমি তাঁর কাছে আসলাম। আমি সালাম দিতেই মুচকি হেসে তিনি জবাব দিলেন। তারপর বললেন, আসো আসো! আমি গিয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কিসে পেছনে আটকে রেখেছিল? তুমি সওয়ারী কিনেছিলে? আমি বললাম, আমি অবশ্যই সওয়ারী কিনেছিলাম। তবে আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনাকে ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন লোকের সামনে বসতাম, তাহলে তার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতাম। কেননা কথা বলার ব্যাপারে আমি কম পারদর্শী নই; কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি, আজ যদি আমি মিথ্যা বলে আপনাকে খুশি করে যাই, তাহলে কাল আল্লাহ আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্টি করে দেবেন। আর আজ যদি আমি আপনার সামনে সত্য কথা বলে যাই, তাতে আপনি অসন্তুষ্টি হলেও, আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের আশা আছে। তাই আমি সত্য কথা বলছি। আল্লাহর কসম! পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনাদের থেকে পেছনে থেকে যাই, তখনকার মতো আর কোন সময় আমি ততটা শক্তি সামর্থের অধিকারী ছিলাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কা'ব সত্য কথাই বলেছে। ঠিক আছে, এখন চলে যাও। দেখি, আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কী ফায়সালা দেন।

কা'ব বলেন, আমি উঠে পড়লাম। বানু সালামার লোকেরাও আমার সাথে সাথে চলে আসলো। তারা আমাকে বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তো এ পর্যন্ত তোমার কোন গুনাহের কথা জানি না। পেছনে থেকে যাওয়া অপরাপর লোকদের মতো তুমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে একটা বাহানা উপস্থাপন করতে পারলে না? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইস্তিগফার তোমার গুনাহের জন্য যথেষ্ট হত? আল্লাহর কসম! তারা বার বার আমাকে উসকানি দিতে থাকল। এমনকি এক পর্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ফিরে আসতে এবং আমার প্রথম কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে মনস্থ করলাম।

তারপর আমি তাদেরকে বললাম, আচ্ছা! আমার মতো ভুল স্বীকার করেছে, এমন আর কাউকে কি তোমরা সেখানে দেখেছ? তারা জবাব দিল, হ্যাঁ– দু'জন লোককে আমরা দেখেছি, তারাও তোমার মতোই বলেছে। আর তাদেরকেও ঠিক সে কথাই বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তারা কারা? তারা জবাব দিলেন, তারা দু'জন হচ্ছেন মুররাহ ইবনে রাবী 'আল-আমাবী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়াহ আল-ওয়াকিফী। তারা আমার কাছে এমন দু'জন লোকের কথা বলল, যারা ছিলেন সৎ এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি। তাদের দু'জনের কথা যখন তারা আমাকে শোনাল (তখন আমি মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলাম), তারপর আমি চলতে শুরু করলাম।

এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে যাওয়া আমাদের এ তিন জনের সাথে কথাবার্তা বলা সকল মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। কাজেই লোকেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগল। মনে হচ্ছে তারা যেন আমাদেরকে একেবারেই চেনেন না। অবশেষে আমার এমন মনে হতে লাগল, যেন দুনিয়ার সবকিছু বদলে গেছে। এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্চাশটি রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। আমার অন্য ভাই দু'টি তো ঘরেই বসে রইলেন এবং কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তবে আমি ছিলাম যুবক ও সাহসী। তাই আমি বাইরে বের হতাম, মুসলিমদের সাথে নামাযে যোগ দিতাম ও বাজারে ঘুরাফেরা করতাম; কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতেন না।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসতাম। তিনি নামাযের পর মজলিসে বসতেন। আমি তাঁকে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ল কি নড়ল না। তারপর আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম। আমি বাঁকা দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম। আমি দেখতাম, যখন আমি নামাযে নিমগ্ন থাকি তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি যখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন চলে গেল।

এভাবে লোকদের বিমুখতা আমাকে দিশেহারা করে তুলল। তাই একদিন আমার চাচাত ভাই আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকে তার কাছে গেলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জবাব দিল না। আমি তাকে বললাম, হে আবু কাতাদা! আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি জান না, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি? সে চুপ করে থাকল। আমি আবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। এবার সে জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ সময় আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমার দু'চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি পড়তে থাকল। অতঃপর আমি দেয়াল টপকে ফিরে এলাম।

একদিন আমি মদিনার বাজারে হাঁটছিলাম। তখন সিরিয়ার জনৈক খ্রিস্টান কৃষক মদিনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে এসেছিল। সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করছিল, কে আমাকে কা'ব ইবনে মালিকের ঠিকানা বলে দিতে পারবে? লোকেরা তাকে ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিল। অতঃপর সে আমার কাছে এসে গাসসানের রাজা কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠি দিল। চিঠিতে রাজা লিখেছে, আমি জানতে পেরেছি, আপনার নেতা আপনার উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেননি। আপনি আমাদের এখানে চলে আসুন, আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরামের সাথে রাখব। চিঠিখানা পড়ে আমি মনে মনে বললাম, এটা আর এক পরীক্ষা। কাজেই পত্রটি আমি তন্দুরের আগুনে নিক্ষেপ করলাম। এভাবে পঞ্চাশদিনের মধ্যে চল্লিশদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বার্তাবাহক আমার কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে স্ত্রী থেকেও পৃথক হয়ে যাওয়ার আদেশ করেছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দেব? তিনি বললেন, না– তুমি তাকে তালাক দেবে না; তবে তার থেকে আলাদা থাকো। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি নিজের আত্মীয়দের কাছে চলে যাও। আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে অবস্থান করো। এদিকে আমার অন্য দু'জন সাথির কাছেও এ মর্মে বার্তাবাহক পাঠানো হয়।

কা'ব বলেন, হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) এর স্ত্রী (এ খবর পাওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হিলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোন খাদেম নেই। যদি আমি তার খেদমত করি ও তার কাজে সহায়তা করি, তাহলে কি কোন ক্ষতি আছে? তিনি জবাব দিলেন, না– কোন ক্ষতি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! তার মধ্যে এ

ধরনের কোন আকাঙ্ক্ষা-আকর্ষণ নেই। বরং যেদিন থেকে এ ঘটনা ঘটেছে, সেদিন থেকে সে কেঁদেই চলেছে, আজও কাঁদছে।

কা'ব বলেন, আমাকেও আমার পরিবারের কেউ কেউ বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে যাও, অনুমতি নিয়ে আসো, যাতে তোমার স্ত্রী তোমার খেদমত করতে পারে, যেমন হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী স্বামীর খেদমতের অনুমতি নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে কোন অনুমতি আনতে যাব না। জানি না, আমি যখন এ ব্যাপারে অনুমতি চাইব, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কী বলবেন? কারণ আমি একজন যুবক।

এভাবে আরো দশ রাত অতিবাহিত হয়ে পঞ্চাশতম রাত্রিও অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর আমি পরের দিন সকালে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘরের সামনে বসে ছিলাম। আমার মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মনে হচ্ছিল, জীবন ধারণ আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবী যেন তার সমস্ত বিস্তীর্ণতা ও প্রশস্ততা সত্ত্বেও আমার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন সময় আমি 'সালআ' পাহাড়ের উপর থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম- কে একজন যেন খুব জোরে চিৎকার করে বলছেন, হে কা'ব ইবনে মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করো। কা'ব বলেন, আমি তখনই আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এবার আমার সংকট কেটে গেছে। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের পর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করেছেন। কাজেই লোকেরা মুবারকবাদ দেয়ার জন্য আমার কাছে আসতে লাগল। একইভাবে আমার অন্য দু' সাথির কাছেও তারা যেতে লাগল। একজন তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন। আর আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়ে পাহাড়ের উপর উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চেয়ে দ্রুততর হল। তার সুসংবাদ শুনে আমি এতই খুশি হয়েছিলাম যে, আমার পোশাক জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম।

আল্লাহর কসম! তখন আমার কাছে ঐ পোশাক জোড়া ছাড়া আর কোন পোশাক ছিল না। তারপর আমি এক জোড়া পোশাক ধার করে নিলাম এবং তা পরিধান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে বের হয়ে পড়লাম। পথে দলে দলে লোকেরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করছিল আর তওবা কবুল হওয়ার জন্য মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল, তওবা কবুল করে আল্লাহ যে তোমাকে পুরস্কৃত করেছেন, এজন্য তোমাকে মুবারকবাদ।

কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, এভাবে অগ্রসর হয়ে আমি অবশেষে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। তাঁর চারদিকে লোকেরা ঘিরে বসে ছিল। তালহা ইবনে 'উবাইদুল্লাহ (রাঃ) আমাকে দেখে দৌড়ে এসে মুসাফাহা করলেন এবং মুবারকবাদ দিলেন।

মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ এভাবে আমাকে মুবারকবাদ দেয়নি। আল্লাহ সাক্ষী, আমি কোন দিন তাঁর ইহসান ভুলব না। কা'ব (রাঃ) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলাম। তখন খুশিতে তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জল হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, হে কা'ব! আজকের দিনটি তোমার জন্য মুবারক হোক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ক্ষমা আপনার পক্ষ থেকে না মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি বললেন, না; এ তো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশি বুঝতে পারতাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে বসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তওবা কবুল হওয়ায় আমার সমস্ত ধনসম্পদ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে সাদাকা করে দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও, তাতে মঙ্গল হবে। আমি বললাম, তাহলে আমি শুধু খাইবারের অংশটুকু আমার জন্য রেখে বাকি সব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে দান করলাম। তারপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ এবার সত্য কথা বলার কারণে আমাকে নাজাত দিয়েছেন। এ তওবা কবুল হওয়ার কারণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমি সর্বদা সত্য কথাই বলতে থাকব।

আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে সত্য কথা বলার কারণে সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ আমার প্রতি যে মেহেরবানী করেছেন, তেমনটি আর কোন মুসলিমের উপর করেছেন কি না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে সত্য কথা বলার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি আর কখনো স্বজ্ঞানে মিথ্যা বলিনি। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে মহান আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবেন বলে আমি আশা রাখি। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন,

﴿لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকটকালে তার অনুসরণ করেছিল– এমনকি যখন তাদের এক দলের অন্তর বক্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন; নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকে, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল; যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সেটা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল। তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের তওবা কবুল করে নিলেন, যাতে তারা তওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা : ১১৭, ১১৮)

আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণ করার পর এর চেয়ে বড় আর কোন অনুগ্রহ আমার উপর হতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে সত্য বলার তাওফীক দান করে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্যান্য মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম।

কা'ব বলেন, আমরা তিনজন সে সব লোক থেকে আলাদা, যারা তাদের সাথে (যুদ্ধে) না যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বাহানা পেশ করেছিল, মিথ্যা হলফ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কথা মেনে নিয়ে তাদেরকে বাই'আত করে মাগফিরাতের দু'আ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তিনি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহই ফায়সালা দিয়েছেন।

যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে তিনজন, যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল (আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন) কিন্তু এ তিনজন ব্যতীত আর যারা জেনে বুঝে জিহাদ থেকে পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদের কথা এখানে বলা হয়নি, বরং এখানে কেবল আমাদের (তিনজনের) কথাই বলা হয়েছে। আর যারা হলফ করেছিল, ওজর পেশ করেছিল এবং তাদের ওজর রাসূলুল্লাহ ﷺ মেনে নিয়েছিলেন, তাদের থেকে আমাদের সম্পর্কে ফায়সালা পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।[১১৯]

উম্মে কুলসুম (রাঃ) এর মৃত্যু

উম্মে কুলসুম (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তৃতীয় কন্যা, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রথম স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) এর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়া (রাঃ) এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন।

---

[১১৯] সহীহ বুখারী, হা/৪৪১৮; সহীহ মুসলিম, হা/২৭৬৯।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর মৃত্যু

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মদিনার মুনাফিকদের নেতা। তার নেতৃত্বে মুনাফিকরা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেত। সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেও অন্তরের মধ্যে কুফরী লুকিয়ে রেখেছিল। মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করার জন্য সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকত। তবে তার ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন একজন উত্তম সাহাবী।

তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করলে ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জামাটি আমার পিতার জন্য দান করুন, এর দ্বারা তাকে কাফন দেব এবং আপনি তার জানাযা পড়াবেন ও তার জন্য ক্ষমা চাইবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের জামাটি দান করলেন এবং বললেন, আমাকে খবর দিলে আমি তার জানাযা পড়াব। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ দিলে তিনি জানাযা পড়তে উদ্যোগী হলেন। এমন সময় উমর (রাঃ) তাঁর কাপড় টেনে ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে বারণ করেননি? উত্তরে তিনি বললেন, জানাযা পড়া বা না পড়া আমার ইচ্ছাধীন (উভয়ই সমান)। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন,

﴿اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ﴾

তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না-ই কর, যদি ৭০ বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (সূরা তাওবা- ৮০)

অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায আদায় করলেন এবং ফিরে আসলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন,

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا﴾

তাদের কেউ মারা গেলে আপনি আর কখনো তাদের জানাযা পড়বেন না– (সূরা তাওবা- ৮৪)।[১২০]

নবম হিজরীর হজ্জ

তাবুক যুদ্ধের পর উক্ত বছরের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হচ্ছে, হজ্জ পালন করার উদ্দেশ্যে কতিপয় সাহাবীকে মক্কায় প্রেরণ। এদের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রাঃ)-কে মনোনীত করেন। অতঃপর

[১২০] সহীহ বুখারী, হা/১২৬৯।

মুশরিকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামা নিষ্পত্তির নির্দেশনা সম্বলিত সূরা তাওবার কয়েকটি আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রাঃ)-কেও প্রেরণ করেন, যাতে তিনি আবু বকর (রাঃ) এর সাথে মিলিত হন এবং মক্কার মুশরিকদেরকে আল্লাহর নির্দেশনামা জানিয়ে দেন। অতঃপর জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে আলী (রাঃ) জামরা তথা কংকর নিক্ষেপ করার স্থানে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, অঙ্গীকারকারীদের সকল অঙ্গীকারের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হলো এবং এ সকল বিষয় চূড়ান্ত করার জন্য চার মাস সময় দেয়া হলো।

তবে যে মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে অঙ্গীকার পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি, কিংবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকেই সাহায্য করেনি, তাদের অঙ্গীকারনামা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়।

এদিকে আবু বকর (রাঃ)-ও একদল সাহাবীদের মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, আগামীতে কোন মুশরিক কাবা ঘরে হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কাবা ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।[১২১]

এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে সুষ্ঠভাবে হজ্জব্রত পালন করে নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসেন।

দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

মূলত মক্কা বিজয়ের পর থেকেই আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তবে তাবুক যুদ্ধের পর মানুষের ইসলাম গ্রহণের গতি আরো প্রবল বেগে বৃদ্ধি পায়। কেননা মক্কা বিজয়ের পরেও আরবের যেসব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের শেষ ভরসা এই ছিল যে, হয়তোবা মুসলিমগণ রোমানদের হাতে পরাজিত হবে। কেননা সে সময় মুসলিমদের মোকাবেলা করার মতো এই একটিমাত্র শক্তিই বাকি ছিল। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যখন রোমানদের শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পেল, তখন মক্কাবাসীদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন পথই আর অবশিষ্ট রইল না। এ সময় ইসলাম গ্রহণের মধ্যে অন্যতম ছিল বনু আবদুল কাইসের প্রতিনিধি দল, উযরাহ প্রতিনিধি দল, বেলী প্রতিনিধি দল, বনু সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল, হামদান এর প্রতিনিধি দল, বনু ফাযারার প্রতিনিধি দল, নাজরানের প্রতিনিধি দল, 'তাই' এর প্রতিনিধি দল, তোজাইব এর প্রতিনিধি দলসহ আরো অনেকে। এ সময় এত বেশি সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল যে, যেখানে তাবুক যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার, সেখানে বিদায় হজ্জে অংশ নিয়েছিল ১ লক্ষ ২৪ হাজার।

---

[১২১] সহীহ বুখারী, হা/৪৬৫৬।

গভর্নর হিসেবে মুয়ায (রাঃ)-কে ইয়ামেনে প্রেরণ

ঘটনাটি ঘটেছিল ১০ম হিজরী সনে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে গভর্নর নিযুক্ত করে ইয়ামেনে পাঠান। ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে কিছু উপদেশ দান করেন এবং এ কথাও বলে দেন যে, "হে মুয়ায! এ বছরের পর তোমার সাথে আমার হয়তো আর সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। তখন হয়তোবা আমার এই মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।" মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখ থেকে এসব কথা শুনে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এ বছরের পর আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাই তিনি বিচ্ছেদ ব্যথায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদো না হে মুয়ায! নিশ্চয় কান্না শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।[১২২]

বিদায় হজ্জ

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক পালিত একমাত্র হজ্জই হচ্ছে বিদায় হজ্জ। এ হজ্জে ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহাবী তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যেহেতু এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের শেষ হজ্জ, কাজেই সার্বিক দিক থেকেই এই হজ্জের গুরুত্ব ছিল অনেক উর্ধ্বে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন সাহাবীগণও অনেকটা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, হয়তো এ বছরের পর তারা আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হজ্জে শরীক হতে পারবেন না। যার ফলেই এত বিপুল পরিমাণ সাহাবী এ হজ্জে একত্রিত হয়েছিলেন। আর এ হজ্জের মাধ্যমেই সাহাবীগণ হজ্জ পালনের যাবতীয় নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

মক্কার পথে যাত্রা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল প্রকার প্রস্তুতি শেষে এ হজ্জ পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে বের হয়েছিলেন যিলকদ মাসের ২৬ তারিখে তথা জিলহজ্জ মাসের ৪ দিন বাকি থাকতে। যখন তিনি যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। তারপর সেখানে তিনি আসরের নামায কসর করে আদায় করলেন। সে রাত তিনি সেখানেই

[১২২] মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১০৭; সিলসিলা সহীহাহ, হা/২৪৯৭।

অবস্থান করলেন। পরের দিন তিনি যোহরের নামাযের পূর্বে ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল করলেন এবং যোহরের নামাযও কসর করে আদায় করলেন। এরপর সেখান থেকেই হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে "লাব্বাইক" ধ্বনি উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। তারপর তিনি কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে আবারো "লাব্বাইক" ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে ফাঁকা ময়দানে এসে সেখানেও উচ্চকণ্ঠে "লাব্বাইক" ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে সাত দিন পর মক্কার পার্শ্ববর্তী স্থান "যী-তোওয়া" নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে যাত্রা বিরতি করেন এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। তার পরের দিন সকালে তিনি ফজরের নামায আদায় করে গোসল করেন এবং সকালেই মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন দিনটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা জিলহজ্জ রোজ রবিবার।

উমরা পালন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেই প্রথমে উমরা পালন করেন। তিনি প্রথমে কাবাঘর তাওয়াফ করেন[১২৩], তারপর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন।[১২৪] তারপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেন।[১২৫] তারপর তিনি হালাল না হয়ে সে অবস্থাতেই থেকে যান। কেননা তিনি হজ্জ ও উমরা পালনের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে ইহরাম বেঁধেছিলেন। তাছাড়া তাঁর সাথে হাদী তথা কুরবানীর পশুও ছিল।

সাহাবীদের ইতস্ততবোধ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যেসব সাহাবী এসেছিলেন, তাদের অনেকেই কুরবানীর পশু নিয়ে আসতে সক্ষম ছিলেন না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে উমরা সম্পন্ন করার পর হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে হালাল হচ্ছিলেন না, তাই সকলেই ইতস্ততবোধ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যা পরে জানলাম তা যদি আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমি সঙ্গে হাদী নিয়ে আসতাম না। তাছাড়া আমার সাথে যদি হাদী না থাকত তাহলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।[১২৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখ থেকে এসব কথা শোনার পর যাদের সাথে হাদী ছিল না তারা সকলেই হালাল হয়ে গেলেন।

---

[১২৩] সহীহ মুসলিম, হা/১২৭৪।
[১২৪] সহীহ বুখারী, হা/৪০২।
[১২৫] সহীহ বুখারী, হা/১৬০৭।
[১২৬] সহীহ মুসলিম, হা/১২১১; মিশকাত, হা/১২১৮।

মিনায় গমন :

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ (তালবিয়ার দিন) মিনায় গমন করেন এবং ইতিপূর্বে যেসব সাহাবী হালাল হয়ে গিয়েছিলেন, তারাও হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধান করে নেন। তারপর তিনি ৯ই জিলহজ্জের সকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।[১২৭]

আরাফায় অবস্থান :

তারপর তিনি আরাফায় গমন করেন এবং ওয়াদীয়ে নামিরা নামক স্থানে তাঁর তাঁবুতে অবতরণ করেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে গেলে 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে 'বাতনে ওয়াদী' নামক স্থানে গমন করেন।

আরাফার ঐতিহাসিক ভাষণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে এসে একটি ভাষণ প্রদান করেন, যা ইতিহাসে বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। তিনি ভাষণ প্রদানকালে বলেন, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য তেমন হারাম, যেমন তা হারাম তোমাদের এ দিনে, এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে। সাবধান! জাহেলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নীচে। জাহেলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি তা হলো, আমাদের বংশের রবী'আ ইবনে হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বনু সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। আর জাহেলী যুগের সুদও বাতিল হলো। আমি প্রথমেই যে সুদ বাতিল করছি তা হলো, আমাদের বংশের আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হলো।

আর তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোন লোককে আশ্রয় না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক রয়েছে।

আর আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি- যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

---

[১২৭] সহীহ মুসলিম, হা/৬৯৪, ১২১৮; সহীহ বুখারী, হা/১০৮১; ১০৮৩।

ভাষণের শেষ দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে কী বলবে? তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হক আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তর্জনী আঙ্গুল আকাশের দিকে উত্তোলন করে ইশারা করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।" এভাবে তিনি তিনবার বললেন।[১২৮]
রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ ভাষণ শেষ করলেন ঠিক তখনই এ আয়াত নাযিল হয়,

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা- ৩)
এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর পরই উমর (রাঃ) এর মর্ম বুঝতে পেরে কেঁদে ফেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহর ও আসরের নামায এক সাথে কসর আদায় করলেন।[১২৯]

মুযদালিফায় গমন :

অতঃপর ৯ই জিলহজ্জের সূর্য যখন অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা (রাঃ)-কে সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে মুযদালিফায় গমন করেন।[১৩০] সেখানে তিনি মাগরিব ও এশার নামায এক আযানে দুই একামতের মাধ্যমে আদায় করেন। এ সময় তিনি কোন নফল নামায আদায় করেননি।[১৩১] তারপর তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর ফজরের নামায আদায় করে মাশ'আরে হারামে গমন করেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন।[১৩২]

মীনায় গমন :

তারপর যখন ১০ই জিলহজ্জের সূর্য উদয় হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাসওয়া নামক সওয়ারীর উপর আরোহণ করে মীনায় গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি প্রথমে জামরায়ে কুবরাতে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি কুরবানীর স্থানে গিয়ে কুরবানী করেন। এ সময় তিনি নিজ হাতে ৬৩টি উট যবেহ করেন এবং আলী (রাঃ) এর হাতে ৩৭টি উট যবেহ করান। এভাবে তিনি সর্বমোট ১০০টি উট কুরবানী দেন।

---

[১২৮] সহীহ মুসলিম, হা/৩০০৯।
[১২৯] সহীহ বুখারী, হা/১৬৬২; মিশকাত, হা/২৬১৭।
[১৩০] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; ইবনে মাজাহ, হা/৩০৭৪; মিশকাত, হা/২৫৫৫।
[১৩১] সহীহ বুখারী, হা/১০৯২, ১৬৭৩; মিশকাত, হা/২৬০৭।
[১৩২] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮।

মাথা মুণ্ডন :

কুরবানী শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপিত ডাকেন এবং মাথা মুণ্ডন করেন।[১৩৩] অতঃপর সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ মাথা মুণ্ডন করেন, আবার কেউ কেউ চুল ছোট করেন।[১৩৪] তারপর তিনি মাথার ডান পাশের চুলগুলো নাপিত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে দেন এবং বাম পাশের চুলগুলো আবু তালহা আনসারী (রাঃ)-কে দেন এবং বলেন, এগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।[১৩৫] তারপর তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[১৩৬]

তাওয়াফে ইফাযা :

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কার দিকে যান এবং সেখানে গিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন। আর এই তাওয়াফকেই বলা হয় তাওয়াফে ইফাযা। তারপর তিনি সেখানেই যোহরের নামায আদায় করেন।

যমযম কূপের পানি পান :

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করার জন্য যমযম কূপের কাছে যান। সেখানে পূর্ব হতেই বনু আবদুল মুত্তালিব এর লোকেরা হাজীদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেখানে যমযম কূপের পানি দেয়া হলে তিনি তা পান করলেন।[১৩৭]

১০ই জিলহজ্জের ভাষণ

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ৯ই জিলহজ্জের ন্যায় ১০ই জিলহজ্জের দিন আবারো একটি ভাষণ প্রদান করেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় ভাষণটি এভাবে এসেছে যে, কাল আবর্তিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে, যে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এক বছর হয় বার মাসে, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এর তিন মাস হলো ধারাবাহিক– ১. যিলকদ, ২. জিলহজ্জ এবং ৩. মুহাররম। আর রজবও নিষিদ্ধ মাস, যা জুমাদিউস সানী এবং শা'বানের মাঝে অবস্থিত। এরপর তিনি বললেন, এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে অধিক জানেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। আমরা ভাবলাম যে, তিনি হয়তো এ মাসের নতুন কোন নাম বলবেন। এরপর তিনি

---

[১৩৩] সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৪।
[১৩৪] সহীহ বুখারী, হা/৪৪১১; সহীহ মুসলিম, হা/১৩০১; মিশকাত, হা/২৬৩৬।
[১৩৫] সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৫।
[১৩৬] সহীহ মুসলিম, হা/১৩০৩; মিশকাত, হা/২৬৪৯।
[১৩৭] সহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; নাসাঈ, হা/১৯০৫; আবু দাউদ, হা/২৭৬১; মিশকাত, হা/২৫৫৫।

বললেন, এটা কি "জিলহজ্জ" মাস নয়? আমরা বললাম, জী-হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো এর অপর কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, জী-হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। তিনি বললেন, এটা কি ইয়াওমুন নাহার (ঈদুল আযহার দিন) নয়? আমরা বললাম, জী-হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের জান ও মাল এবং রাবী মুহাম্মাদ বলেন, আমি ধারণা করি এর সাথে তিনি তোমাদের মান সম্ভ্রম এ কথা যুক্ত করে বললেন, এগুলো তেমনি পবিত্র যেমন তোমাদের কাছে আজকের এ দিবস, এ নগরী এবং এ মাস পবিত্র। তোমরা খুব শীঘ্রই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তখন তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট হয়ে একে অন্যের সাথে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়ো না। সাবধান! তোমাদের উপস্থিতগণ অবশ্যই অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ বাণী পৌঁছে দেবে। সম্ভবত অনুপস্থিত ব্যক্তি যাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয়া হবে, তাঁরা কেউ কেউ হয়তো এখানকার শ্রোতাদের চেয়ে অধিকতর সংরক্ষণকারী হবে।[১৩৮]

আইয়ামে তাশরীক :

জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে একত্রে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দিনগুলোতে মীনাতেই অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তিনি হজ্জের যাবতীয় নিয়ম-কানুন পালন করতে থাকেন এবং শিরকের নিশানাগুলো নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন। আর তিনি এ দিনগুলোতেও পূর্বের দিনের অনুরূপ ভাষণ প্রদান করেন।

বিদায়ী তাওয়াফ :

অতঃপর ১৩ই জিলহজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ মীনা হতে রওয়ানা হয়ে 'ওয়াদীয়ে আবতাহ' এর খাইফে বনু কেনানায় অবস্থান করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় ও রাত্রে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন এবং এশার নামায আদায় করার পর ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর জেগে উঠেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ গমন করে বিদায়ী তাওয়াফ পালন করেন।[১৩৯] তারপর তিনি হজ্জ পালন শেষে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান।

---

[১৩৮] সহীহ মুসলিম, হা/৪৪৭৭।
[১৩৯] সহীহ বুখারী, হা/১৭৫৬; মিশকাত, হা/২৬৬৪।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকাল

রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ থেকে ফেরার পর জীবনের বাকি দিনগুলো মদিনাতেই কাটিয়ে দেন। মূলত উক্ত হজ্জটিই ছিল বিশ্ববাসীর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিদায় নেয়ার প্রথম ধাপ। কেননা উক্ত সময় থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথাবার্তা ও কাজকর্মে এমন কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছিল যে, তিনি অতি শীঘ্রই সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর মহান রবের সাথে মিলিত হবেন। যেমন

১। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর যখন আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দেয়ার পর এ আয়াত নাযিল হলো–

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা- ৩)

তখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেহেতু ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং এই পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিশন শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং অতি শীঘ্রই তিনি নিজের প্রভুর ডাকে সাড়া দেবেন।

২। আইয়ামে তাশরীকে অবস্থানকালে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর সূরা নাসর নাযিল হয়, তখন আবু বকর (রাঃ) এর মর্ম বুঝতে পেরে কেঁদে দিয়েছিলেন। আর এটিই ছিল কুরআন মাজীদের সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা।[১৪০]

৩। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত প্রতি বছর রমাযান মাসের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করতেন। কিন্তু উক্ত বছরের রমাযান মাসে ২০ দিন ইতিকাফ করেন।[১৪১]

৪। জিবরাঈল (আঃ) প্রতি বছর রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পূর্ণ কুরআন একবার করে তেলাওয়াত করে শেষ করতেন। কিন্তু তিনি শেষ রমাযান মাসে দুই বার কুরআন খতম দেন।

৫। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-কানুনগুলো শিখে নাও। কারণ এ বছরের পর হয়তোবা আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না।[১৪২]

সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর সর্বশেষ আয়াতটি নাযিল হয় মৃত্যুর ৯ দিন পূর্বে।[১৪৩] আয়াতটি হলো–

---

[১৪০] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৮/৫০৯ নং পৃষ্ঠা।
[১৪১] সহীহ বুখারী, হা/৪৯৯৮; মিশকাত, হা/২০৯৯।
[১৪২] নাসাঈ, হা/৩০৬২; সহীহ মুসলিম, হা/৬১২৯।

﴿وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾

তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। তারপর প্রত্যেকেই তার কর্মফল পুরোপুরিভাবে ফিরে পাবে। আর সেদিন তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। (সূরা বাকারা- ২৮১)

অসুস্থতার সূচনা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুকালীন এ অসুস্থতা শুরু হয় সফর মাসের দু'এক দিন বাকি থাকতে অথবা রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম দিন।[১৪৪] এ দিন তিনি রাত্রে "বাকী" নামক কবরস্থানে গিয়ে গত হয়ে যাওয়া মুমিন নর-নারীদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর সেখান থেকে ফেরার পথে প্রচণ্ড মাথাব্যথায় আক্রান্ত হন।[১৪৫]

জীবনের শেষ দিনগুলো :

কবরস্থান থেকে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে প্রবেশ করেন।[১৪৬] অতঃপর ক্রমেই তাঁর অসুস্থতার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সময় তাঁর শরীরের তাপমাত্রা এতই বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল যে, লেপের উপরেও এর তাপ অনুভূত হচ্ছিল। তখন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এভাবে আমাদের (নবীদের) কষ্ট দ্বিগুণ হয় এবং পুরস্কারও দ্বিগুণ হয়।[১৪৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই অসুস্থতার সময়কাল ছিল ১৩ বা ১৪ দিন। উক্ত দিনগুলোর অধিকাংশ ওয়াক্তের ইমামতি তিনি নিজেই করেন এবং বাকি ওয়াক্তগুলোর ইমামতি করেন আবু বকর (রাঃ)।

সর্বশেষ অসিয়তসমূহ :

রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনের শেষ দিনগুলোতে বিভিন্ন সময় উম্মতের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত করে যান। যেমন−

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ো না, যাকে পূজা করা হয়। ঐ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রচণ্ড রাগ রয়েছে, যারা নবীগণের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করে।[১৪৮]

---

[১৪৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/৭২১ পৃঃ।
[১৪৪] আল-বিদায়াহ ৫/২২৪।
[১৪৫] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬০৪০।
[১৪৬] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫১৫৬; সহীহ মুসলিম, হা/২৩৮৭; সিলসিলা সহীহাহ, হা/৬৯০।
[১৪৭] ইবনে মাজাহ, হা/৪০২৪; সিলসিলা সহীহাহ, হা/১৪৪।
[১৪৮] মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৩৫২; মিশকাত, হা/৭৫০।

২। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অন্তিম রোগ যন্ত্রণায় তখন) আবু বকর (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) একদা আনসারদের কোন এক মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় তাঁরা দেখলেন যে, আনসারগণ কাঁদছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তারা বললেন, আমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওঠা-বসা ও মজলিসে কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) অথবা আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যান এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জানান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। আর সে দিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহণ করেননি। তিনি প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদেরকে আনসারদের দিকে খেয়াল রাখার জন্য আদেশ করছি। কেননা তারা আমার অতি প্রিয়জন এবং আমার আমানতের ভাণ্ডার। তাদের দায়িত্ব তারা সঠিকভাবে সম্পাদন করেছে, কিন্তু তাদের যা প্রাপ্য তা বাকি রয়েছে। অতএব তাদের উত্তম কাজকে তোমরা গ্রহণ করবে এবং তাদের মন্দ কাজকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।[১৪৯]

৩। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ! বৃহস্পতিবার দিন। বৃহস্পতিবার দিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা বেড়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি উপস্থিত সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার নিকট লেখার মতো কিছু নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়ে দেব, যা পালন করলে তোমরা কখনো ভুল পথে যাবে না। তখন সেখানে সাহাবীরা মতভেদ করলেন, যদিও কোন নবীর নির্দেশের ব্যাপারে মতভেদ করা সমীচীন নয়। তারা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রোগের তীব্রতা অনেক বেশী। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যেমন আছি তেমনই আমাকে থাকতে দাও। কারণ তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছ, তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তাই উত্তম। তিনি ইহলোক ত্যাগের সময় তিনটি বিষয়ে সবাইকে উপদেশ দান করলেন। [আর তা হলো] (১) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বের করে দেবে। (২) দূত বা প্রতিনিধি দলকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। ইবনে আব্বাস বলেন, আর তৃতীয় উপদেশটি আমি ভুলে গিয়েছি।[১৫০]

---

[১৪৯] সহীহ বুখারী, হা/৩৫৯৯।
[১৫০] সহীহ বুখারী, হা/৩০৫৩; সহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৭।

সর্বশেষ ইমামতি :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের সর্বশেষ ইমামতিটি ছিল মৃত্যুর চার দিন পূর্বে বৃহস্পতিবারের ইমামতি। আর সেটি ছিল মাগরিবের ওয়াক্ত। অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এত দিন যাবত নিজেই ইমামতি করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে আর কোন সময় ইমামতি করতে সক্ষম হননি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম দু'রাক'আতে সূরা মুরসালাত পাঠ করেন। আর সর্বশেষ আয়াত পাঠ করেন–

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾

এরপর তারা আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে? (সূরা মুরসালাত- ৫০)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দিনের এশার নামাযের জন্য তিন বার অযু করেন এবং তিন বারই অজ্ঞান হয়ে যান। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে আবু বকর (রাঃ)-কে ইমামতি করার জন্য বলেন। এরপর আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বমোট ১৭ ওয়াক্ত সালাত আদায় করান।

মৃত্যুর জন্য সর্বশেষ প্রস্তুতি :

মৃত্যুর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সর্বশেষ প্রস্তুতি ছিল নিজের কাছে গচ্ছিত সম্পদ দান করে দেয়া। আর তিনি এটি করেছিলেন মৃত্যুর ঠিক পূর্বের দিন অর্থাৎ রবিবারে। এ দিন তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, দীনারগুলো কি বিতরণ করেছ? তিনি বললেন, আপনার রোগের কারণে ব্যস্ত থাকায় বিতরণের সময় পাইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো। ঐ সময় ঘরে ৫ থেকে ৯টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আয়েশা (রাঃ) সেগুলো এনে তাঁর হাতে দিলেন। তখন তিনি বললেন, এগুলো এখনি বিতরণ করে দাও। কেননা কোন নবীর জন্য এটি মর্যাদাকর নয় যে, এরূপ বস্তুগুলো নিয়ে তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন।[১৫১]

কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-কে সংবাদ প্রদান :

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-কে ডেকে এনে কিছু কথা বললেন, ফলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর তাকে পুনরায় ডেকে এনে কানে কানে কিছু কথা বললেন, ফলে তিনি হাসলেন। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে, প্রথমবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন যে, এই অসুখেই আমার মৃত্যু ঘটবে। এতে তিনি কাঁদতে থাকেন। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি বলেছিলেন যে, পরিবারের মধ্যে তোমার সাথেই আমার সর্বপ্রথম দেখা হবে।

---

[১৫১] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৫৩১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৩২১২; সিলসিলা সহীহাহ, হা/২৬৫৩।

এতে তিনি হেঁসে উঠেন।[১৫২] আর এ সময় তিনি তাঁকে জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী হওয়ার সুসংবাদও প্রদান করেন।[১৫৩]
অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ডেকে এনে চুম্বন করেন এবং তাদেরকে নসীহত করেন। তারপর তাঁর স্ত্রীগণকেও ডাকেন এবং তাদেরকেও বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যু :
রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন তাঁর অসুস্থতা চরম আকার ধারণ করেছিল। যার কারণে বার বার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, "সালাত" "সালাত" এবং তোমাদের দাস-দাসী অর্থাৎ সালাত ও স্ত্রীজাতির বিষয়ে তোমরা সর্বাধিক খেয়াল রেখো। একথা তিনি তিন বার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর এটিই ছিল মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শেষ উপদেশ।[১৫৪]
এর পর পরই শুরু হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর যন্ত্রণা। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রাঃ) এর বুক ও কাঁধে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর (রাঃ) এর ছেলে আবদুর রহমান (রাঃ) একটি মিসওয়াক হাতে নিয়ে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগ্রহ বুঝতে পেরে আয়েশা (রাঃ) মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্দর করে মিসওয়াক করেন এবং মুখ ধৌত করেন। তারপর তিনি ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে হাত ও আঙ্গুল উত্তোলন করলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) শুনতে পেলেন যে, এ সময় তিনি বলছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন।[১৫৫]
তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাত এলিয়ে পড়ল এবং দৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রাঃ) এর রানের উপর মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। আর সময়টি ছিল সোমবারের দিন চাশতের তথা সূর্য অধিক গরম হওয়ার সময়। এ দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বয়স হয়েছিল চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৬৩ বছর।[১৫৬]

---

[১৫২] সহীহ বুখারী, হা/৬২৮৫; সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫০; মিশকাত, হা/৬১২৯।
[১৫৩] সহীহ বুখারী, হা/৩৬২৪; সহীহ মুসলিম, হা/২৪৫০; মিশকাত, হা/৬১২৯।
[১৫৪] ইবনে মাজাহ, হা/২৬৯৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৫২৬; মিশকাত, হা/৩৩৫৬।
[১৫৫] মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হা/৫৬৪; সহীহ বুখারী, হা/৪৪৪০; সহীহ মুসলিম, হা/৬৪৪৬; তিরমিযী, হা/৩৪৯৬; ইবনে মাজাহ, হা/১৬১৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৯৮৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৬১৮; জামেউস সগীর, হা/২১৪৭।
[১৫৬] সহীহ বুখারী, হা/৩৫৩৬।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুতে সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া :

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সাহাবীদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজেদের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। ফলে তাঁর মৃত্যুতে সাহাবীগণ দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। অনেকে আবার জঙ্গলে চলে যান। অনেকে আবার একাকী ক্রন্দন করতে থাকেন। এমনকি অনেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর বিষয়টি কল্পনাও করতে পারছিলেন না। সে সময় পৃথিবীটা যেন তাদের কাছে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন সে দিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখিনি এবং যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সে দিনের মতো এত নিকৃষ্ট এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন আর কখনো দেখিনি।[১৫৭]

উমর (রাঃ) এর অবস্থান :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় উমর (রাঃ) এর অবস্থান ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাছাড়া তিনি এও বলে বেড়াচ্ছিলেন যে, যাকে এ কথা বলতে শুনব যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন" আমি আমার এ তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করব।[১৫৮]

আবু বকর (রাঃ) এর অবস্থান :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুতে আবু বকর (রাঃ) চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি মসজিদে নববী থেকে ১ মাইল দূরে অবস্থিত 'সুন্‌হ' এলাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্রই ঘর থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে খুব দ্রুত মসজিদে নববীতে আগমন করেন। তারপর কাউকে কিছু না বলে সরাসরি আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে প্রবেশ করেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃতদেহ একটি ইয়ামেনী চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারায় চুম্বন করলেন এবং কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আপনার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক! আল্লাহ আপনার উপরে দুটি মৃত্যুকে একত্রিত করবেন না। অতঃপর যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তার স্বাদ আপনি আস্বাদন করেছেন।[১৫৯] তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন,

---

[১৫৭] দারেমী, হা/৮৮; মিশকাত, ৫৯৬২।
[১৫৮] সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৭০৮১; সুনানুল কুবরা লিত তাবারানী, হা/৬২৪৩।
[১৫৯] সহীহ বুখারী, হা/১২৪১।

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾

নিশ্চয় তুমিও মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে- (সূরা যুমার- ৩০)।[১৬০]

অতঃপর আবু বকর (রাঃ) ঘর থেকে বের হলেন। সে সময় উমর (রাঃ) সেখানে লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) উমর (রাঃ)-কে থামানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু এতে তিনি ব্যর্থ হলেন। তারপর তিনি মসজিদে এসে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। এতে লোকেরা উমর (রাঃ)-কে ছেড়ে আবু বকর (রাঃ) এর দিকে মনোযোগী হলো। তখন তিনি প্রথমে হামদ ও সানা পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর ঘোষণা দিলেন। তারপর বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর পূজা করে, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব; তিনি মরেন না। তিনি বলেছেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয় তার পূর্বেও অনেক রাসূল বিগত হয়ে গেছে। অনন্তর যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? যে কেউ পেছনে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কোন অনিষ্ট করবে না। অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার প্রদান করবেন। (সূরা আলে ইমরান- ১৪৪)

অতঃপর লোকেরা উক্ত আয়াতটি বারবার তিলাওয়াত করতে থাকে।[১৬১]

এমন পরিস্থিতিতে আবু বকর (রাঃ) এর মুখ থেকে এ ধরনের ভাষণ শোনার পর সাহাবীগণ নিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আর কখনো দুনিয়াতে ফিরে আসবেন না। আবু বকর (রাঃ) এর ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আবু বকরের মুখে উক্ত আয়াত শুনে আমি আমার দু'পা স্থির রাখতে পারিনি। অবশেষে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি নিশ্চিত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মারা গেছেন।[১৬২] তিনি আরো বলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল যেন আয়াতগুলো আমি এদিন ব্যতীত ইতিপূর্বে আর কখনো পাঠ করিনি।[১৬৩]

---

[১৬০] সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৭০৮১; সুনানুল কুবরা লিত তাবারানী, হা/৬২৪৩।
[১৬১] সহীহ বুখারী, হা/১২৪২।
[১৬২] সহীহ বুখারী, হা/৪৪৫৪।
[১৬৩] ইবনে মাজাহ, হা/১৬২৭।

খলীফা নির্বাচন :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর পর মুসলিমদের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খলীফা নির্বাচন। কেননা নেতৃত্ব ছাড়া থাকাকে ইসলাম অনুমোদন দেয় না। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর লাশ দাফন করার বিষয়টিও ছিল খুবই জটিল বিষয়, যে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়াটা খলীফা নির্বাচন ছাড়া সম্ভব ছিল না। ফলে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর দিনই একত্রিত হলেন। কিন্তু প্রথমেই এ বিষয়টি নিয়ে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। আনসারগণ দাবি করে যে, খলীফা তাদের মধ্য হতে হবে। আর অপরদিকে মুহাজিরগণ দাবি করে যে, খলীফা তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবে। আবার অন্য দিকে আরো একটি প্রস্তাব আসে যে, আনসারদের মধ্য হতে একজন আমীর এবং মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন আমীর নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু এসব কোন প্রস্তাবেই সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করতে পারছিলেন না। এমন সময় উমর (রাঃ) বললেন, এমন কে আছে, যে এই ঘটনার দ্বিতীয়জন (যে ঘটনাটির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন)-

﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا﴾

আর সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন– যখন তারা উভয়ে (একটি) গুহার মধ্যে অবস্থান করছিল তখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তিত হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। (সূরা তাওবা- ৪০)

এ কথা বলার পর উমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) এর হাতে বাই'আত প্রদান করলেন। তারপর অন্যান্য সাহাবীগণও তাঁর হাতে বাই'আত প্রদান করলেন।[১৬৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গোসল ও কাফন

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর দিন তথা সোমবার দিনটি খলীফা নির্বাচন করার মধ্য দিয়েই কেটে যায়। ফলে মঙ্গলবারের দিন সকালে তাঁকে গোসল দেয়া হয়। গোসলের কাজে অংশ নেন চাচা আব্বাস (রাঃ), তার দুই পুত্র ফযল ও কুছাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আযাদকৃত ক্রীতদাস শুক্বরান, উসামা বিন যায়েদ, আওস বিন খাওলী এবং আলী (রাঃ) সহ সর্বমোট ৭ জন। এ সময় আওস বিন খাওলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেহ নিজের বুকের উপরে ঠেস দিয়ে রাখেন। আব্বাস ও তার পুত্রদ্বয় তাঁর দেহের পার্শ্ব পরিবর্তন করে দেন। উসামা ও শুক্বরান পানি ঢালেন এবং আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেহ ধৌত করেন। এ সময় তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিহিত পোশাক খোলা হতে বিরত থাকেন।

---

[১৬৪] সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৭০৮১; সুনানুল কুবরা লিত তাবারানী, হা/৬২৪৩।

তারপর তারা তাঁকে তিনটি সাদা ইয়ামেনী চাদর দ্বারা কাফন পরিয়ে দেন। আর এগুলোর মধ্যে জামা কিংবা কোন ধরনের পাগড়ী ছিল না।[১৬৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জানাযা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গোসল ও কাফন সম্পন্ন করার পর সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জানাযা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, যেহেতু তারা ইতিপূর্বে কোন নবীর মৃত্যু দেখেননি। অতঃপর তারা এ বিষয়ে নবনির্বাচিত খলীফা আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ– রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জানাযা পড়া হবে। আর তা এ নিয়মে যে, একদল লোক প্রবেশ করবে, তারা তাকবীর বলবে, দু'আ করবে এবং দরূদ পাঠ করবে। তারা বের হয়ে এলে আরেক দল প্রবেশ করে একই নিয়মে তাকবীর, দু'আ ও দরূদ পড়ে বের হয়ে আসবে। এ নিয়মে জামা'আত ছাড়া সকলে আলাদা আলাদা জানাযার সালাত আদায় করবে।[১৬৬] ফলে সাহাবীগণ ১০ জন করে ভেতরে প্রবেশ করে এই নিয়মে জানাযা সালাত আদায় করলেন। আর এসব প্রক্রিয়া মঙ্গলবারের সারা দিন ও রাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাফন :

এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাফন কার্য সম্পাদন করা নিয়েও সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেননা কোন সাহাবীই এ কাজ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। ফলে তারা এ বিষয়েও আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ– তাঁকে দাফন করা হবে। তিনি যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন সেখানেই তাঁকে দাফন দেয়া হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পছন্দের স্থানেই তাঁকে মৃত্যু দিয়েছেন।[১৬৭] তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই কবরস্থ হন।[১৬৮]

আবু বকর (রাঃ) এর নিকট হতে এসব কথা শোনার পর সাহাবীগণের মধ্যে বিদ্যমান সকল মতভেদের অবসান হয়। অতঃপর আবু তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিছানা উঠিয়ে নেন এবং সেখানেই তাঁর জন্য কবর খনন করেন।[১৬৯] অতঃপর আলী ইবনে আবু তালিব, ফযল ইবনে আব্বাস, কুছাম ইবনে আব্বাস, শুক্বরান ও আউস ইবনে খাওলী (রাঃ) কবরে নেমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরস্থ করেন।[১৭০]

---

[১৬৫] সহীহ বুখারী, হা/১২৬৪; সহীহ মুসলিম, হা/৯৪১; মিশকাত, হা/১৬৩৫।
[১৬৬] সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৭০৮১; সুনানুল কুবরা লিত তাবারানী, হা/৬২৪৩।
[১৬৭] সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৭০৮১; সুনানুল কুবরা লিত তাবারানী, হা/৬২৪৩।
[১৬৮] ইবনে মাজাহ, হা/১৬২৮।
[১৬৯] ইবনে মাজাহ, হা/১৫৫৭।
[১৭০] ইবনে হিশাম ২/৬৬৪।

নবী ﷺ এর প্রতি দরূদ

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার জন্য রহমত প্রার্থনা করো এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ করো। (সূরা আহযাব- ৫৬)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমনিভাবে আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন, যেমনিভাবে বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিঃসন্দেহে আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।[১৭১]

---

[১৭১] সহীহ বুখারী, হা/৩৩৭০; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮১৫৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হা/৮৭২৪; মুসনাদে হুমাইদী, হা/৭৪৫; মিশকাত, হা/৯১৯।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ -
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

৪ সমাপ্ত ৪

ইমাম পাবলিকেশন্স এর প্রকাশিত বইসমূহ